শঙ্করাচার্য্য।

(জীবনী ও তত্ত্ব-উপদেশ)

শ্রীরাখালদাস কাব্যানন্দ
প্রণীত।

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা।

PUBLISHED BY
B. N. GHOSH,
204, Cornwallis Street, Calcutta.

PRINTED BY
MIHIR CHANDRA GHOSH,
New Saraswati Press,
25/A, Mechua Bazar Street, Calcutta.

শঙ্করাচার্য্য।

(ভূমিকা)

শাস্ত্র বলেন—"শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্"—ধর্ম্ম সাধনের জন্য এই মানবদেহ—এই মানবের উদ্ভব—মানবের অস্তিত্ব। মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া—মানব দেহ ধারণ করিয়া যে পরম তত্ত্ব জানিতে-পরমাত্মাকে পাইতে ইচ্ছা বা চেষ্টা না করে, সে নিতান্তই হতভাগ্য—বৃথাই তাহার জন্ম—মিথ্যা তাহার জীবন! মানব অন্য সকল জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিসে? বুদ্ধি বলেই মানব সর্ব্বাপেক্ষা বড়। বুদ্ধির চরম ফল জ্ঞান—তত্ত্বজ্ঞান। ধর্ম্ম সেই তত্ত্বজ্ঞানের নামান্তর বা প্রকটিত মূর্ত্তি। একমাত্র মানব জীবনেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়—তাহাতেই ধর্ম্মসাধন হইয়া থাকে।

বহু যোনি ভ্রমণ করিয়া, বহু জন্ম ভোগ করিয়া, জীব পরম সৌভাগ্যবলে মানব জন্ম লাভ করে। কেবল ধর্ম্ম সাধনে—পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভে—তাহার সার্থকতা সাধিত হইয়া থাকে। একমাত্র

ধর্ম্মের বলে মানবের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়—একমাত্র ধর্ম্ম সাধনের ফলে মানব দেবত্ব লাভ করিয়া থাকে।

ক্রমোন্নতি প্রকৃতির অনিবার্য্য অলঙ্ঘনীয় বিধান। কেবল জড়-জগতে—উদ্ভিদ-জগতে—বা ইতর প্রাণী-জগতে এই ক্রমোন্নতি বিধানের (Evolution) প্রক্রিয়া পর্য্যবসিত নহে। মানব জগতে—মানবের আধ্যাত্ম-জগতেও উহার পরাক্রম প্রকটিত হয়। ক্রমোন্নতি বিধানের বলেই—উহারই অনুসরণে মানবের আধ্যাত্মিক শক্তি বিকশিত ও পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে। তাহারই ফলে মানব ইহ জীবনেই যোগফল লাভ করিয়া দেবত্বে পরিণত হয়। তদভাবে পশুত্বে পিশাচত্বে মানব জীবনের অবশ্যম্ভাবী অধোগতি হইয়া থাকে।

জগতের অতুলনীয় অতি অমূল্য গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে কথিত হইয়াছে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া, ইতিকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন ও ভাবিতে লাগিলেন এখন করি কি? তখন তাঁহার চতুঃপার্শ্বস্থ সলিল হইতে 'তপ' 'তপ' শব্দ সমুত্থিত হইল। তাহাতে ব্রহ্মা বুঝিলেন তপস্যাই উদ্দেশ্য—তপস্যাই একমাত্র কর্ত্তব্য। তপস্যার বলেই ব্রহ্মা, পরম জ্ঞান মহাশক্তি লাভ করিয়া, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তপস্যা বলেই আত্মা পবিত্রতা লাভ করে—আধ্যাত্মিক শক্তি বিকশিত হইয়া, তত্ত্বজ্ঞানের পথ প্রদর্শন করে। তাই গীতায় উক্ত হইয়াছে—

যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব যৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥

তপস্যা বলেই মানব-আত্মা পবিত্র হইয়া, মানবকে পরম জ্ঞানের

অধিকারী করে। ইহা কেবল হিন্দু শাস্ত্রের কথা নহে। পাশ্চাত্য অনেক শ্রেষ্ঠ দার্শনিকও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতীচ্য পণ্ডিত প্রবর হার্বার্ট স্পষ্টি-প্রক্রিয়াকে বিশুদ্ধি-সাধন (process of purification) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ক্রমোন্নতি (evolution) বিশুদ্ধি-সাধনেরই নামান্তর। তপস্যা এই ক্রমোন্নতি বা বিশুদ্ধি-সাধন-প্রক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে।

জগতের কি জড় কি জীব সকলেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে শুদ্ধি সাধন-প্রক্রিয়া বা তপস্যার পথে পরিচালিত। যে যত শ্রেষ্ঠ, যত উন্নত সে সেই পরিমাণে জ্ঞাতসারে তপস্যা-অনুষ্ঠানে নিরত। মানব জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব। মানব সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞাতভাবে তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। মানবের মধ্যে মুনিঋষিগণই কেবল তপস্যায় জীবনকে নিয়োজিত করিয়া, তত্ত্বজ্ঞান বলে নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করেন।

ধর্ম্ম সাধনার চরম ফল তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানের ফলে আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক, আধিভৌতিক আদি ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—চরম উপেয়।

পশুতে আর মানবে পার্থক্য এইজন্য যে পশু দেহ ধারণ, দেহ রক্ষার জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত, মানব আধ্যাত্মিক শক্তি বিকাশিত করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য ব্যগ্র। যে মানবে সে ব্যাকুলতা নাই সে নরদেহ ধারী পশু ভিন্ন আর কিছুই নয়। যখন মানব প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করে, তখন তাহার অন্তরাত্মাকে আলোড়িত করিয়া জিজ্ঞাসা জন্মে—'এ জীবন লাভ করিয়া কি করিব ?'

এই গুঢ় জিজ্ঞাসাই মানব-জীবনকে ধন্য কৃতার্থ করিবার একমাত্র উপায়। এই জিজ্ঞাসাই অন্ধ মূঢ় মানবকে চক্ষুষ্মাণ করিয়া তাহার প্রকৃত গন্তব্য পথ দেখাইয়া দেয়।

জীব মাত্রেই দুঃখের দাস। বিশেষতঃ মানব-জীবন যেন দুঃখ যন্ত্রণা ভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। মানবের মধ্যে আবার যে যত উন্নত যত শ্রেষ্ঠ তাহার দুঃখ তত অধিক। পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রবর সপেনর বলিয়াছেন—"The more intelligence a man has, the greater his capacity for suffering; the man who is gifted with genius suffers most of all." বাস্তবিক বুদ্ধিমান চিন্তাশীল, প্রতিভাশালী ব্যক্তিই এ জীবনে বেশী দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। এই দুঃখ দুর্দ্দশা হইতে পরিত্রাণ লাভই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। সকল শ্রেষ্ঠ দর্শনও সেই পরিত্রাণের পথ প্রদর্শন করিতে ব্যগ্র। সাঙ্খ্যকার দর্শনের মূল সূত্রেই বলিয়াছেন :—

"ত্রিবিধ দুঃখস্যাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থ।"

মানব যখন যথার্থ মানুষের-মত-মানুষ হইয়া উঠে, তখন সে আপনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে—এ জীবনের উদ্দেশ্য কি? যতক্ষণ এই প্রশ্নের সমাধান সে না করিতে পারে ততক্ষণ সে কিছুতেই সুস্থির হইতে পারে না। শ্রেষ্ঠ মানবের পক্ষে এই জিজ্ঞাসা যেমন অনিবার্য্য, ইহার সমাধানও তেমনি আবশ্যক। বিশেষ চিন্তা বা গভীর গবেষণা এই প্রশ্ন মীমাংসার জন্য প্রয়োজন হয় না।

কারণ মানব মাত্রেই স্বভাবত বুঝে যে দুঃখ দূর করা আর সুখ ভোগ করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এখন সর্ব্বপ্রকার দুঃখ একেবারে দূর করা ও মহাসুখ—যাহার নাম পরম আনন্দ—সেই অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করার উপায় কি? জগতের সকল শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, সকল প্রধান পণ্ডিত, সমুদয় সুধী ও সাধুগণ একবাক্যে বলিয়াছেন—একমাত্র ধর্ম্মসাধন বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ দ্বারাই সে উপায় অধিগত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার ও বুঝিবার আছে। তাহার স্থান ইহা নহে। এখন কেবল একটা কথার একটু আলোচনা এখানে প্রয়োজন। কথাটি এই যে ধর্ম্মসাধন যাহার চরম ফল তত্ত্বজ্ঞান, সেই তত্ত্বজ্ঞানের যথার্থ স্বরূপ কি? এই কথাটি বুঝিয়া না লইলে, আচার্য্য শঙ্করের তত্ত্ব যথার্থরূপে আয়ত্তীকৃত করা একরূপ অসম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি। বিশেষতঃ আধুনিক শিক্ষিতগণ ধর্ম্মকে যে ভাবে সাধারণত ধারণা করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে শঙ্করের তত্ত্ব ও তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব, যাহা তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্যে পূর্ণাঙ্গে প্রকটিত, তাহা যথাযথ ভাবে অধিগত করা দুরূহ হইয়া উঠে।

স্থূল ছাড়িয়া সূক্ষ্মে প্রবেশ—জড় ত্যাগ করিয়া অধ্যাত্মে আশ্রয় লাভ—ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। জড়ে—জড়দেহে—জড় ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ হইয়াই মানবের যাবতীয় দুঃখ দুর্দ্দশা সমুদ্ভূত হইয়াছে, একথা সূক্ষ্মদর্শী বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই বুঝেন ও সমস্বরে স্বীকার করিয়া থাকেন। জড়কে ছাড়িয়া সূক্ষ্মে আশ্রয় লাভেই মানব বাহ্য বন্ধন হইতে মুক্তি

লাভ করে। সেই মুক্তিলাভ হইতে সকল দুঃখ ঘুচিয়া যায়—পরমানন্দ উপভোগ ঘটে।

আত্ম তত্ত্ব—সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ব্যাপার। ধ্যান ধারণার পন্থা ধরিয়া সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্বে প্রবেশ করিতে হয়। তাহাতেই বাহ্য বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ঘটে—তাহাতেই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক আদি ত্রিবিধ দুঃখের অবসান হয়—তাহাতেই মহামুক্তি জনিত পরমানন্দের উপভোগ হইয়া থাকে। ইহাই ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব—ইহাই ধর্ম্মের মর্ম্ম কথা। তাই 'আত্মদর্শন' হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্ধারিত ও সুধী সাধকের নিকট সমাদৃত হইয়াছে।

আত্মদর্শন হইতে ব্রহ্মদর্শন লাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মদর্শন হইতে ব্রহ্মানুভূতি—চরমে ব্রহ্মে পরিণতি হইয়া থাকে। আত্মদর্শন দ্বারা বদ্ধ ক্ষুদ্র আত্মা সম্প্রসারিত হইয়া, ভূমারূপে ভূমাভাব ধারণ করে। তখন ক্ষুদ্র তুচ্ছ মানব ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মই হইয়া যায়। তাই হিন্দু শাস্ত্রে বিঘোষিত হইয়াছে "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম ভবতি।"

আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মত্ব লাভের এই পন্থা প্রকৃষ্ট রূপে মূঢ় জগৎকে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার সকল ব্যাখ্যা-বিবৃতি আত্মার যথার্থ স্বরূপ যে ভূমাভাব ব্রহ্মরূপ, তাহাই অতি বিশদভাবে দেখাইয়া দিয়াছে।

শঙ্করের ব্যাখ্যা বিবৃতি সম্বন্ধে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাই এখানে সে প্রসঙ্গেরএকটু আলোচনা প্রয়োজন। আত্ম-দর্শন—আত্মার স্বরূপে অবস্থান—সকল হিন্দু দর্শন ও হিন্দু শাস্ত্রের

চরম সিদ্ধান্ত। কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক, আত্মদর্শনের সারবত্তা স্বীকার করেন না। কোমৎ বলেন 'আত্ম দর্শন অসম্ভব।' (Introspection is impossible)। আত্মাকে দেখিতে হইলে, তাহাকে 'বিষয়ে' (object) পরিণত করিতে হয়। কিন্তু বিষয়ী (subject) কখন বিষয় (object) ও বিষয়ী (subject) উভয়ই এককালে হইতে পারে না। কাণ্ট বলেন—বাহ্য ব্যাপারের (phenomena) অতীত সামগ্রী অধ্যাত্মতত্ব (numena)। মানব যথাযথরূপে তাহার স্বরূপতত্ব কখনই বুঝিতে পারে না। বোধ ও বুদ্ধি দ্বারা তাহাকে হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে হয়। বোধ বুদ্ধির মধ্য দিয়া আসিবার সময় বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক স্বরূপের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। সুতরাং প্রকৃত অধ্যাত্মতত্ব (numena—the thing in itself—the being) যাহা বাহ্য বিষয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক তত্ব, তাহাকে আমরা যে প্রকার করিয়া লই, তাহার প্রকৃত স্বরূপ কখনই সেরূপ হইতে পারে না। তাহা আমাদের সকল বৃত্তির সম্বন্ধাতীত। কাজেই তাহা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। (The true thing-in itself, the being, as distinguished from the phenomenon, is not the object such as we are compelled to conceive it, but the object out of all relation to our faculties, and as such, it is manifestily unknown and unknowable.) ইংরাজ দার্শনিক প্রবর হার্বার্ট স্পেনসরও এইরূপ একটা সূত্র ধরিয়া অজ্ঞেয়-বাদের (agnosticism) পৃষ্ঠ পোষণ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে হিগেল, ফিক্টে, সেলিং প্রভৃতি দার্শনিকগণ অধ্যাত্ম-জ্ঞান লাভের বিরোধী নহেন। আত্মচিন্তা আত্মদর্শন দ্বারা আত্মসম্প্রসারণ তাঁহাদের দর্শনে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রের ও হিন্দুদর্শনের চরম উদ্দেশ্য যে আত্মার স্বরূপে অবস্থিতি বা ভূমা স্বরূপ ব্রহ্মে পরিণতি, তাহাও কোন না কোন প্রকারে তাঁহারা মানিয়া লইয়াছেন। স্থান কালের (space and time) অতীত অবস্থা, মানবআত্মা ধ্যান বলে লাভ করিতে পারে, ইহা সেলিংএর দর্শনে সুস্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন,—মানব-বুদ্ধি ঈশ্বর-বুদ্ধি একই—পৃথক নহে (The human reason is identical with the devine)।

ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ আত্মাকে পরমাত্মায় পরিণত করা—অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম' এই ভাব লাভ করা (যাহা বৈদান্তিক ভাষায় 'সোহং' ও 'তত্ত্বমসি' আদি শাব্দিক নামে প্রখ্যাত) হিন্দুধর্ম্মের প্রধান সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের সূত্র ধরিয়া আধুনিক বহু প্রধান প্রতীচ্য দর্শন ও দার্শনিক ধর্ম্মের ভিত্তি গ্রথিত হইয়াছে। এই অমূল্য অপূর্ব্ব বৈদান্তিক দর্শন ও বৈদান্তিক ধর্ম্মের সাধারণ্যে আদি প্রচারক আচার্য্য শঙ্কর।

অনেকে বলেন শঙ্করাচার্য্য কেবল শুষ্ক নীরস জ্ঞান-পন্থা প্রচার করিয়াছেন। ইহা ভ্রম। তাঁহার কৃত স্তোত্র-গাথায় তাঁহার ভক্তিভাবও পূর্ণাঙ্গে প্রকটিত। প্রকৃত পক্ষে কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন প্রধান ধর্ম্ম পন্থার কোন পন্থাই শঙ্কর কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় নাই।

শঙ্করাচার্য্য—অবতার।

'শঙ্কর শঙ্কর সম' একথা ভারতের সর্ব্বত্রই বিঘোষিত। যিনি, বিশাল বিস্তীর্ণ ধর্ম্মবিকাশের লীলাক্ষেত্র ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ধর্ম্মের বন্যায় ভাসাইয়াছিলেন, যিনি অতি অল্প কালমাত্র মানব-জীবন ধারণ করিয়া, পথভ্রষ্ট পতিত ভারতকে সুপথে আনয়ন করিয়াছিলেন, তিনি যে ভগবানের অংশস্বরূপ বা অবতার তাহা স্বীকার করিতে কে কুণ্ঠিত? আচার্য্য শঙ্করের পরমায়ু অতি অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। অষ্টাবিংশ কোনমতে দ্বাত্রিংশ বৎসর মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন। এই সামান্য সময়ে তিনি ধর্ম্ম জগতে যে অদ্ভুত কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে কে না বিস্ময়ে অভিভূত হয়? সত্যই সে মহৎ কার্য্য অতি অপূর্ব্ব অদ্ভুত অমানুষিক।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

(৭ম—৪র্থ অঃ)

হে ভারত, যে সময়ে ধর্ম্মের হীনতা এবং অধর্ম্মের প্রভাব ঘটে, তখনই আমি অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

ধর্ম্মই জগতের একমাত্র সার সামগ্রী—ধর্ম্মই জগতের একমাত্র

উদ্দেশ্য। একমাত্র ধর্ম্মই, সংসার সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। উৎকর্ষ উন্নতি জগতের জীবনের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় ধর্ম্ম ব্যতীত অপর কিছুই নহে।

ব্রহ্ম বা পরমাত্মার প্রকট মূর্ত্তি ধর্ম্ম। পরমাত্মার ধ্যান ভজনাদি ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ চরম সাধনা। সাধু ধার্ম্মিকগণ সেই শ্রেষ্ঠ সাধনা দ্বারা ধর্ম্মের নিগুঢ় তত্ত্বকে রক্ষা করিয়া থাকেন। পাপী অধার্ম্মিকগণ বিপরীত পন্থায় ধর্ম্মের গ্লানি ঘটাইয়া থাকে। অধর্ম্মকে দূরীভূত করিয়া, ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে হইলে, পাপীগণকে অপসারিত করিয়া, ধার্ম্মিকগণকে রক্ষা করিতে হয়। তখন ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া সে মহৎ কার্য্য সাধন করেন।

ভগবান বলিয়াছেন ঃ—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

যে সময়ে শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন ধর্ম্মের লীলাক্ষেত্র ভারতবর্ষে ধর্ম্মের বিশেষ গ্লানি ঘটিয়াছিল। নাস্তিক বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। লোকে বেদ বিধি ভুলিয়া, শাস্ত্র-মার্গ ছাড়িয়া, দলে দলে বিপথগামী হইতেছিল। ধর্ম্মের নামে নানাবিধ ভণ্ডামি কদাচারে হিন্দুসমাজ কলুষিত বিধ্বস্ত হইয়া উঠিল। সৎধর্ম্মের আলোক রেখা যেন চিরতরে অস্তমিত হইবার উপক্রম করিল। পরম কল্যাণের আকর, শুভ ধর্ম্মের আশ্রয় স্থল আর্য্য সমাজ, অনার্য্য ভাবের গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। এমনি সঙ্কটের

যুগে মহাপুরুষের আবির্ভাব নিতান্তই প্রয়োজন হইয়া উঠিল। সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের রক্ষার জন্য, পতিত ভারতের উদ্ধার হেতু, আচার্য্য শঙ্কর অবতীর্ণ হইলেন। হেন মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্যকে অবতার বলিয়া পূজা করিতে কোন হিন্দুসন্তান কুণ্ঠিত? অবতার রূপে আবির্ভূত হইয়া, অনেক মহাপুরুষ অনেক মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে ধর্ম্মরক্ষণ, তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য। ধর্ম্মস্থাপন, ধর্ম্মরক্ষণ ভগবানের নিজ কার্য্য। কারণ ধর্ম্মেই জগতের স্থিতি—ধর্ম্মেই জগতের উন্নতি। সৃজন ব্যাপার ও উৎকর্ষণ প্রক্রিয়া (Process of purification) একই। ধর্ম্ম সেই উৎকর্ষণের মুখ্য উপায়। জগৎ কখন দুষ্ট দৈত্যের সৃষ্টি নহে, পরম জ্ঞানময়, দয়াময়, প্রেমময় ভগবানের সৃষ্ট ব্যাপার। মঙ্গলই জগতের উদ্দেশ্য—কল্যাণই জগতের পরিণতি। কল্যাণময় ভগবানের সৃষ্ট ব্যাপারের উদ্দেশ্য বা পরিণাম কখন অশুভ বা ধ্বংশ হইতে পারে না। উন্নতি মঙ্গল তাহার চরম অভিব্যক্তি নিশ্চয়ই। উন্নতি মঙ্গল ধর্ম্মের নামান্তর বা ভাবান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে মহাপুরুষ ধর্ম্মকে স্থাপন করিতে—রক্ষা করিতে—আবির্ভূত হন, তিনি নিশ্চয়ই ভগবানের অবতার ভিন্ন সাধারণ মানব নহেন। যে সৎ শুভ ধর্ম্ম আচার্য্য শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই অবতার রূপে হিন্দুর পক্ষে পূজার্হ।

হিন্দু শাস্ত্রে নানাভাবের অবতার কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পূর্ণ অবতার, অংশ অবতার, কলা অবতার, আবেশ অবতার প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর অবতারই মুখ্যরূপে পরিগণিত। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ

আদি শ্রেষ্ঠ দশ অবতার ব্যতীত যে সকল অবতার পরিপূজিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। ব্যাস, নারদাদিও কলা অবতার বা আবেশ অবতার রূপে হিন্দুর নিকট পূজিত হইয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গণ্য। তেমনি আচার্য্য শঙ্করও শিবের অবতার বলিয়া হিন্দু সমাজে পুজিত হইয়াছেন। 'শঙ্কর শঙ্কর সম' 'শঙ্কর শিব অবতার' প্রভৃতি ধ্বনি হিন্দু সন্তানের পক্ষে নিত্য উচ্চার্য্য বাণীরূপে বরণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অবতার-বাদের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে যতপ্রকার অভিমত সংস্থাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় মুখ বিনিসৃত সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সারবান সমীচান সত্য অপর কোনটই নহে। অধর্ম্মকে বিদূরিত করিয়া—পাপী অধার্ম্মককে বিনষ্ট করিয়া, ধর্ম্ম সংস্থাপন ও সাধু ধার্ম্মকের সংরক্ষণই যে অবতার-আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, তাহা সেই ভগবদ্বাণীতে সুস্পষ্ট প্রকটিত।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ধর্ম্ম রক্ষা, ধর্ম্ম সংস্থাপন যদি অবতারের উদ্দেশ্য হয়, তবে অধর্ম্ম-সঙ্কুল, নাস্তিক বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভাবক প্রচারক বুদ্ধদেব হিন্দুর নিকট অবতার বলিয়া পূজিত হন কেন? এ কথার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে বৌদ্ধধর্ম্ম ঠিক নাস্তিক নিরীশ্বর কি না সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। 'ঈশ্বর নাই' 'ভগবৎ আরাধনার প্রয়োজন নাই' এমন কথা বুদ্ধদেব

কোথাও প্রচার করিয়াছেন কিনা, তাহা কেহই বিশদরূপে প্রমাণ করিতে পারেন না। তাই অনেক পণ্ডিতের মতে শাক্যসিংহ ধর্ম্ম-প্রচারক না হইলেও নীতি প্রচারক বটে। তাঁহার প্রচারিত বা উদ্ভাবিত নীতি যে অতি উচ্চ অতীব মহান তাহা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হয়। বাস্তবিক বৌদ্ধতত্ত্বের বাহ্যভাগ ধর্ম্ম-সমন্বিত না হইলেও, উহার অত্যুচ্চ নীতি-তত্ব যে গভীর ধর্ম্ম-ভিত্তির উপর গ্রথিত তাহা কোন সুক্ষ্মদর্শী সমালোচক স্বীকার না করিবেন? বৌদ্ধনীতি কখনই জঘন্য সুখবাদ (utiliterianism) বা প্রত্যক্ষবাদের (Positivism) ন্যায় অধ্যাত্মহীন নহে।

আর একটি কথা—যুগধর্ম্মের কথা এস্থলে একটু আলোচ্য ও বিবেচ্য। ধর্ম্মের ভাব-প্রকৃতি সকল সময়ে সর্ব্বস্থানে কখন একরূপ হয় না বা থাকিতে পারে না। তাহা হইলে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয় —সৃষ্টি বৈচিত্র্য বিফল হইয়া দাঁড়ায়। যদি জগৎকাণ্ড – সৃষ্টি-প্রক্রিয়া অনাদি অনন্তকাল হইতে একইরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তবে তাহা লীলাময় ভগবানের উদ্ভাবিত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তাহা একটা অন্ধ জড়শক্তির অন্ধ ক্রিয়া বলিয়াই মানিতে হয়। ধর্ম্ম বা উন্নতি বা মঙ্গল কখনই সে সৃজন-ব্যাপারের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। অন্ধ শক্তির অন্ধ কার্য্যের অন্ধ ফল যেমন ধ্বংশ বা ব্যর্থ হইয়া দাঁড়ায়, সৃজন-প্রক্রিয়ার পরিণতিও সেইরূপ অসার অর্থহীন হইয়া পড়ে। সেরূপ নাস্তিকতার সহিত যুক্তি তর্কের অবতারণা নিতান্তই নিস্প্রয়োজন।

ফলতঃ বিশুদ্ধি-সাধন বা উন্নতি-উৎকর্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ইহাই

সমীচীন ও যুক্তি-সঙ্গত সিদ্ধান্ত। হার্বার্ট প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিক-গণ তাই সৃষ্টি ব্যাপারকে উৎকর্ষণ-প্রক্রিয়া (process of purification) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুনীতি ও সৎ ধর্ম্ম—সেই উন্নতি উৎকর্ষণের প্রকৃষ্ট পন্থা। যিনি কুনীতি কুধর্ম্ম বা অধর্ম্মকে সমাজ হইতে দূরীভূত করিয়া, সুনীতি সৎধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন তিনিই মহাপুরুষ—তিনিই ভগবানের অংশ বা অবতার। আচার্য্য শঙ্করও বৌদ্ধধর্ম্মের—বৌদ্ধ-যুগের কদাচার কুনীতি ও কুভাবকে অপসারিত করিয়া, জগতের আদর্শ স্বরূপ আর্য্যসমাজে কল্যাণকর সনাতন ধর্ম্মের পুনপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হেন মহাপুরুষকে অবতার বলিয়া পূজা করিতে কোন হিন্দুসন্তান কুণ্ঠিত? 'শঙ্কর শঙ্কর সম' ভাবে—শঙ্কর শিব অবতার রূপে—হিন্দু সমাজের সর্ব্বত্রই সংপূজিত। শঙ্কর সত্যই শিব অবতার।

শঙ্করের আবির্ভাব হেতু।

সকল জন্মের মধ্যে নর-জন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম। কারণ অন্য জন্ম কেবল তুচ্ছ ভোগের জন্য; আর মানব জন্ম মোক্ষের জন্য। ভোগ দুই ভাবে সংঘটিত হয়। এক অনুকুল বেদনা জনিত সুখভোগ, অপর প্রতিকুল বেদনা জনিত দুঃখভোগ। জন্ম লাভ করিয়া, দেহ ধারণ করিয়া এই দুই প্রকার ভোগের মধ্যে এক প্রকার ভোগ ভুগিতে হইবেই হইবে। এই দুই জাতীয় ভোগ হইতে কোন জাতীয় জীবই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। যদি কোন জীব সুখ ও দুঃখ উভয় জাতীয় ভোগের হাত এড়াইতে পারে বা এড়াইবার চেষ্টা করিতে পারে তবে সে কেবল একমাত্র জীব—মনুষ্য। কেবল মানবই সুখ ও দুঃখ দুই জাতীয় ভোগের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া, মহামুক্তি বা পরমানন্দের অধিকারী হইতে পারে। সেই শ্রেষ্ঠ অধিকার লাভের উপায় ধর্ম্ম। তাই সনাতন হিন্দু শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন আদি নীচবৃত্তি পশুর ন্যায় মানুষেরও আছে; কেবল ধর্ম্মের জন্যই মানব পশু অপেক্ষা পৃথক ও শ্রেষ্ঠ। এই ধর্ম্ম সাধনার দ্বারাই মানুষ দেবত্ব লাভ করে—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক আদি ত্রিবিধ দুঃখের দশা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া, মহানির্ব্বাণ ও নিশ্রেয়সের অধিকারী হইয়া থাকে। তাই ধর্ম্ম সাধনে সমর্থ বলিয়াই, জগতের

সর্ব্ব জীবের মধ্যে মানবই শ্রেষ্ঠ—মানব-জন্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জন্ম।

মানব জন্মকে হিন্দুশাস্ত্র এতই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে স্বর্গে দেবতাগণ, স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিয়াও এই মানব-জন্ম লাভের জন্য ইচ্ছা করিয়া থকেন। কারণ স্বর্গের সুখও বিশুদ্ধ সুখ নহে। স্বর্গে থাকিয়াও দেবগণকে অসুর-ভয়ে সর্ব্বক্ষণ ভীত ও ত্রস্ত থাকিতে হয়। স্বর্গের অধিপতি স্বয়ং ইন্দ্রকে বৃত্রাসুরের ভয়ে বহুকাল লুকাইয়া থাকিতে হইয়াছিল। যে স্বর্গের এমন অবস্থা—যে স্বর্গে ভয় আছে, ভাবনা আছে—সে স্বর্গ কখন বিশুদ্ধ সুখের বা পরমানন্দের ভোগায়তন হইতে পারে না। তেমন স্বর্গের দেব-জন্ম লাভ কখন চিরবাঞ্ছনীয় সামগ্রী হইতে পারে না। তাই স্বর্গের দেবগণও মনুষ্য জন্ম পাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। কারণ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া তাহাঁরা কেবল ভোগ সুখের অধিকারী না হইয়া, সাধনের ফলে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, যাহার বলে পরমানন্দ ব্রহ্মানন্দ পর্য্যন্ত তাহাঁদের অধিগত হইতে পারে—যাহার বলে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দুর্দ্দশা চিরতরে অনন্ত কালের জন্য দূরীভূত হইয়া যায়।

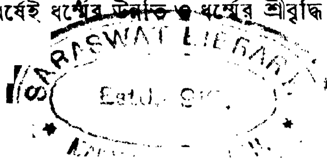
মানব-জন্মে ধর্ম্ম সাধনার অধিকার লাভ হয়—ধর্ম্ম সাধনে সিদ্ধি লাভ হইতে পারে—বলিয়া, হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে—আর্য্যঋষিগণের নির্দ্দেশ অনুসারে—মানব জন্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জন্ম তাহার একমাত্র কারণ এই যে মানব-জন্মে মুক্তি ও পরমানন্দপ্রদ ধর্ম্ম সাধনের অধিকার লাভ করিতে পারা যায়। মানব-জন্মের ইহাই

অতি গুঢ় তত্ত্ব, পরম সারতত্ত্ব। তাই হিন্দুশাস্ত্র সর্ব্বস্থানে সেই কথাই তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—আমরাও শাস্ত্রের সেই সূক্ষ্ম সূত্র ধরিয়া বারবার সেই কথাই পরিব্যক্ত করিতেছি।

আমরা হিন্দু, আমাদের পক্ষে হিন্দু শাস্ত্রের নির্দ্দেশই শিরোধার্য্য। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারেই মানব-জন্ম যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জন্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তেমনি তদনুসারে বিশাল জগতের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষই ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। কেবল মানব-জন্ম লাভ করিলেই যে নির্ব্বাণ-মুক্তির অধিকারী হইতে পারে এমন নহে। মহামুক্তির অধিকারী হইতে হইলে ভারতীয় ধর্ম্মক্ষেত্রে হিন্দুকুলের শ্রেষ্ঠবর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠসাধন মার্গের অধিকার লাভ করাই একমাত্র প্রয়োজন। ফলে ভারতবর্ষই ধর্ম্মক্ষেত্র—ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসাধনের প্রধান স্থান। বিশেষ যুক্তি দ্বারা একথার সত্যতা বা সারবত্তা প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। কেননা ইহা এখনও পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষভাবেই অনায়াসে প্রমাণিত হইতে পারে। ভারতের ন্যায় ধর্ম্মের লীলাভূমি, জগতের মধ্যে আর কোথায় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে? ধর্ম্মের এমন সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব, এমন স্তরগত সাধন মার্গ, ধর্ম্মকাণ্ডের এমন ভাব-বিকাশ, সমগ্র সংসারের মধ্যে আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? ধর্ম্মের এমন গুঢ় সাধন-প্রক্রিয়া, এমন অত্যুচ্চ মার্গের সাধন ব্যাপার—যোগ-সমাধি দ্বারা মহামুক্তি লাভ—পৃথিবীতে এক ভারত-ক্ষেত্র ভিন্ন আর কোথায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে? ধর্ম্ম-সাধনের জন্যই যে মানবের উদ্ভব—ধর্ম্মের বল যে শ্রেষ্ঠ বল—তাহা

ভারতের হিন্দুজাতি আর ভারতের হিন্দু ধর্ম্মই, চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া জগতকে প্রদর্শন করিয়াছে। এই যে সভ্যতা গর্ব্বে গর্ব্বিত, বিজ্ঞান বলে বলীয়ান, পাশ্চাত্য-জগৎ আজি মুগ্ধ নেত্রে সাগ্রহে সুদূর প্রাচ্য জগতের মধ্যে ভারত পানে চাহিয়া আছে কেন? কেবল যে তাহার ধনরত্ন লুণ্ঠনের জন্য তাহা নহে। পাশ্চাত্য জগতের বহু শিক্ষিত সমুন্নত সমাজ, আর্য্যাবর্ত্তের গুঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মভাব জানিবার ও বুঝিবার জন্যই অতি উৎসুক ও কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বিস্ময় ও সম্মানের চক্ষে ভারত পানে চাহিয়া রহিয়াছে। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া সূক্ষ্মদর্শী মাত্রেই ভগবানের পরম প্রিয়স্থান ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ লীলাক্ষেত্র বলিয়া, ভারতবর্ষকে পূজা করিয়া থাকেন। এই পরম পবিত্র বর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া কোন হিন্দু সন্তান, আপনাকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ বলিয়া মনে না করে?

ধর্ম্ম রক্ষার জন্য—ধর্ম্মের গৌরব বৰ্দ্ধনের জন্য ভারতবর্ষই ভগবান কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত পরম ধাম—শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। হেন ভারতে ধর্ম্মের গ্লানি ঘটিলে, ভগবানের সিংহাসন কখনই স্থির থাকিতে পারে না। ভারতে যত অবতার যত মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, সকলেরই উদ্দেশ্য কেবল একমাত্র ধর্ম্মকে রক্ষা—ধর্ম্মের গ্লানি বিদূরিত করিয়া, পাপ তাপকে বিদলিত করিয়া—ধর্ম্মের সুসংস্কার ও বিশুদ্ধিতা সাধন—আর পুণ্যের বিবৰ্দ্ধন। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশেও অবশ্য শ্রেষ্ঠ পুরুষের আবির্ভাব ও অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। তাহাদের উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক বা সামাজিক উন্নতি সাধন। কেবল ভারতবর্ষেই ধর্ম্মের উন্নতি ও ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য মহাপুরুষের



আবির্ভাব হইয়াছে। আর ভারতের মহাপুরুষ মাত্রেই সেইজন্যই ধর্ম্মরূপী ভগবানের অবতার বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছেন।

বৌদ্ধ যুগের শেষ অবস্থায় যখন ধর্ম্মের বিষম গ্লানি ঘটিল, তখনই ভগবানের দৃষ্টি তাঁহার প্রিয়ভূমি ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হইল। সেই আঁধার আচ্ছন্ন অবস্থা হইতে, সেই ধর্ম্মসঙ্কট হইতে ভারতকে উদ্ধার হেতু ভগবানের অবতার শঙ্কর রূপে আবির্ভূত হইলেন।

এই অবস্থায় এই যুগে ভারতে নাস্তিক বৌদ্ধ ধর্ম্ম ব্যতীত আরও বহু অপধর্ম্মের আবির্ভাব ও প্রভাব ঘটিয়াছিল। ভগবানের প্রিয় পার্ষদ দেবর্ষি নারদ, ভারত ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে করিতে, সেই কালে নানাস্থানে নানাভাবে ধর্ম্মের বিপর্য্যয় ও গ্লানি পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। ধর্ম্মের নিতান্ত গ্লানি ও মলিন অবস্থা দেখিয়া ধর্ম্মপ্রাণ দেবর্ষি নারদ হৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা পাইলেন। হিমালয়ের সানুদেশে পবিত্র ক্ষেত্রে উপবিষ্ট হইয়া তিনি মনে মনে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। আপনি আপনাকে কহিতে লাগিলেন, —অহো! কি দুর্দ্দৈব! কি ঘোর ধর্ম্ম-বিপ্লব! যে ভারত-ক্ষেত্র ভগবানের ধর্ম্মলীলার প্রিয় ভূমি—যে ভারতে ভগবান আদর্শ সনাতন ধর্ম্ম সংরক্ষিত করিয়াছেন—যেখানে মূর্ত্তিমান করিয়া বেদ বিধান প্রকটিত করিয়াছেন—ভারতের সেই ধর্ম্মক্ষেত্রে কি অভাবনীয় বিষম ধর্ম্মবিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে! যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই ধর্ম্মের উজ্জ্বল পবিত্র প্রভা, অপধর্ম্মের নিবিড় আঁধারে সমাচ্ছন্ন! সনাতন ধর্ম্ম যেন চিরতরে জগৎ

হইতে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম করিয়াছে। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ যজ্ঞ তপাদি অনুষ্ঠান আর প্রায় কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। ভগবানের পবিত্র নাম কীর্ত্তন—ভক্তিভরে তাঁহার নাম গান—জ্ঞানভক্তির পরিচর্চ্চা অনুশীলন একেবারেই তিরোহিত হইতে চলিয়াছে। এমন অবস্থায় উপায় কি? কি উপায়ে সনাতন ধর্ম্ম, পরম পবিত্র আচার অনুষ্ঠান মুক্তিপ্রদ জ্ঞান ভক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা পুনরভ্যুদয় ঘটিতে পারে? নতুবা সত্বরই নিতান্ত সঙ্কটের যুগ আসিয়া উপস্থিত হইবে। সেই ঘোর সঙ্কট কালের প্রচণ্ড সংঘর্ষে ধর্ম্ম, ভারত ক্ষেত্র হইতে সুতরাং সমগ্র বিশ্বসংসার হইতে একেবারেই নির্ম্মূল ও উৎসাদিত হইয়া পড়িবে। আর ভারত ক্ষেত্র হইতে ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে, যখন সংসারময় অধর্ম্মের প্লাবনে পরিপ্লাবিত হইবে, তখন পাপতাপের প্রচণ্ড প্রতাপে নরকুলও নির্ম্মূল হইয়া যাইবে; বিশ্ব-সংসার ঘোর বিপ্লবে বিলয় প্রাপ্ত হইবে! অহো! কি ঘোর বিপত্তির কাল উপস্থিত!”

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেবর্ষি নারদ, জীবের ব্যথায় মহা ব্যথিত হইয়া কিছুকাল নীরব ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অবশেষে ধ্যানস্থ হইয়া কিয়ৎকাল পরে স্থির করিলেন যে এমন বিষম বিপত্তির কালে—হেন সঙ্কটের অবস্থায়—পরম পিতা ব্রহ্মার নিকট গমন করাই কর্ত্তব্য। তাঁহার নিকটে যাইয়া সকল বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করা যাউক। এমন অবস্থায় সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মা ব্যতীত আর কে প্রকৃত উপদেশ প্রদান করিবে? তিনি ভিন্ন আর কে প্রকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শনেই বা সমর্থ?

এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তথায় সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে পিতৃপদে প্রণত হইলেন। ব্রহ্মা তৎকালে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। নারদ নিকটস্থ হইয়া প্রণাম করিলে ব্রহ্মার ধ্যান ভঙ্গ হইল। লোক-পিতামহ নারদের তাৎকালিক অবস্থা সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হইলেন। পিতামহ দেখিলেন—নারদের ব্রহ্মানন্দজনিত প্রফুল্ল বদনের সে সমুজ্জ্বল প্রভা আর নাই। তাঁহার সে দেবমূর্ত্তি দেবশ্রী মলিন বিষাদ-কালিমায় পরিম্লান হইয়াছে। তাহার ম্লান মুখমণ্ডল হইতে যেন প্রকৃষ্টভাবে বাক্য স্ফুরণ হইতেছে না। তিনি নীরবে, করযোড়ে পিতার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাহার নয়ন-প্রান্তে অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছে। ব্রহ্মা, নারদের তদবস্থা দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—না জানি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কি ভীষণ প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে! নতুবা নারদের এমন অবস্থা বিপর্য্যয় কেন ঘটিল? যিনি শান্তি আনন্দের মহাসাগর স্বরূপ যিনি ধৈর্য্যে ও স্থৈর্য্যে পর্ব্বতের ন্যায় অচল ও অটল, তাঁহার এমন বিষাদময় নিরানন্দ চাঞ্চল্য কেন উপস্থিত হইল? কেন তাহার প্রশান্ত প্রাণে এমন চাঞ্চল্যের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইল? অবশ্যই আমার সৃষ্টি মধ্যে কোন না কোন ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। নতুবা সামান্য কারণে নারদের প্রশান্ত প্রাণ কখনই বিচলিত হইবার নহে। এইরূপ উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মা ব্যাকুল বাক্যে নারদকে

জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস নারদ, আজি তোমার একি অভাবনীয় ভাব দেখিতেছি? তোমার 'তুমি' বা 'নিজস্ব' বলিয়া বোধ তো কিছুই নাই। লোক-হিতার্থে জগতে ভক্তি আনন্দ আর প্রেম-ধর্ম্মপ্রচার জন্যই তোমার আবির্ভাব—আর সেই জন্যই তোমার ব্রহ্ম হইতে সতন্ত্র বপু ধারণ। তোমার অপ্রাপ্য কিছুই নাই। ভগবানের যাহা কিছু অতীত কালে বিদ্যমান ছিল, বা এক্ষণে আছে অথবা পরিণামে জন্মিবে, সে সকলই তোমার করায়ত্ত। কারণ কেবল ইচ্ছা মাত্রেই তুমি সকলই সচ্ছন্দে সম্ভোগ করিতে পার। আর তাহাই বা বলিতেছি কেন? কারণ তোমার যখন কিছুতেই ইচ্ছা নাই এবং কোনরূপ বিষয় বাসনা নাই—তুমি সর্ব্বক্ষণ আত্মানন্দে পরম পরিতৃপ্ত, তখন তোমার চাহিবারই বা কি আছে, অপ্রাপ্যই বা কি থাকিতে পারে? যিনি সকলের আধার, যাঁহা হইতে সকল ভুত প্রকাশমান, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া, সকল সত্বা প্রকাশ পাইতেছে, সেই ব্রহ্ম স্বয়ং সর্ব্বক্ষণ তোমার অন্তরাত্মায় বিরাজিত। অথবা ইহা একই কথা যে ব্রহ্ম আত্মা বা পরম-আত্মা সচ্চিদানন্দ তোমার আত্মা হইতে পৃথক নহেন, তখন আবার তোমার অভাব কি? কোন দ্রব্যেই যে তোমার অভাব থাকিতে পারে না। যখন কোন বিষয়েই তোমার অভিলাষ নাই আর কোন সামগ্রী পাইলে, তাহা রক্ষার জন্য তোমাকে কোনই চিন্তা করিবার কারণ বা অবসর নাই, তখন তোমার এরূপ চিন্তার কারণ কি ঘটিল? আর তোমার প্রশান্ত আনন্দময় প্রাণে এমন অশান্তি ও বিষাদ কি জন্য উপস্থিত হইল? আমার মনে হয়—ব্রহ্ম স্বয়ং প্রেম

ভক্তির মধুর রস উপভোগ করিবার জন্যই দ্বিধা হইয়া, তোমার ঐ নারদ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। তুমি যখন তোমার ঐ দেবদত্ত বীণায় মূর্চ্ছনা সহযোগে বিভুগুণ গাহিতে গাহিতে স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালাদি ত্রিভুবন ভ্রমণ কর, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন প্রাণী না তাহাতে বিমুগ্ধ হয়? এবং কোন হতভাগ্য জীব তোমার অমৃতময় হরিগুণগান শ্রবণ করিয়া সংসারের সকল শোক তাপ বিস্মৃত হইয়া পরমানন্দ সাগরে সন্তরণ করিতে থাকে? যখন সংসারের সকল জীব তোমার ভাবে, তোমার বিভু-কীর্ত্তনে পরম সুখে আনন্দ-সুধা পান করে—সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণা, সর্ব্বপ্রকার শোক তাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া, গোলোক ধামের অতি স্বপ্ন অমৃত আনন্দ উপভোগ করে, তখন তোমার নিজের তো কোনই অভাব কোনরূপ দুঃখ জন্মিতে বা থাকিতেই পারে না। অধিক, আর কি বলিব—আমি যথার্থই বুঝিয়াছি, সেব্য সেবক দুই ভাবের মধ্যে যে এক অপূর্ব্ব ভাবের ধারা প্রবাহিত, সেই মধুর ভাব আস্বাদনের জন্যই তোমার এই বিভিন্ন দেহ, বিভিন্নরূপ ধারণ। তাই আমার মনে অতি বিস্ময় জন্মিতেছে যে তুমি কি অভাবে—কোন দুঃখে আজি এমন অভিভূত ও অবসাদগ্রস্ত হইয়াছ? জগতে এমন কি অভাবনীয় ভীষণ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, যাহাতে দেবর্ষি নারদের ত্রিতাপাতীত প্রাণকে পরিতপ্ত ও উদ্বেলিত করিতে পারে? অতএব বৎস, আমি বিষম চিন্তান্বিত হইয়া তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি এখনই অকপটে সকল কথা আমাকে প্রকাশ করিয়া বল! কিছুমাত্র গোপন বা মূহুর্ত্ত মাত্র আর কাল বিলম্ব করিও না।”

পিতামহ ব্রহ্মার মুখনিস্থত কথা শুনিয়া দেবর্ষি নারদ চিত্তকে সমাহিত করিয়া কহিলেন,—“পিতঃ! আপনাকে আর কি কহিব? কহিতে ইচ্ছা না থাকিলেও সে কথা আপনার নিকট হইতে গোপন করিয়া রাখা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। যেমন পীড়িত ব্যক্তি যদি চিকিৎসকের নিকট নিজ ব্যাধির কথা বিশদভাবে প্রকাশ না করে, কিছু গোপন করিয়া রাখে, তাহাতে ভীষক যেমন সুচারু রূপে রোগ নির্ণয় করিতে পারে না এবং উপযুক্ত ঔষধি ও প্রকৃষ্ট পথ্যের ব্যবস্থা করিতে পারে না, তাহাতে রোগীর রোগের উপশম না হইয়া, বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেই রূপ সংসারে যে ভীষণ মারাত্মক ব্যাধির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা এসময়ে সর্ব্বব্যাধি-বিনাশক আপনার নিকট পরিব্যক্ত না করিলে, সমগ্র সংসার সত্বরই পাপ তাপে বিনষ্ট হইবে। প্রভো, আপনি ধর্ম্মরক্ষণ ও ধর্ম্মপরিপালনের জন্যই তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ও জীবকুলের সৃজন করিয়াছেন। ধর্ম্মেই সংসারের স্থিতি—ধর্ম্মেই জীবগণের উন্নতি। আপনার প্রতিষ্ঠিত বেদ-বিহিত সনাতন ধর্ম্মই সংসারের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সনাতন ধর্ম্মই জীবকুলের পরিত্রাণের প্রকৃষ্ট পন্থা। আর্য্যাবর্ত্তের সেই সনাতন ধর্ম্ম এক্ষণে অতীব সঙ্কীর্ণ ও মলিন হইয়া উঠিয়াছে। নানা অপধর্ম্ম তাহাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়াছে ও তাহার বিনাশ সাধনের উপক্রম করিয়াছে। তাহাকে রক্ষা করিতে হইলে —সংসারকে এই ঘোর সঙ্কট-সঙ্কুল-ধর্ম্মবিপ্লব হইতে উদ্ধার করিতে হইলে, সত্বরই কোন সদুপায় নির্দ্ধারণ নিতান্তই আবশ্যক। পরম পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের দুর্দ্দশা দেখিয়া, তথায় মানবকুলের

অধঃপতন স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া, আমার প্রাণ বড়ই ব্যথিত হইয়াছে। দেব, আপনাকে আর কি কহিব? আপনি সর্ব্বজ্ঞ— আপনি অবশ্যই জানিতেছেন এবং বুঝিতেছেন যে সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে, জগৎ ও জগতের জীবকুল কিছুতেই রক্ষা পাইবে না। তাই আমার একান্ত প্রার্থনা আপনি স্বচক্ষে একবার ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করুণ।”

দেবর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া, চতুর্ম্মুখ চিন্তান্বিত হইয়া মনে মনে নানারূপ ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে কিছুই নির্দ্দিষ্ট ভাবে স্থির করিতে না পারিয়া কহিলেন,—“বৎস, আমার মনে হয় দেবদেব মহাদেব এসম্বন্ধে সদুপায় নির্দ্ধারণে সমর্থ। তুমি, পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে যেরূপ ধর্ম্মবিপ্লবের সংবাদ কহিলে, তাহাতে স্বয়ং শঙ্কর কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত উপায় অবলম্বন ব্যতীত ধর্ম্মোদ্ধারের আর উপায় নাই বলিয়া আমি বিবেচনা করি।”

নারদ কহিলেন,—“তাত, তবে আর বিলম্ব করিবেন না। চলুন সত্বর আমরা দেবপতি শঙ্করের সন্নিধানে গমন করি। তাঁহার নিকট এই ধর্ম্মসঙ্কটের সমুদয় অবস্থা যথাযথ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করি। তিনি আপনার সহিত যুক্তি পরামর্শ করিয়া, যেরূপ সৎ উপায় অবধারণ করিবেন, তাহাই অবলম্বিত হইবে।”

‘তবে তাহাই হউক।’ বলিয়া ব্রহ্মা, নারদকে সঙ্গে লইয়া মহাদেবের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। যথা সময়ে উভয়ে পরম রমণীয় কৈলাস-শিখরে সমুপস্থিত হইলেন। পরস্পর কুশলাদি বার্ত্তা আলাপনের পর, শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন,—“চতুর্ম্মুখ, আজি

আপনি স্বয়ং দেবর্ষিকে সঙ্গে লইয়া আমার আলয়ে কি কারণে উপস্থিত হইলেন? অবশ্যই কোন বিশেষ কারণ ঘটিয়া থাকিবে। নতুবা আপনারা উভয়ে কি নিমিত্ত একযোগে আমার আবাসে আগমন করিবেন?”

শঙ্করের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ব্রহ্মা কহিলেন;—“দেবপতি মহাদেব, আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহাই সত্য। বাস্তবিক বড় বিষম কারণই সংঘটিত হইয়াছে। সংসারে ভয়ঙ্কর ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত। ধর্ম্মস্থান ভারতক্ষেত্র নানারূপ অপধর্ম্মের আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাহাতে সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম পরিম্লান ও মৃতকল্প হইয়া উঠিয়াছে। আমি দেবর্ষি নারদের মুখে যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে আমার বড়ই আশঙ্কা হইতেছে। ধর্ম্মের এ বিড়ম্বনার কালে আপনি ভিন্ন আর কেহই পবিত্র সনাতন ধর্ম্মের উদ্ধারসাধন করিতে পারিবেনা।”

ব্রহ্মার কথা শুনিয়া মহাদেব চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন,—“আমিও তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি। এবং ধর্ম্ম-ক্ষেত্র ভারতে যে আমাদের অবতরণ প্রয়োজন, তাহাও স্থির করিয়াছি।”

এইরূপ কথাবার্ত্তায় দেবত্রয় সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন যে শঙ্কর স্বয়ং ধর্ম্মরক্ষার্থ—বৈদিক ধর্ম্মের গ্লানি বিদূরিত করিবার জন্য—ভারতের পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিবেন এবং তত্ত্বজ্ঞান ও সৎ বিদ্যার প্রচার দ্বারা সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের উদ্ধার সাধন করিবেন।”

এই সময়ে পরম শিবভক্ত শঙ্কর-পিতা ও শঙ্কর জননী, চিদম্বরে

বিখ্যাত শিবমূর্ত্তি আকাশ-লিঙ্গের সন্নিধানে কঠোর ব্রত তপস্যা অবলম্বন করিয়া, শিব আরাধনায় নিরত ছিলেন। শঙ্কর তাঁহাদেরই অপত্যরূপে অবতীর্ণ হইবার সঙ্কল্প করিলেন এবং অচিরে আচার্য্য শঙ্কর রূপে আবির্ভূত হইলেন। তাই হিন্দু-সমাজে,—"শঙ্কর শঙ্কর স্বয়ং" বলিয়া সর্ব্বত্র বিঘোষিত ও সংপূজিত।

শঙ্কর-বংশ ও সাময়িক ব্যক্তিগণ।

শঙ্কর যথন স্বয়ং অবতীর্ণ হইবার সঙ্কল্প করিলেন, তথন ব্রহ্মাকে কার্ত্তিকেয়কে ও ইন্দ্রকে এবং ব্রহ্মার পত্নী দেবী স্বরস্বতীকেও ভূতলে অবতীর্ণ হইবার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুসারে শঙ্কর আপনি শঙ্করাচার্য্য এবং ব্রহ্মা মণ্ডন মিশ্র, কুমার কার্ত্তিকেয় ভট্টপাদ কুমারিল, ইন্দ্র রাজা সুধন্ব৷ এবং দেবী স্বরস্বতী মণ্ডনের পত্নী সারসবাণী রূপে অবতরণ করিলেন। ভট্টপাদ কুমারিল পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিপক্ষরূপে, সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাকল্পে বিবিধ কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি জৈমিনীকৃত 'পূর্ব্বমীমাংসার' সুন্দর টীকা করিয়া নানারূপে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রচার করেন। তিনি আবির্ভূত হইয়া দেখিলেন, ধর্ম্ম কর্ম্মের নিদানভূমি ভারত-ভূমি হইতে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের তিরোধান ঘটিতে বসিয়াছে। এইরূপ নিদারুণ ধর্ম্ম-বিপ্লবের অবস্থা দেখিয়া, সনাতন ধর্ম্মের উদ্ধারের জন্য ক্রিয়া-কাণ্ডের প্রচার আরম্ভ করিলেন। মৌখিক যুক্তি উপদেশ দ্বারা যতদূর সম্ভব সে কার্য্য সাধন করিতে লাগিলেন। তৎপরে সে সম্বন্ধে নানারূপ গ্রন্থ প্রচার করিতে লাগিলেন। সেই সকল গ্রন্থ পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচার করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন যে ধর্ম্মের আদি স্তরে কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান নিতান্তই প্রয়োজন। তাহার কর্ম্ম-বাদ প্রচার কল্পে জৈমীনির পূর্ব্বমীমাংসার টীকা

বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল। কারণ পূর্ব্বমীমাংসা কর্ম্মবাদের গূঢ় তত্ত্ব নিরূপন দ্বারা বৈদিক যজ্ঞ-কর্ম্মের যথেষ্ট পৃষ্টপোষণ ও পুষ্টিসাধন করিয়াছিল। কুমারীল যেমন ক্রিয়াকাণ্ডের প্রচার দ্বারা বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিলেন, তেমনি আবার যুক্তি-তর্কাদি দ্বারা নিজে ও শিষ্যগণ দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের নাস্তিকতা ও তাহাদের সমর্থিত শূণ্য বাদ নানাস্থানে নানাভাবে খণ্ডন করিতে লাগিলেন। ভটুপাদ কুমারীলও তদীয় শিষ্যগণ দ্বারা নাস্তিক বৌদ্ধধর্ম্ম, আচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্ব হইতেই বিশেষরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহারই প্রবল প্রতিপক্ষতায় বৌদ্ধধর্ম্ম দক্ষিণাপথে নিতান্তই হীনপ্রভ হয়। রাজা সুধন্বা বৌদ্ধ দমন কল্পে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

কুমারীল-শিষ্য মুণ্ডন মিশ্র এই সময়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ প্রতিভা তৎকালে ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। ইনিও মীমাংসাশাস্ত্রের পন্থা অনুসারে কর্ম্মকাণ্ডের প্রচার প্রতিষ্ঠায় বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। মুণ্ডনের পত্নী সারসবাণী (অভয়া দেবী) এই সময়ে আবির্ভূত হইয়া, বিদ্যা বুদ্ধির জন্য সর্ব্বত্র সন্মানিত হইয়াছিলেন। বিশেষ বিদূষী এবং তীক্ষবুদ্ধিশালিনী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি চারিদিকে এতই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল যে সকলেই তাঁহাকে দেবী ভারতীর অংশরূপিনী রূপে ভক্তি শ্রদ্ধার উপহার প্রদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে নাই। তাঁহার পিতা পরম বিদ্বান ও নিষ্ঠাবান পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। সারসবাণী পিতৃগৃহে বেদ বেদাঙ্গ

ও ষড়দর্শন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। মুণ্ডনের সহিত তাঁহার উদ্বাহ-ক্রিয়া অতি অপূর্ব্ব-ভাবে সমাহিত হইয়াছিল। দম্পতি-যুগলের ন্যায় তাহাদের পিতৃদ্বয়ও বিশেষ বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান ছিলেন। তাই তাঁহাদের বিবাহ ব্যাপারে একটু অপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হয়। এস্থলে সে সম্বন্ধে একটু সংক্ষেপে উল্লেখ করিলে উপাদেয় শিক্ষাপ্রদ হইবে বিবেচনায় নিম্নে তাহা বর্ণিত হইল।

মুণ্ডনের পিতা হিমানী মিশ্র মহা পণ্ডিতও পরম জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যেমন আচার ব্যবহারে আনুষ্ঠানিক হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন, তেমনি পাত্রীর পিতাও বৈদিক যজ্ঞক্রিয়া এবং বৈদিক জ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাই এই বর পাত্রীর বিবাহ উপলক্ষে বৈদিক যজ্ঞ ও বৈদিক অনুষ্ঠানের প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল। স্বামীগৃহে গমন কালে কন্যাকে, পিতা যে সনাতন ধর্ম্ম-অনুযায়ী উপদেশ কয়টী প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কারণ হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে বিবাহ-ব্যাপার মানব-জীবনের অতি শ্রেষ্ঠ পরম পবিত্র ব্যাপার বলিয়া বিহিত হইয়াছে। বিবাহকাণ্ডকে, হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুজাতি যেমন পবিত্র চক্ষে ধর্ম্ম-দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে এমন জগতের কোন শাস্ত্র বা কোন জাতিই দেখে না। কন্যার পিতা কন্যাকে পতিগৃহে প্রেরণ কালে যে কয়টী সারবান শাস্ত্রীয় উপদেশ প্রদান করেন সেই অতি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-উপদেশগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল। এ সকল কথা যে কন্যার পিতা নিজে রচনা করিয়া বলিয়াছিলেন

এমন নহে। এই সারবান উপদেশ গুলি বৈদিক ধর্ম্মানুগত। বেদ হইতে মহাভারত পুরাণাদি সর্ব্বত্র সে উপদেশ গুলি লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বিবাহ ব্যাপারে সেগুলি মহামন্ত্ররূপে সমাদৃত। কন্যাকে সেই উপদেশ গুলি স্মরণ করাইবার জন্য পিতা কহিতে লাগিলেন,—"বৎসে, তুমি এই প্রথম স্বামীগৃহে গমন করিতেছ। তোমার জীবনে ইহা অতি শ্রেষ্ঠ ও পরম পবিত্র ঘটনা। হিন্দু রমণীর পক্ষে এমন ঘটনা আর কিছুই নাই। তুমি সর্ব্বদা মনে রাখিও ইহকালে পরকালে, সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময়ে পতি তোমার একান্ত আত্মীয়। এমন আত্মীয় জগতে আর তোমার কেহই নাই। ইনি যেমন তোমার একমাত্র আত্মীয়, তেমনি একমাত্র গতি। ইনি ব্যতীত তোমার আর গত্যন্তর নাই। স্বামীকে সর্ব্বদা মনে প্রাণে প্রণয় ও শ্রদ্ধার উপহার প্রদানে বিরত হইবে না। স্বামীকে পতিব্রতা রমণীর একমাত্র উপাস্য দেবতা বলিয়া জানিবে। স্বামীর পিতা মাতাকে আপন পিতা মাতা মনে করিবে। স্বামীর ভ্রাতাকে নিজ ভ্রাতা এবং স্বামীর আত্মীয় স্বজনকে আপনারই আপনজন বলিয়া সর্ব্বদা সমাদর করিবে ও তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিতে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিবে। যদি কখন স্বামীর নিকট কোনরূপ দোষে দোষী হও, তবে তাহা অস্বীকার করিও না বা বাক্যজাল বিস্তার করিয়া সে দোষের সমর্থন বা অপলাপ করিবার চেষ্টা করিও না। তাঁহার নিকট আপনার দোষ বা ত্রুটীর কথা স্বীকার করিয়া অতি বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। স্বামীকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবার জন্য যত্নবতী হইবে। যদি কোন কারণে তাঁহাকে

বিষণ্ণ ভাবাপন্ন দেখিতে পাও—অথবা তাঁহাকে কোন কারণে উদ্বিগ্ন বা চিন্তাক্লিষ্ট বলিয়া বিবেচনা কর, তবে কি উপায়ে তাঁহার চিন্তা দূর করিতে পার—কি বিধানে তাঁহার বিষাদ বিদূরিত করিয়া তাঁহাকে প্রফুল্ল করিতে পার, সে পক্ষে বিশেষ মনোযোগী হইবে। সর্ব্বদা মিষ্টবাক্য প্রয়োগ করিয়া স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখিতে প্রয়াস পাইবে। কারণ পতি পত্নী উভয়ের মধ্যে একজন অসন্তুষ্ট হইলে, সংসার দুঃখের আলয় হইয়া উঠে। তাহাতে গৃহধর্ম্ম সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। পতি পত্নী এই দুই জন লইয়াই প্রধানতঃ হিন্দুর গার্হস্থ্য-আশ্রম। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে সকল প্রকার আশ্রমের মধ্যে গৃহ-আশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ গার্হস্থ্য আশ্রমে অন্য সকল আশ্রমের মনুষ্য আশ্রয় লাভ করিতে পারে এবং তথা হইতে আহারাদি সাহায্য পাইয়া থাকে। গৃহ-আশ্রমের শীর্ষ-স্থান পতি। পতি প্রসন্ন না থাকিলে, গৃহ আশ্রমের উন্নতি লাভ হয় না; বরং উহা উৎসন্ন হইয়া যায়। পতিকে প্রসন্ন রাখিবার প্রধান উপাদান স্বরূপ পত্নী ভিন্ন আর কেহই নহে একথা সর্ব্বক্ষণ পত্নীর মনে রাখা প্রয়োজন। পত্নীকে লইয়া স্বামী সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন ইহাই হিন্দু শাস্ত্রের একটী শ্রেষ্ঠ বিধান। পতি অসন্তুষ্ট থাকিলে যজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে না। তাহাতে কুলধর্ম্ম কলুষিত ও বিলুপ্ত হয়। পত্নীর অপর এক নাম সহধর্ম্মিণী। কারণ পত্নীকে লইয়াই পতি সর্ব্বপ্রকার আশ্রমিক ধর্ম্ম-ক্রিয়া সাধন করিয়া থাকেন। পতিকে উৎসাহিত ও প্রসন্ন রাখিয়া যাহাতে কুল-ধর্ম্ম বা অপর

যাবতীয় শুভ ধর্ম্মের ও মাঙ্গলিক ক্রিয়াকলাপের পরিচর্য্যা ও অনুশীলন হইতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা পত্নী-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। সাধ্বী রমণী সর্ব্বদা পতি-ধ্যান ও পতি জ্ঞান-নিরত রহিবেন। পতি গৃহে থাকিলে সুশোভন বেশভূষায় তাঁহার নয়ন রঞ্জন করিবে। তিনি গৃহ হইতে স্থানান্তরে গমন করিলে মনোহর অলঙ্কারাদি উন্মোচিত করিয়া রাখিবে। স্বামীর নিকট ভিন্ন পত্নী অন্য কোথাও কোনরূপ হাস্য পরিহাস বা আলাপনাদি করিবে না। স্বামীর বন্ধু ও অপর কোন অতিথি স্বামীর অনুপস্থিতি কালে স্বামীগৃহে আগমন করিলে বিশেষ যত্ন সহকারে তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিবে। স্বামীর বিষয় বিভব নিজের মনে করিয়া সযত্নে তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।" এইরূপ বহু সৎ উপদেশ প্রদান করিয়া, পিতা তদীয় কন্যাকে মুণ্ডনের গৃহে প্রেরণ করিলেন। যদিও মুণ্ডনের কন্যা পরম পণ্ডিতা ও সর্ব্ব শাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিলেন, তথাপি পিতা স্বীয় কর্ত্তব্য মনে করিয়া উপরিউক্ত উপদেশ সমূহ কন্যাকে বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। কন্যা সারসবাণীও পিতার উপদেশ সমুহ হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক রাখিয়া ছায়ার ন্যায় পতি মণ্ডনের অনুবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন। মুণ্ডনের সহিত শঙ্করের যে তর্কযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতেই ইহা বিশেষরূপে সপ্রমাণিত হইয়াছে।

অতঃপর শঙ্করার্য্যের স্বীয় বংশের কথা একটু বিশেষ ভাবে এস্থলে বলা আবশ্যক। শঙ্কর-বংশ অতি উচ্চ ও পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশ। এই বংশ দক্ষিণাপথে নাম্বুত্তরি ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত ও

সুবিখ্যাত। আর্য্যাবর্ত্তের অপর ব্রাহ্মণ বংশের সহিত আচার অনুষ্ঠান ও বাহ্যচিহ্ন লক্ষণাদিতে ইহাঁদের বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। শঙ্কর যে নাম্বত্তরি বংশ-শাখায় জন্মগ্রহণ করেন ধর্ম্ম, সাধুতা ও অন্যান্য বিবিধ সৎগুণে, উহা সর্ব্বসাধারণ মধ্যে বিশেষ সম্মানিত ও সমাদৃত ছিলেন। এই বংশ পরম শৈব। শিবের ভজন, সাধন, এই বংশজ ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের একমাত্র শ্রেষ্ঠ কৌলিক ধর্ম্ম ছিল। তাঁহারা প্রায় সকলেই শঙ্করের আরাধনায় জীবন অতিবাহিত করিতেন। শঙ্করের পিতামহ একজন অতি প্রধান শিবভক্ত ধার্ম্মিক মহাপুরুষ ছিলেন। জ্ঞান ও সততা দ্বারা তিনি নিজ বিদ্যাধর নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার শিবভক্তি ও শিবসাধনা দেখিয়া কেরলাধিপতি, তাঁহাকেই নিজ প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্ত্তি আকাশলিঙ্গের প্রধান পূজকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এজন্য বিদ্যাধর রাজার নিকট হইতে বহু বৃত্তি ও সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেই বৃত্তি ও সম্পত্তি হইতে তাঁহার পারিবারিক ভরণপোষণ অতি সুন্দরভাবে নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা ছিল। তিনি বেশ সদ্ব্যয়ী সদাশয় মহাত্মা ছিলেন। রাজদত্ত বৃত্তি দ্বারা কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া, যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা হইতে অতিথিসৎকার ও দরিদ্র আত্মীয় স্বজনের উপকার সাধন করিতেন। তাঁহার এইরূপ সৎ ও সাধু ব্যবহারে সকল লোকই তাঁহার প্রতি পরম প্রীত ও পরিতুষ্ট ছিল।

যথাসময়ে মহাত্মা বিদ্যাধরের একটি সুসন্তান জন্ম গ্রহণ

করিল। বিদ্যাধর সন্তানের সুলক্ষণ সন্দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। প্রকৃত শিবভক্তের যেরূপ বাহ্য লক্ষণ হইয়া থাকে বা হওয়া উচিৎ, বিদ্যাধর পুত্রের মূর্ত্তিতে সেই সকল বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া, শিবগুরু নামে পুত্রের নামকরণ করিলেন। এই শিবগুরুই শঙ্করাচার্য্যের জনক।

উপযুক্ত বয়ক্রমে, শিবগুরু উপবীত ধারণ করিয়া দ্বিজত্ব লাভ করিলেন। তদনন্তর তিনি বিদ্যালাভের জন্য গুরুগৃহে প্রেরিত হইলেন। গুরুগৃহে বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি বহু প্রধান প্রধান শাস্ত্র-অধ্যয়ন সমাপন করিয়া গুরুকে পরিতুষ্ট করিলেন। গুরুদেব তাহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন ও স্নেহশীল ছিলেন। শিবগুরুর অধ্যয়ন শেষ হইলে, তাঁহার গুরুদেব কহিলেন,—"বৎস, শিবগুরু তোমার পিতা তোমার সুশিক্ষার জন্য আমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমি বিশেষ-যত্নের সহিত তোমাকে সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠবিদ্যায় শিক্ষাদান করিয়াছি। ব্রাহ্মণ সন্তানের যাহা কিছু শিক্ষণীয়, সেসকল পরম বিদ্যায় তুমি সুন্দররূপে সুশিক্ষিত হইয়াছ। বেদ বেদান্ত বা দর্শনাদি সকল বিদ্যায় তুমি উত্তমরূপে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছ। অতএব এক্ষণে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পার।"

পুত্র শঙ্করের ন্যায় পিতা শিবগুরুও বাল্যকাল হইতেই সংসারে অনাসক্ত উদাসীন ভাবাপন্ন ছিলেন। গুরুদেব যখন প্রিয় শিষ্য শিবগুরুকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে কহিলেন, তখন তিনি বিষণ্ন বদনে নীরব হইয়া রহিলেন। গুরুদেব তাঁহার মনের ভাব

বুঝিয়া কহিলেন,—“তোমার এ সম্বন্ধে কি ইচ্ছা তাহা আমার নিকটে অকপটে পরিব্যক্ত করিতে পার।”

শিবগুরু তথন করযোড়ে বিনীত ভাবে কহিলেন,—“গুরুদেব, আমি আপনার আদেশ কথনই লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছা করিনা; তবে আপনার নিকট মনোভাবও গোপন করিতে ইচ্ছা করিনা।”

গুরুদেব কহিলেন,—‘তোমার কি ইচ্ছা আমার নিকট ব্যক্ত কর। আমি তোমার সকল কথা শুনিয়া, তোমার পক্ষে যাহা উপযুক্ত ও বিধেয় সেইরূপ অনুমতি প্রদান করিব।”

শিবগুরু কহিলেন,—“দেব, আমার সংসার-বাসনা আর নাই। আপনার শিক্ষায় আমার সংসার-মোহ বিনষ্ট হইয়াছে। আমার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে যে সংসারে কিছুমাত্র সুখ নাই। সংসার কেবল মোহজনিত দুঃখের আলয়। সংসারে যে সুখভোগ হয়, তাহা ভ্রান্ত মূঢ়ের পক্ষেই উপাদেয় বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি তত্ত্ব-অনুশীলন করিতে ইচ্ছা করে, যে জন প্রকৃষ্ট পন্থায় পরিচালিত হইতে ইচ্ছুক, তাহার পক্ষে সংসার অতীব অসার ভিন্ন আর কিছুই নয়। সংসারের সকল প্রকার ভোগসুখকে অতি তুচ্ছ বলিয়া পরিহার জন্য সেই জ্ঞানী ব্যক্তি সদাই উৎসুক হইয়া থাকে। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন বিশেষ বিদ্বান ও জ্ঞানী ব্যক্তি সংসারে কিছুকাল বাস করিলে, তাহারও মতিভ্রম ঘটিয়া থাকে। তেমন ব্যক্তিও তত্ত্ব কথা ভুলিয়া যায়। মূঢ়মতি হইয়া সেও ভোগসুখের জন্য প্রমত্ত হইয়া উঠে। সে ব্যক্তিও মানব জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য

ভুলিয়া যায়। সংসারে এতই প্রলোভন—কামিনী কাঞ্চনের এমনই মোহ ও আকর্ষণ যে তাহাতে আসক্ত বা বিজড়িত হইলে, মনুষ্যের—সে যতই বিদ্বান বা বুদ্ধিমান হউক না কেন—তাহার উদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত হইয়া উঠে। এই সকল কথা আমি যতই মনে মনে আলোচনা করিতেছি ততই আমার হৃদয়ে সংসার-বিতৃষ্ণা বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছে।

তরুণ বয়স্ক শিষ্যের মুখে এইরূপ জ্ঞানগর্ভ কথা শ্রবণ করিয়া, গুরুদেব বিস্মিতবদনে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণপরে কহিলেন,—"তবে কি তুমি গৃহে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা কর না।"

শিবগুরু কহিলেন,—"দেব, আমার একান্ত বাসনা যে সতত আপনার নিকট থাকিয়া বেদ অনুশীলন, অধ্যাত্ম বিদ্যার পরিচর্চ্চা এবং বেদান্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া জীবন অতিবাহিত করি। গৃহে গমন করিয়া আর দেহমনকে কলুষিত করিতে ইচ্ছা করিনা। ইহাই সঙ্কল্প করিয়াছি যে যতদিন এই নশ্বর দেহ ধারণ করি, ততদিন আপনার নিকট রহিয়া তত্ত্ববিদ্যার অনুশীলনে অতিবাহিত করিব।"

গুরু কহিলেন—'শিবগুরু, সে সন্ন্যাস-ধর্ম্মের সময় তোমার এক্ষণে উপস্থিত হয় নাই। এক্ষণে তোমার সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করাই কর্ত্তব্য। যে সংসারে থাকিয়া পিতামাতার সেবা না করে বা আশ্রিত অনুগত আত্মীয় স্বজনের প্রতিপালন ও অতিথি সৎকারাদি সৎ ও শুভক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে না

পারে, সে সুদৃঢ় হইয়া উচ্চধর্ম্ম বা শ্রেষ্ঠ পন্থার অনুসরণে কখনই সমর্থ হয় না। সংসার আশ্রমে থাকিয়া মনুষ্য, দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ প্রভৃতি ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। সে সকল ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিলে, মানবজীবনের কোন তপস্যা বা ধর্ম্মসাধনা সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া তোমার এক্ষণে নিজভবনে প্রত্যাগমন করাই বিধেয়। আমি বুঝিতেছি যে তোমার দ্বারা সংসারের কোন বিশেষ কর্ম্মই সংসাধিত হইবে। অতএব গৃহে গমন করিয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও। এবং সংসার-আশ্রমের বিহিত ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিয়া, পরে যাহা সৎ ও শুভ বলিয়া বোধ করিবে, তাহাই করিও।"

শিবগুরু, গুরুদেবের শেষ উপদেশ শ্রবণ করিয়া আর কোন কথা কহিলেন না। পিতৃগৃহে গমন করিয়া প্রচুর গুরুদক্ষিণা লইয়া গুরুগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং গুরুদেবের চরণে সেই দক্ষিণা প্রদান করিয়া পরম ভক্তিসহকারে গুরুপদে প্রণিপাত করিলেন। গুরু-আশ্রম হইতে বিদায় লইয়া, শিবগুরু স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

শিবগুরু গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, কিছুদিন পরে পরম পবিত্রভাবে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। দাম্পত্য-প্রেমে পরিতৃপ্ত হইয়া, শিবগুরু পত্নীসহ পরম আনন্দে সংসারে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদের, পতি ও পত্নী উভয়ের, যৌবন-কাল অতীত হইলে, প্রৌঢ় অবস্থা আসিয়া উপস্থিত

হইল। তখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের সন্তান হইল না। তাহাতে শিবগুরু স্বয়ং ও তদীয় পত্নী কামাক্ষীদেবী অতীব বিষণ্ণ হইয়া দিনের পর দিন কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শিবগুরু মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—হায় একি হইল। গুরুদেবের আদেশে গৃহধর্ম্মে নিরত হইলাম। গৃহধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান পুত্র। সংসার-বাসী হইয়া, দ্বার পরিগ্রহ করিয়া, যদি পুত্রের মুখ না দেখিতে পাইলাম, তবে আর সংসার বাসের ফল কি হইল? পুত্র উৎপন্ন না হইলে পুন্নাম নামক নরক হইতে পরিত্রাণ লাভের অন্য উপায় নাই। পুত্র না জন্মিলে পিতৃপুরুষগণের পিণ্ড লুপ্ত হয়। তাহাতে কুল-ধর্ম্ম কলুষিত হইয়া থাকে। এমন পুত্রহীন আঁধারময় জীবন নিতান্তই নিস্ফল। এইরূপ চিন্তায় পরিতপ্ত হইয়া শিবগুরু নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে জীবন-ভার বহন করিতে লাগিলেন। পতিব্রতা পত্নীও পুত্রাভাবে, তদুপরি পতির সেই নির্ব্বিণ্ন ভাব দর্শন করিয়া, অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। এইরূপে পতি পত্নী উভয়েই পুত্রঅভাবে সংসারকে অতি অসার ও বিষাদের আগার বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমতী ধর্ম্মশীলা পত্নী একদিন পতিকে কহিলেন,—"আর্য্য, এরূপ বিষণ্ণমনে আর বৃথা কালক্ষেপ করিয়া প্রয়োজন কি? আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পরম পণ্ডিত। আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি স্ত্রীজাতি হইয়া আপনাকে আর কি উপদেশ বা পরামর্শ প্রদান করিব? তবে আমার মনে একটি কথার উদয় হইয়াছে। সে কথাটি আপনার নিকট ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিনা—এবং তাহা না বলিয়া নীরবে

থাকাও বিধেয় বলিয়া বিবেচনা করিলা। কারণ পতিই রমণীর একমাত্র গতি। সুখ সৌভাগ্য, দুঃখ দুর্দ্দশা যে কোন অবস্থা স্ত্রীলোকের ভাগ্যে সংঘটিত হয় অথবা ভালমন্দ যে কথা পত্নীর মনে উদিত হয়, তাহা সরলভাবে স্বামীর নিকট প্রকাশ করা পতিপরায়ণা রমণীর একান্ত কর্ত্তব্য।”

পত্নীর কথা শুনিয়া শিবগুরু কহিলেন,—“তুমি যাহা কহিলে তাহা অতীব সত্য। পত্নীর মনে সুখ দুঃখ সম্বন্ধে যে কোন ভাবের উদয় হয়, তাহা অকপটে পতির নিকট ব্যক্ত করা সাধ্বী পত্নীর পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমরা যে অবস্থায় পতিত হইয়াছি, তাহাতে আমাদের উভয়েরই মনে সুভাব বা কুভাব অনেক সময় স্বতঃই উদিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব তোমার মনে বর্ত্তমানে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহা অনায়াসে অকপটে আমার নিকট বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়া বল। যদি তোমার প্রাণের মধ্যে কোন সুভাব বা কুভাবের উদয় হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করিতে তোমার কুণ্ঠিত হইবার কোনই কারণ নাই।”

পতির বাক্যে উৎসাহিত হইয়া কামাক্ষী দেবী কহিলেন,—“স্বামিন, আমার মনে হইয়াছে আমাদিগকে পুত্রের অভাব জন্য বিষণ্নমনে বৃথা কালক্ষেপ করা বিধেয় নহে। বরং পুত্রলাভের জন্য দৈবক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠানই আমাদের পক্ষে এক্ষণে নিতান্ত কর্ত্তব্য। দৈবক্রিয়ার অনুষ্ঠানে দেব-কৃপা লাভ করিতে পারিলে সকল অভীষ্টে—সর্ব্বপ্রকার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারা

যায়। বিশেষতঃ আমরা কৌলিক বিধান অনুসারে যে দেব-দেবের ভজনা ও আরাধনা করিয়া থাকি সেই দেবাদিদেব মহাদেব প্রসন্ন হইলে, সকল শুভ ফলই সত্বর প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব সুপুত্রলাভের জন্য আমরা উপাসনা ও ব্রত নিয়মাদি অবলম্বন করিয়া, সেই সর্ব্বার্থপ্রদ ভগবান শঙ্করের আরাধনায় কায়মনোবচনে নিরত হই। তাহাহইলে মহাদেব কৃপা করিয়া অবশ্যই আমাদিগকে পুত্র ফল প্রদান করিবেন।”

শিবগুরু পত্নীর বাক্যে পরম আহ্লাদিত ও উৎসাহিত হইলেন; এবং উৎসাহভরে প্রফুল্ল বদনে কহিলেন,—“প্রিয়ে, তুমি অতি বুদ্ধিমতী। তুমি যুক্তি বলে যে সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিয়াছ, তাহাই আমাদের পক্ষে এক্ষণে একমাত্র অবলম্বনীয়। অতএব উভয়ে মিলিয়া আমরা একান্ত মনে শঙ্করের আরাধনায় প্রবৃত্ত হই।”

এই বলিয়া শিবগুরু ও তদীয় পত্নী সেই দিবস হইতে পরম পবিত্রভাবে সমাহিত চিত্তে কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া শিব-আরাধনায় ও শিবতপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। কোনদিন অদ্ধাশনে, কোন দিন অনশনে, কখন বা কেবলমাত্র ফলমূল ভোজন করিয়া উভয়ে শিব-সাধনা করিতে লাগিলেন। শিবগুরু দারুণ শীতে জলমগ্ন হইয়া, গ্রীষ্মে প্রজ্বলিত হুতাশনের সমীপস্থ হইয়া, শিবের তপস্যা করিতে লাগিলেন।

আশুতোষ শঙ্কর তাঁহাদের তপস্যায় পরিতুষ্ট হইলেন। একদিন নিদ্রাঘোরে শিবগুরু স্বপ্ন দেখিলেন—এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ

তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রসন্ন-বদনে কহিলেন,—"বৎস, তোমাদের তপস্যা সফল হইয়াছে। তোমরা অচিরে পুত্র ফল লাভ করিবে। এক্ষণে তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। তোমাকে দুই প্রকার পুত্র প্রদান করিতে পারি। এক প্রকার পুত্র পরম বিদ্বান জ্ঞানী ও সাধু হইবে। কিন্তু তাহার পরমায়ুকাল অতি অল্প পরিমাণ। আর এক প্রকার পুত্র মূর্খ জ্ঞানহীন হইবে। কিন্তু সে বহুকাল পর্য্যন্ত দীর্ঘজীবী হইয়া রহিবে। এই উভয় জাতীয় পুত্রের মধ্যে তুমি কিরূপ পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছুক তাহা আমার নিকট সরল হৃদয়ে প্রকাশ কর।"

শিবগুরু স্বয়ং মহা পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। মূর্খ জ্ঞানহীন পুত্র তাঁহার পক্ষে যমসম। তেমন পুত্রলাভ অপেক্ষা পুত্রহীন হইয়া থাকাই পরম মঙ্গল। তিনি সেই ব্রাহ্মণের প্রশ্ন শুনিয়াই কহিলেন;—"না, দেব, আমি মূর্খ পুত্র লাভ করিতে কিঞ্চিমাত্রও ইচ্ছা করিনা। যদি কৃপা করিয়া পুত্রধন প্রদানে চরিতার্থ করেন তবে অনুগ্রহ করিয়া সাধু সুপণ্ডিত পুত্রই প্রদান করুন।"

"তাহাই হইবে" বলিয়া ব্রাহ্মণ অন্তর্দ্ধান করিলেন। শিবগুরুর নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তিনি আনন্দিত মনে পত্নীকে ডাকিয়া কহিলেন,—"প্রিয়ে, এতদিনে বোধ হয় দেবাদিদেব মহাদেব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তাঁহার কৃপায় আমরা সত্বরই সুপুত্র লাভে সমর্থ হইব।" এই বলিয়া স্বপ্ন-দৃষ্ট সমস্ত ব্যাপার

পত্নীকে কহিলেন। পত্নী, পতির কথা শুনিয়া নিরতিশয় আনন্দিত ও মহা উৎসাহিত হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহারা শঙ্করের ন্যায় পুত্র লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইলেন।

শঙ্করের জন্ম সম্বন্ধে মতান্তরে যেরূপ কথিত হইয়াছে, জীবনীতেও সংক্ষেপে তাহা উল্লিখিত হইল। শঙ্করের জীবনী ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন ভাবের কথা কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মাধবাচার্য্যের 'শঙ্কর বিজয়'' ও আনন্দগিরির 'শঙ্কর বিজয়' নামক গ্রন্থ দুইখানি প্রামাণ্য বলিয়া পরিগৃহীত ও সমাদৃত কিন্তু সেই দুইখানি গ্রন্থেও বহুল পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে সে পার্থক্যের সামঞ্জস্য সাধন অতীব দুষ্কর।

জীবনী ও দিগ্বিজয়।

আর্য্যসমাজের বহু মহাপুরুষের ন্যায় আচার্য্য শঙ্করের জন্মকাল সম্বন্ধে বহু মতভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোন ঘটনার যথাযথ কাল বা অব্দ কখনই বিশদরূপে লিপিবদ্ধ হয় নাই। প্রাচীনকালের কোন লেখক সন তারিখ বাঁধিয়া রাখিবার রীতি পদ্ধতি কখন অনুসরণ করেন নাই। মহাভারত রামায়ণে বা অন্য কোন পুরাণে ঠিক কাল বা বৎসর ধরিয়া কোন ব্যাপার কখন লিখিত হয় নাই। সাময়িক তিথি বা রাশি অনুসারে অবশ্য কোন কোন বিশেষ ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। এবং সেই তিথি রাশি ধরিয়া, অধুনা কোন কোন মনস্বী, ঐতিহাসিক ঘটনার সময় ও তাহার সন তারিক নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়া থাকেন। সে সম্বন্ধে অনেক সময় অনেক ঐতিহাসিকের মধ্যেও মত-পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তাই বেদের কাল নির্দ্ধারণ, ও রামায়ণ মহাভারতের সন তারিখ নিরূপণ সম্বন্ধে প্রায়ই বিষম গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। বহু প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া, অধুনাতন অদূরবর্ত্তী অতীতের ঘটনায় কালের নির্ণয় সম্বন্ধেও বিশেষ সমস্যা-সংশয় উপস্থিত হয়।

শঙ্করাচার্য্য বহু প্রাচীন কালের লোক না হইলেও, তাঁহার জন্মকাল কেহই নিশংসয়িত রূপে নিরূপণ করিতে পারেন নাই। সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ উইলসন সাহেব, বহু অনুসন্ধান ও

আলোচনা করিয়া শঙ্করাচার্য্যের জন্মকাল সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে বহু প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে (কলিযুগের ৩৮৮৯ বর্ষে) ৭৯৯ খৃষ্টাব্দে শঙ্কর আচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। দাক্ষিণাত্যের কাদালি নামক ব্রাহ্মণগণ শঙ্করের শিক্ষা দীক্ষার সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে আচার্য্যের আবির্ভাব কাল দুই হাজার বৎসর পুর্ব্বে। আবার কোন কোন মতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে, কোন কোন মতে তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে তাঁহার জন্মকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ কর্ণেল মেকেঞ্জির সংগৃহীত কঙ্গরাজ-বংশের ইতিহাসে শঙ্করকে রাজা তিরুবিক্রমের সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। রাজা তিরুবিক্রম দাক্ষিণাত্যে স্কন্দপুর প্রদেশে ১৭৮ খৃঃ অব্দে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। তদনুসারে শঙ্করকেও উক্ত সময়ের লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

পশ্চিম ঘাটের সীমায় শৃঙ্গগিরি নামক স্থানে শঙ্কর একটি মহাবিদ্যাপীট স্থাপন করেন। ঐ স্থান বর্ত্তমানকালে মহীশূর প্রদেশের অন্তর্গত। শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত উক্ত মহাবিদ্যাপীট এখনও বিদ্যমান রহিয়া, তথাকার স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণের উপর প্রভূত প্রভাব ও আধিপত্য পরিচালন করিতেছে। এইখানকার স্থানীয় অভিমত অনুসারে শঙ্করকে ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বের লোক বলিয়া অনুমান করা হয়। তথাকার সাধারণ কিম্বদন্তী আবার তাহাকে ১২০০ বৎসর পূর্ব্বের লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

সুবিখ্যাত ভোজ-প্রবন্ধ, শঙ্করকে তদন্তর্গত মহাপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং তাঁহাকে ভোজরাজের সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করে। তাহাহইলে শঙ্কর অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীর লোক বলিয়াই অনুমিত হন। তুমভুলের সুবিখ্যাত পণ্ডিত মাধ্বাচার্য্য এইসকল বিভিন্ন মতের সমন্বয় করিবার জন্য বলেন যে শঙ্করাচার্য্য তিনবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। মাদুরা প্রদেশের বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ বলেন যে শঙ্কর সালিবাহন শকে নবম শতাব্দাতে অর্থাৎ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার টেলার বলেন শঙ্করকে নয় শত বৎসর পূর্ব্বের লোক বলিয়া ধরিলে, অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। এই সকল নানামত আলোচনা করিয়া, অনেক ঐতিহাসিক শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবকাল খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষ বা নবম শতাব্দীর প্রারম্ভ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন।

জন্মকালের ন্যায় শঙ্করাচার্য্যের জন্মস্থান সম্বন্ধেও মত-পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সে সম্বন্ধে দুইটী মত শ্রেষ্ঠ ও সমীচীন। একমতে তিনি দাক্ষিণাত্যে কেরাল প্রদেশের অন্তর্গত চিদাম্বর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অন্য মত অনুসারে মালবার তাঁহার জন্ম স্থান। অনেকে বলেন, ঐ দুই স্থানের মধ্যে এক স্থানে শঙ্করের জন্ম হয় ও অপর স্থানে শঙ্করের শৈশব অবস্থায় তাঁহার পরিবারবর্গ প্রস্থান করেন। সে যাহাই হউক দুই স্থানই সংস্কৃত বিদ্যা ও দার্শনিক শাস্ত্র আলোচনার জন্য যে প্রধান কেন্দ্র ছিল, তাহা শঙ্করের জীবনগতি হইতে সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে।

দাক্ষিণাত্যের নাম্বুরি ব্রাহ্মণবংশ অতি পবিত্র ও সম্মানিত বলিয়া সে দেশে সংপূজিত। সেই বিশুদ্ধ বংশে শঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশ এখন পর্য্যন্ত কাশ্মীরে সুবিখ্যাত জোশী-মঠে পৌরহিত্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই বংশের ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন কুল-সম্ভূত ব্রাহ্মণ এই মঠে পৌরহিত্য করিতে পারেন না। এই প্রথা শঙ্কর আচার্য্য প্রবর্ত্তিত করেন।

শঙ্করের পিতা দুই নামে অভিহিত ছিলেন। এক নাম বিশ্বজিৎ অপর নাম শিবগুরু। বোধ হয় বিশ্বজিতের প্রথম সময় তাঁহার পিতামাতা ঐ নামে পুত্রের নামকরণ করেন। পরে শিব-ভক্তির প্রভাবে সাধারণ জনগণ তাঁহাকে শিবগুরু নাম প্রদান করেন। শঙ্করের জননীর নাম বিশিষ্ঠা। শঙ্করের জনক জননী উভয়েই বিশেষ শিবভক্ত ছিলেন। শিবপূজায় শিব আরাধনায় ও বিবিধ প্রকার কঠোর শিব-ব্রত অনুষ্ঠানে শঙ্করের জনক জননী দিন অতিবাহিত করিতেন। সেই জন্য জন সাধারণ সকলেই তাঁহাদিগকে শিব-ভক্ত বলিয়া বিশেষ সম্মান ও ভক্তি করিত।

শঙ্করের জন্ম সম্বন্ধে একটি অতি অদ্ভুত অমানুষিক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। একদিন শঙ্করের জননী তন্ময় হইয়া শিবের আরাধনা করিতেছিলেন। তাঁহার আরাধনায় প্রীত হইয়া শিব স্বয়ং তাঁহার উদরে প্রবেশ করেন। এই ব্যাপার অনেক শিব-উপাসকের সম্মুখে সংঘটিত হইয়াছিল। এই জন্য সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে পিতামাতা শঙ্করের নামে পুত্রের নাম করণ করিলেন।

অতি অল্প বয়সেই শঙ্কর অসাধারণ অমানুষিক প্রতিভার পরিচয়

প্রদান করেন। তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইত। ভক্ত ও পণ্ডিত পিতা, অতি শৈশব-দশাতেই পুত্রকে অধ্যয়নে নিরত করিলেন। শঙ্কর অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার ফলে অল্পবয়সেই বহু শাস্ত্র আয়ত্ত করিলেন। তিনি অষ্টম বর্ষ বয়ক্রমকালে দুর্ব্বোধ কঠিন দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, তাঁহার আচার্য্য ও সমপাঠী এবং অপর সকলেই চমৎকৃত হইত। অনেকেই তাঁহাকে দেবঅংশ-সম্ভূত মহাপুরুষ বলিয়া শ্রদ্ধা করিত।

শৈশব-কালেই শঙ্করের পিতা পরলোকগত হন। শঙ্কর জননীকে লইয়া সংসারে দিনপাত করিতে লাগিলেন। তিনি অল্প বয়স হইতেই সংসারে উদাসীন ছিলেন। বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস তাঁহার জন্মগত স্বাভাবিক ভাব। জগতের যত মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া, সংসারের দুঃখ দুর্দ্দশা দূরীকরণ ও সৎশুভ ধর্ম্মের সংস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা যেমন শৈশবাবধি ত্যাগী, বিরাগী হইয়াছেন, শঙ্করও সেইরূপ জন্মের প্রথমকাল হইতেই বিষয় সংসারে উদাসীন ছিলেন। কামিনী কাঞ্চন বিষয় সম্পদ উপভোগকে তাঁহারা যেমন প্রথমাবধিই অতি হেয় তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন, শঙ্করও সেইরূপ করিয়াছেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই ইন্দ্রিয়ভোগে অনাসক্ত ছিলেন। পিতার মৃত্যু ঘটনা, তাঁহার জীবনের ও জগতের প্রতি অসারত্ব উপলব্ধির প্রকৃষ্ট বীজরূপে পরিপক্ক হইয়া দাঁড়াইল। শৈশবেই তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা অতি উজ্জ্বলভাবে ধরিয়া লইল—এ জীবনটা জলবুদবুদ-বিশেষ ক্ষণভঙ্গুর মাত্র। আর জগতের নিত্য

পরিবর্ত্তন দেখিয়া শঙ্করের প্রাণে উহার অসারত্ব অতি দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া উঠিল। তিনি শৈশবকালে পঠদ্দশাতেই চিন্তাশীল ছিলেন। পিতার মৃত্যুতে তাঁহার চিন্তাস্রোত গভীর উচ্চ তত্ত্বের দিকে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন হইতেই শঙ্কর নির্জ্জন নিভৃত স্থানে থাকিতে ও উপযুক্ত পণ্ডিতের সহিত আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনা করিতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উঠিলেন। তিনি অনেক সময় নির্জ্জন স্থানে উপবিষ্ট হইয়া, আকুল প্রাণে অনন্ত গগনের পানে চাহিয়া থাকিতেন ও আপন মনে আপনি কহিতেন,—এ সকল অদ্ভুত ব্যাপারের মূল কি? ইহার আদি কারণ কোথায় ও কিরূপ? এইরূপ তত্ত্ব-চিন্তায় বিভোর হইয়া তিনি গৃহ সংসার আত্মীয় স্বজন এমনকি স্নেহময়ী জননীর কথাও ভুলিয়া যাইতেন। একদা সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে গ্রাম-প্রান্তে এক সাধুর সহিত শঙ্করের সাক্ষাৎ হয়। সাধু শঙ্করের অলৌকিক মূর্ত্তি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন এই অদ্ভুত বালক কখনই সাধারণ বালক নহে। বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া সাধু বুঝিলেন যে এই বালক নিশ্চয়ই দেব অংশে সম্ভূত এবং কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সংসারে আবির্ভূত হইয়াছে। তিনি একদৃষ্টে অনেকক্ষণ বালকের মুখ পানে চাহিতে লাগিলেন। যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার বিমুগ্ধ-কৌতূহল বাড়িতে লাগিল। সাধু সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি আগ্রহান্বিত হইয়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কস্ত্বং? বালক শঙ্কর মৃদুহাস্যে কহিলেন—'ন জানে'। সাধু

বালকের মনোভাব বুঝিয়া কহিলেন—"বালক তুমি কে তাহা জান না? বালক কহিল—"আজ্ঞে না। 'আমি কে' তাহা জানি না। কৃপা করিয়া বলুন কিরূপে আমি আমাকে জানিব?" সাধু কহিলেন—'সেইটাই জগতের জীবনের সারতত্ত্ব।' শঙ্কর বিগলিত প্রাণে কহিলেন,—'ঠাকুর, কৃপা করিয়া সে তত্ত্ব আমাকে জানাইয়া দিন।' সাধু কহিলেন,—'সে তত্ত্ব সংসারে থাকিয়া জানা যায় না। সংসারের বাহিরে—পার্থিব কোলাহলের অতি উর্দ্ধে সে পরম তত্ত্বের স্থান।' শঙ্কর কহিলেন,—"ঠাকুর বাহিরেও নয়—উর্দ্ধেও নয়। আপনারই মধ্যে অতি নিকটে সে পরমতত্ত্ব নিহিত। আত্মচিন্তায়—আত্মদর্শনে সে তত্ত্ব অনুভূত ও অধিগত হইয়া থাকে।" সাধু বুঝিলেন এ বালক সত্যই, অলৌকিক। সত্যই সংসার ও সমাজের অতি মহৎ কল্যাণকর উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যই বালক ভগবান কর্ত্তৃক প্রেরিত। সাধু বালকের মস্তকে স্বীয় পবিত্র হস্ত প্রদান করিলেন ও আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। শঙ্কর তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া প্রান্তর পথে বহুদূর আসিলেন। মাঠের মধ্যে আসিয়া সাধুর পদতলে নিপতিত হইলেন ও কাতরকণ্ঠে শঙ্কর কহিলেন—'ঠাকুর, অনুগ্রহ করিয়া শিষ্যরূপে আমাকে গ্রহণ করুন; আমায় সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত করুণ।' সন্ন্যাসী কহিলেন,—"আমি তোমাকে কি শিক্ষা দিব? কোন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিব? আমা অপেক্ষা বহু বড় বড় শিষ্য অচিরে তোমার পদতলে লুণ্ঠিত হইবে।" শঙ্কর সাধুর কথায় সহজে

নিরস্ত হইলেন না। বারম্বার জেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"দেব, আমাকে দয়া করিতেই হইবে। আমি কিছুতেই আপনার সঙ্গ ছাড়িয়া গৃহে ফিরিয়া যাইব না।" শঙ্করের দৃঢ়তা দেখিয়া সাধু বিরক্তির ভাবে কহিলেন,—"আমার সঙ্গে যাইয়া তুমি কি করিবে? তুমি তো আপনি কহিলে পরমতত্ত্ব নিজেরই অভ্যন্তরে। তবে বাহ্য ভাব ধরিয়া বাহিরে বাহিরে আমার সঙ্গে মিছা ঘুরিলে কি ফল হইবে?" শঙ্কর উদ্ভ্রান্ত বিহ্বল ভাবে ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী সুমিষ্টভাবে শঙ্করকে অনেকক্ষণ বুঝাইয়া কহিলেন,—"বৎস, তোমার এখন সন্ন্যাস গ্রহণের উপযুক্ত সময় নহে। তোমার পিতা নাই। অন্য উপযুক্ত ভ্রাতা বা অপর অভিভাবকও সংসারে বিদ্যমান নাই। তুমি তোমার জননীর সংসারের ও জীবনের একমাত্র অবলম্বন। জননীর অনুমতি ব্যতীত কেহই কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ সন্ন্যাস-ধর্ম্ম বড় কঠিন ধর্ম্ম। মূলে মাতৃকোপ বা মাতার অনভিপ্রায় থাকিলে সন্ন্যাস কি সকল ধর্ম্ম সকল কর্ম্ম ভস্মীভূত হইয়া যায়।" সাধুর কথা বালক শঙ্করের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। শঙ্কর নীরব নিস্তব্ধ হইয়া ভূমিতে উপবিষ্ট রহিলেন। সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলেন। শঙ্কর একমনে ভাবিতে লাগিলেন—'আমি কে?' শঙ্কর কৃত 'আত্মবোধ' নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থের মৌলিক বীজ এই ঘটনার ভিত্তি ভূমিতে নিহিত। (কোন মতে ইহা গুরু গৃহে ঘটে)।

শঙ্কর অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত একাকী সেই নির্জ্জন প্রান্তরে সমাবিষ্ট যোগীর ন্যায় উপবিষ্ট রহিলেন। এদিকে তাঁহার জননী ও

আত্মীয়গণ বালকের জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন; অবশেষে তাঁহারা উচ্চৈস্বরে শঙ্করের নাম ডাকিতে লাগিলেন; বালক শঙ্কর গাঢ় ভাবে আত্মচিন্তায় এতই বিভোর হইয়াছিলেন যে সে উচ্চৈস্বরের আহ্বান পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। তৎপরে আত্মীয়গণ অনেক অনুসন্ধানের পর শঙ্করের নিকটে আসিলেন ও তাঁহাকে ধরিয়া গৃহে লইয়া গেলেন।

বালক শঙ্করের বৈরাগ্যভাব এখন হইতে দিন দিন বিশেষভাবে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। শঙ্কর সকল প্রকার সংসারকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, গৃহের বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য, বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া, চেষ্টা করিতে লাগিলেন; পুত্রের এইরূপ বৈরাগ্য-ভাব দেখিয়া জননী উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি আত্মীয় স্বজনগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন; কি উপায়ে শঙ্করের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হয় তাহার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন; হিতৈষী আত্মীয়গণের মধ্যে কেহ কহিলেন—সর্ব্বক্ষণ শঙ্করকে গৃহকার্য্য ও আমোদ আহ্লাদে কথাবার্ত্তায় ব্যাপৃত রাখা প্রয়োজন। কেহ কহিলেন সত্বর শঙ্করের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ নানাজনে নানা ভাবের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহাদের উপদেশ অনুসারে শঙ্করের জননী, পুত্রকে সর্ব্বক্ষণ আমোদ আহ্লাদে অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য এবং যাহাতে শীঘ্রই শঙ্করের বিবাহ-ব্যাপার সমাধা হয় তজ্জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। আত্মীয় হিতৈষীগণ

সর্ব্বদা শঙ্করের নিকটে থাকিয়া অনেক ভাবে তাঁহার মতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেকে আবার শঙ্করকে সংসারের সুখ ও সারবত্তা বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শঙ্কর মহা বিরাগী উদাসীনের ন্যায় সকলের সকল কথা আন্তরিক উপেক্ষার সহিত শুনিতে লাগিলেন। কিছুতেই—কাহার কোন কথায় ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। তিনি অচল অটল হিমালয়ের ন্যায় ধীর ও দৃঢ়ভাবে আপনার গন্তব্য পন্থা নীরবে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। যেসকল মহাপুরুষ জগতের মঙ্গল ও হিতের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়া পাপ-পরিতপ্ত সংসারকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন তাঁহারা কখনই অলীক অসার গৃহসুখে আত্মহারা হইয়া থাকিতে পারেন না। শিব অবতার শঙ্কর জগতের অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত করিয়া জ্ঞানধর্ম্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকল্পে আবির্ভূত হইয়া কিরূপে তুচ্ছ গৃহসুখে নিমগ্ন রহিবেন? তিনি সর্ব্বদাই আপনাকে পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন। কিরূপে উন্মুক্ত পথে সংসারের বাহিরে বহির্গত হইয়া জগতের উদ্ধার সাধন করিবেন, বদ্ধ জীবকে মহামুক্তির পন্থা প্রদর্শন করিবেন, তাহাই সর্ব্বক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে দেশব্যাপী বাহ্য বৈরাগ্য সন্ন্যাসের বিষম অভ্যুদয় প্রতিপত্তি ঘটিয়াছিল। বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ দলে দলে ভিক্ষু-আশ্রম গ্রহণ করিয়া, গৃহ সংসার ত্যাগ করিতেছিল। ধর্ম্ম ও বৈরাগ্যের লীলানিকেতন ভারতভূমি তখন আসমুদ্র হিমালয়

পর্য্যন্ত বৈরাগ্যাশ্রয়ী বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুবর্গের সন্ন্যাস-আন্দোলনে আলোড়িত। এমন সময়ে শঙ্করের বৈরাগ্য ভাব দেখিয়া, তাঁহার মাতা ও আত্মীয়গণ যে সহজেই ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহারা যতই শঙ্করকে সংসারবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, শঙ্কর ততই সে বন্ধন ছেদনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মাতার অনুমতি অভিমত ভিন্ন সংসার-ত্যাগ অধর্ম্ম শাস্ত্রের বিরুদ্ধ বলিয়া তিনি বিষণ্ণমনে অতি কষ্টে কারাবদ্ধের ন্যায় দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে শঙ্করের পক্ষে সংসার ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাস-পন্থা অবলম্বনের এক মহাসুযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণ সম্বন্ধে এইরূপ দুইটী কিম্বদন্তী শ্রুত হইয়া থাকে।

কোন কার্য্য উপলক্ষে শঙ্কর এক আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ী গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার জননী পুত্রের সহিত তথায় গমন করেন। কার্য্যান্তে উভয়ে বাটী প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। আসিবার সময় পথিমধ্যে একটী নদী পার হইতে হইত। নদীতে তখন অধিক জল ছিল না। নদীর সামান্য জল পার হইতে নৌকার প্রয়োজন হয় নাই। মাতা ও পুত্র উভয়ে হাঁটিয়া নদী পার হইতেছিলেন। নদীর মধ্য স্থলে আসিলে, হঠাৎ বন্যার জলপ্লাবনে নদী ভয়ঙ্করভাবে উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। মাতা ও পুত্র উভয়ে জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইলেন। তখন উভয়ে ভীত উৎকণ্ঠিত হইয়া ভগবানকে ত্রাহি ত্রাহি বলে ডাকিতে লাগিলেন। শঙ্কর দৈবাদেশে শুনিতে পাইলেন যে যদি

তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস পন্থা অবলম্বন করেন এবং যদি শঙ্করের জননী পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণে অনুমতি প্রদান করেন, তবেই তাঁহারা উভয়ে এই ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন। এই দৈবাদেশ শঙ্করের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বাণী বলিয়া বিবেচিত হইল। জননী তাহা শুনিয়া বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন। তাঁহার উভয় দিকেই বিপদ। যদি পুত্রের সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণে অনুমতি প্রদান না করেন তবে মাতা পুত্র উভয়কেই জলমগ্ন হইয়া মরিতে হয়। আবার পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগও বড় সাংঘাতিক মর্ম্মান্তিক ঘটনা।

সংসারে জননীর একমাত্র উপায়—একমাত্র অবলম্বন পুত্র শঙ্কর। পুত্রের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ ঘরে আনিয়া জননী সকল সাধ—মনের সকল আশা মিটাইবেন বলিয়া কত আশায় বুক বাঁধিয়াছিলেন। সেই একমাত্র পুত্রকে চিরতরে বিদায় দিয়া জননী কেমন করিয়া একাকিনী গৃহে রহিবেন। জননী কাঁদিয়া আকুল হইলেন। শোকে মোহে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কাতরকণ্ঠে কেবল বিপদভঞ্জন ভগবানকে একমনে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু জলপ্লাবনের উচ্ছাস বর্দ্ধিত হইল কিছুতেই রুদ্ধ বা হ্রাস হইল না। তখন শঙ্কর একান্ত মিনতি করিয়া জননীকে বলিতে লাগিলেন—'মা, আর তুমি আমাকে বাধা প্রদান করিও না। এখনও কি বুঝিতে পারিতেছ না ইহা নিতান্তই দৈব দুর্ঘটনা। দৈব ইচ্ছায় আমাকে এখনই এই অবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেই হইবে। তুমি আমাকে এই মুহূর্ত্তেই সন্ন্যাস গ্রহণে

অনুমতি প্রদান কর। নতুবা এ বিপদে উদ্ধারের আর কোনই উপায় নাই। তুমি আর কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্ব করিলেই সর্ব্বনাশ ঘটিবে। আমরা উভয়েই জলে ডুবিয়া মরিব।" শঙ্করের কথা শুনিয়া জননী হতবুদ্ধি ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তখন সন্তান শঙ্কর অৰ্দ্ধ জলমগ্ন-প্রায় হইলেন ও কাতরকণ্ঠে বারম্বার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া জননীকে বলিতে লাগিলেন—'মা, আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিও না। যদি নিজে রক্ষা পাইতে চাও ও আমার প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর তবে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া আমার সন্ন্যাস পন্থা গ্রহণে অনুমতি প্রদান কর।" তখন বুদ্ধিমতী স্নেহময়ী জননী, ভাবিতে লাগিলেন--এখন কি করি? দুই দিকেই মহৎ বিপদ—ঘোর সঙ্কট। যদি পুত্রকে সন্ন্যাস গ্রহণে অনুমতি প্রদান না করি, তবে উভয়কেই জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হয়। আবার যদি তাহাকে সন্ন্যাস গ্রহণে অনুমতি দিয়া বিদায় দিই, তবে কাহাকে লইয়া সংসার আশ্রম করিব? এমন সময়ে শঙ্কর জলমগ্ন হইয়া মৃতপ্রায় হইলেন ও নিতান্ত কাতরস্বরে কহিলেন,— "মা, আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্বের সময় নাই। শীঘ্র আমায় সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দিন। নতুবা উভয়কেই এখনি জলমগ্ন হইয়া মরিতে হইবে।" জননী উপায়ান্তর না দেখিয়া হতাশকণ্ঠে কহিলেন,—"ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তোমার মৃত্যু অপেক্ষা সন্ন্যাস অবলম্বনই শ্রেয়। তুমি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ কর।"

জননী এই অনুমতি দিবা মাত্র যেন দৈবী শক্তির প্রভাবে নদীর উচ্ছ্বসিত সলিল রাশি নিমিষে অপসারিত হইল।

অপর কিম্বদন্তী অনুসারে কথিত হইয়াছে যে শঙ্কর, জননীর সহিত নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। মাতা ও পুত্র নদীতে অবগাহন করিলেন। এমন সময়ে একটি কুম্ভীর হঠাৎ শঙ্করকে আক্রমণ করিল। তখন প্রত্যাদেশ হইল পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তোমরা এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিবে। নতুবা পুত্র কুম্ভীর কর্ত্তৃক নিশ্চয়ই নিহত হইবে। তখন শঙ্কর জননীকে কাতরস্বরে কহিলেন,—"মা শীঘ্র আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণে অনুমতি প্রদান করুন। নতুবা আমার প্রাণ রক্ষার আর কোনই উপায় নাই।" জননী ভীত হইয়া পুত্রকে সন্ন্যাস গ্রহণে তৎক্ষণাৎ অনুমতি প্রদান করিলেন।

পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গম মুক্তি লাভ করিলে যেমন পরমানন্দে বিশাল গগনে বিচরণ করে, শঙ্কর সন্ন্যাস গ্রহণে তেমনি আনন্দিত হইলেন। সংসার তাঁহার পক্ষে সত্যই বিষম কারাগারের ন্যায় বোধ হইতেছিল। কতদিনে সেই কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবেন, কতদিনে বন্ধনগ্রস্ত অন্ধ সংসারকে মুক্তির উপায়, জ্ঞানালোকের পথ প্রদর্শন করিবেন এই চিন্তা বাল্যজীবন হইতে শঙ্করকে বিশেষ রূপে ব্যাকুল ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এক্ষণে সেই শুভ সুযোগ লাভ করিয়া শঙ্কর যেন মৃত দেহে পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইলেন। শঙ্কর আপনাকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ মনে করিলেন। জগতে যে সকল মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া, পথভ্রান্ত সংসারকে সুপথ দেখাইয়াছেন—সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন, তাঁহারা বাল্যাবধি গৃহভোগে আসক্তিহীন হইয়া থাকেন, অসার তুচ্ছ

ভোগকে বিকট বিষের ন্যায় পরিত্যজ্য বলিয়া মনে করেন; পরমপুরুষ শঙ্করের পক্ষেও সেই উদাসীনতা বৈরাগ্য ভাবই প্রকৃত স্বাভাবিক ভাব। সে ভাবকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, তাঁহারা বাল্য-কাল হইতে ব্যাকুল হইয়া থাকেন। কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য পৃথিবীর উভয় প্রান্তেই সে দৃষ্টান্তের মহৎ জীবনী পূর্ণাঙ্গে প্রকটিত। এদিকে বুদ্ধ গৌরাঙ্গাদি মহাপুরুষ দিগের জীবনে, আর পশ্চিম ভাগে মহম্মদ, খ্রীষ্ট প্রভৃতি মহাত্মা দিগের জীবনে বৈরাগ্য ভাব, সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য ভাব প্রথমাবধিই পরিস্ফুরিত দেখিতে পাওয়া যায়। আর সে ভাব যেন অদ্ভুত দৈবীশক্তির বলে সহজে আপনা হইতেই কার্য্যে পরিণত হইয়া পড়ে। মহাপুরুষ শঙ্করের পক্ষেও বৈরাগ্য ভাব যেন দৈববলে কার্য্যে পরিণত হইয়া গেল। ইহা ভগবানের বিচিত্র লীলার এক অদ্ভুত অপূর্ব্ব বিধান। জগতের অদ্ভুত কর্ম্মা সকল মহাপুরুষের ন্যায় শঙ্কর-জীবনেও সে অপূর্ব্ব ভগবৎ-বিধান পূর্ণাঙ্গে প্রকটিত হইল।

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট, ভগবানের এইরূপ বিচিত্র লীলাবিধান, একটা অস্বাভাবিক অতিরঞ্জিত মিথ্যা—একটা কল্পিত কথা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা যথার্থ ভক্ত—যাঁহারা দিব্য-দৃষ্টিতে ভগবানের বিচিত্র লীলাকাণ্ডে অদ্ভুত ব্যাপারের ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তাঁহারা শঙ্কর জীবনের এমন ঘটনাকে, কখনই মিথ্যা অতিমানুষিক ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দিবেন না।

শঙ্কর জীবনের অনেক ঘটনা, কিম্বদন্তী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আর বহু ঘটনা, শঙ্কর-দিগ্বিজয় বা শঙ্কর-বিজয় নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অবশ্য সে সকল সংগৃহীত বা লিপিবদ্ধ ঘটনায় অনেক স্থলে বহু অতিরঞ্জন ও কাব্য-কল্পনার ছটা যে পরিলক্ষিত না হয়, এমন কথা আমরাও বলি না বা কোন সত্যঅনুসন্ধিৎসুও বলিতে পারেন না। যেসকল স্থলে নিতান্ত কাব্য কথা বলিয়া উপলব্ধি হয়, তাহা অনাবশ্যকীয় উপেক্ষণীয় বলিয়া আমরা অস্বীকারও করি না। কিন্তু যে সকল ঘটনা বহুজন কর্ত্তৃক পরিগৃহীত ও সমাদৃত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে নিতান্ত অলীক বা অসার বলিয়া, আমরা উপেক্ষা করিতে চাহিনা এবং অপরকেও অবজ্ঞা করিতে বলি না; কারণ অনেকস্থলে অতিমানুষিক ব্যাপারের (Miracle) মূলে সত্য সারবত্তার লক্ষণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আধ্যাত্ম শক্তির অনুশীলনে উচ্চ বৃত্তির, উচ্চ ভাবের উন্মেষ ঘটিলে, মানব অতিপ্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সত্যের লক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারে। এমন অতিপ্রাকৃতিক ঘটনার কথা বোধ হয় অনেকেই সত্যসূত্রে শুনিয়াছেন, এবং অনেকে স্বয়ংই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যাহাহউক সে সকল কথা, আমরা আর অধিক করিয়া কিছুই বলিতে চাহিনা; যাঁহার যেরূপ জ্ঞান ও বিশ্বাস তিনি সেইরূপ বুঝিবেন ও সেইরূপ ভাবে গ্রহণ করিবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ-মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। এখনকার কোন শিক্ষিত ব্যক্তি তখন কুরুক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ

বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে ষড়ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তখনও নীলাচলে কোন আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন না। কিন্তু সে সকল ঘটনা আধুনিক বহু বিজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। আবার কোন কোন সন্দিহান ব্যক্তি অতিমানুষিক অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপার বোধে অসত্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন। ফলতঃ যাঁহার যেমন জ্ঞান ও বিশ্বাস এবং যতটুকু আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশলাভ ঘটে, তিনি সেইরূপ বুঝিয়া থাকেন। পরে বুঝাইয়া কখন সত্য উপলব্ধি করাইতে পারে না। নিত্য প্রত্যক্ষ স্থূল জড় ব্যাপারে বাহ্য বর্ণনার সত্যতা সম্বন্ধে সাধারণ মানবের মনে যখন নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন অতিপ্রাকৃতিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাপারে যে বিশেষ মতিভ্রম ঘটিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি?

৫

সন্ন্যাস-গ্রহণের বহু পূর্ব্বে শঙ্কর, স্বীয় ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব বংশের বিধান অনুসারে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছিলেন। পঞ্চম বর্ষ বয়ক্রমকালে শৈশব অবস্থায় শঙ্কর উপবীত ধারণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে একটী গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। শুনা যায় শঙ্করের আত্মীয় কুটুম্বগণও শঙ্করের জন্ম সম্বন্ধে সন্দেহের ভাব প্রকাশ করিয়া তাঁহার উপনয়ন-ক্রিয়ায় যোগদান করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। পিতামাতার অধিক বয়সে শঙ্করের জন্ম হয় বলিয়া এ সময়ে তাঁহারা নানা আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। যাহা হউক পঞ্চম বর্ষ বয়সে উপনয়ন সমাধা হইলে, কিছুকাল পরে

শঙ্কর সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তখন তাঁহার বয়স সপ্তদশ বর্ষের অধিক হয় নাই।

পূর্ব্বোক্তরূপ দৈবদুর্ঘটনা হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া শঙ্কর জননীসহ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। নিতান্ত অন্তরঙ্গ আত্মীয় স্বজনের নিকট জননীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাতরকণ্ঠে কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শঙ্করের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তখন শঙ্কর নিশ্চিত হইলেন। যে দুর্ভাবনায় তিনি এতদিন ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলেন। শঙ্করের জননী পুত্রের বিচ্ছেদ আশঙ্কায় নিতান্ত বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। পাগলিনীর ন্যায় উদ্‌ভ্রান্তভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। স্নেহময় পরম মাতৃভক্ত পুত্রের প্রশান্ত প্রাণ, জননীর রোদন শুনিয়া ও তাঁহার তাৎকালিক অবস্থা দেখিয়া, বিগলিত হইল। শঙ্কর আর ধৈর্য্য ধারণ করিয়া সুস্থির রহিতে পারিলেন না। তাঁহার নয়নপ্রান্তে দরবিগলিত ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

মাতা কাতরকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—"বৎস, তুমি গৃহ ত্যাগ করিয়া আমাকে ছাড়িয়া গেলে, আমি কিছুতেই জীবনধারণ করিতে পারিব না। তুমি গৃহ-ত্যাগের সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। আমি নিয়ত শিব আরাধনা ও ব্রত তপস্যা সাধন করিয়া দৈবঅনুগ্রহ লাভে সকল বিপদ সঙ্কট হইতে তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিব। তুমি সে জন্য ভীত বা চিন্তিত হইও না। তুমি চলিয়া গেলে, আমি

কাহাকে ধরিয়া গৃহে রহিব? কাহাকে অবলম্বন করিয়া সংসারের আশ্রম ধর্ম্ম পালন করিব?"

শঙ্কর কিছুকাল নীরবে চিন্তা করিলেন। অবশেষে কাতর কণ্ঠে কহিলেন,—"মা, আমি তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেছি। আমিও ভাবিতেছি, আমি গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে আপনার কি দশা হইবে। সে কথা মনে করিতেও আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে। সত্যই ত আমি সন্ন্যাস-পথে প্রস্থান করিলে, কে আপনার ভার লইয়া সংসারে সুখী করিবে? হায় মা, কি কুক্ষণেই আমি জন্মলাভ করিয়াছি! আপনা হইতেই এই মানব জন্মলাভ করিলাম—মানবদেহ ধারণ করিলাম। আপনি পরম যত্নে লালন পালন করিয়া এই বয়স পর্য্যন্ত পরিবর্দ্ধিত করিলেন। কিন্তু হতভাগ্য আমি সে মাতৃঋণ কি এইভাবে পরিশোধ করিলাম? জননী যথার্থই স্বর্গাদপেক্ষা গরিয়সী। জননী-সেবায় সকল ধর্ম্ম সংসাধিত হয়। জননীর আশীর্ব্বাদে সর্ব্বপ্রকার শুভফল অধিগত হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবান আমার ভাগ্যে সে পরম সিদ্ধিফল বিধান করেন নাই। কি করিব? জননী, জানিবেন সংসারের সকল ঘটনা দৈবাধীন। আপনি তাই বুঝিয়া আমাকে বিদায় দিন। ভাবিয়া দেখুন, আমরা দৈবাদেশে দৈববন্ধনে বদ্ধ হইয়াছি। আমরা দেবতার নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া, মহাসঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছি। এখন সে দৈবাদেশ লঙ্ঘন করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে, কেবল যে প্রত্যবায় ঘটিবে এমন নহে—মহাবিপদ

ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং দৈবাদেশ প্রতিপালন ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। আমাকে বিদায় প্রদান করিতে আর কোনরূপ দ্বিধা বোধ করিবেন না। কারণ দৈবাদেশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তাহা লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা নিষ্ফল।" মাতাকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া শঙ্কর অনেক রূপে বুঝাইলেন। শঙ্করের জননী অনেকক্ষণ নীরবে পুত্রের প্রবোধ বাক্য মনে মনে আলোচনা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাহার মনে পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় বিষম উৎকণ্ঠার উদয় হইল। তিনি মনে করিয়াছিলেন পূজা অর্চ্চনা ও তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া সন্তানের সকল বিপদ খণ্ডন করিবেন। কিন্তু পুত্রের কথায় এবং নিজে চিন্তা করিয়া বুদ্ধিমতী জননী বুঝিলেন —কথা মিথ্যা নহে। যদি দৈবাদেশ লঙ্ঘন করি, তবে সকল তপস্যাই নিষ্ফল হইবে। কোনরূপ ভজন পূজনে শিবের পরিতোষ জন্মিবে না। অতএব পুত্রকে বিদায় দেওয়াই শ্রেয়।

এই ভাবিয়া জননী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"বৎস শঙ্কর, তুমি সন্ন্যাস পন্থায় গমন কর। তবে যাইবার পূর্ব্বে আমার নিকট একটি প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হইয়া গমন করিতে পাইবে।"

পুত্রও কাঁদিতে কাঁদিতে করযোড়ে কহিলেন,—"মা আজ্ঞা করুন—কি প্রতিজ্ঞা পাশে এ অধম সন্তানকে আবদ্ধ করিবেন?"

জননী কহিলেন,—"তুমি সন্ন্যাস লইয়া গমন করিলে বোধ

হয় আর কখন গৃহে প্রত্যাগমন করিবে না। তাহা হইলে তোমাকে না দেখিয়া আমি কোন ক্রমেই দেহে প্রাণরক্ষা করিতে পারিব না। তোমার বিচ্ছেদে আমি নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে নিপাতিত হইব। অতএব তুমি আমার নিকট একটি কথা অঙ্গীকার করিয়া গমন কর।”

শঙ্কর বিনীত ভাবে কহিলেন,—“বলুন—কি অঙ্গীকার করিতে হইবে?”

জননী কহিলেন,—“তুমি প্রতিবৎসর অন্ততঃ একটিবার আমাকে দেখা দিবে। বৎসর বৎসর একবার তোমার মুখ দেখিলেও আমি কতকটা প্রাণে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া রহিতে পারিব। নতুবা তোমার অদর্শনে ও তোমার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণায় নিশ্চয়ই আমার প্রাণ বহির্গত হইবে।”

শঙ্কর নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। জননীর কথায় কোনই উত্তর করিতে পারিলেন না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, গৃহে প্রত্যাগমন অসম্ভব এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ! আবার জননীকে সময়ে সময়ে দেখা না দিলেও তাঁহার জীবন ধারণ নিতান্ত দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিবে। এ অবস্থায় উপায় কি? মাতৃভক্ত পুত্র শঙ্কর এই চিন্তা করিয়া অবশেষে মাতৃ-আজ্ঞাই শিরোধার্য্য করিলেন। প্রতিবর্ষে একবার তাঁহাকে দর্শন দিবেন বলিয়া জননীর নিকট অঙ্গীকার-পাশে আবদ্ধ হইলেন।

বিদায় কালে মাতা ও পুত্র উভয়েরই হৃদয়ে স্নেহ-পারাবার উথলিয়া উঠিল—উভয়েরই প্রাণ বিগলিত হইল। শান্তি ও

ধৈর্য্যের আধার শঙ্কর, কতক্ষণে আত্মসম্বরণ করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অবশেষে দণ্ডবৎ হইয়া মাতার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া নীরবে গৃহত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। জননী ছিন্নালতার ন্যায় ভূমিতলে লুণ্ঠিতা হইলেন। আত্মীয় স্বজনবর্গ নির্ব্বাক ও স্তম্ভিত হইয়া যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর শঙ্করকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। শঙ্কর, দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে, তাঁহারা শঙ্করের জননীকে বহু প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন।

শঙ্কর যে সময়ে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তখন ভারতের ঐতিহাসিক জগতে ধর্ম্মের বিশেষ বিপ্লব আন্দোলন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। একদিকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব, অন্যদিকে হিন্দুধর্ম্মের তথা বৈদান্তিক ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে একটা তুমুল আন্দোলন, বিপ্লবে ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্র আলোড়িত হইয়াছিল। কুমারীল ভট্ট প্রভৃতি মনীষীগণের প্রতিভায় ও প্রতিযোগীতায় বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিল। বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম তখন উচ্চ বিশুদ্ধ ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া, কদাকার ও কুক্রিয়াদির আশ্রয়-স্থল হইয়া উঠিতেছিল। মহাত্মা শাক্যসিংহ যে মহান ত্যাগ-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া মহামুক্তি ও মহানির্ব্বাণতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা পথভ্রষ্ট, কদাচারী ভিক্ষুশ্রমণদিগের ভোগ-আয়তনে পরিণত হইবার উপক্রম করিল। বৌদ্ধধর্ম্মের রক্ষক ও নেতাগণ বিশুদ্ধ ধর্ম্মের পবিত্র প্রেমভাব পরিত্যাগ করিলেন; অষ্টমার্গ সাধন প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্মের সাধনমন্ত্র

বিস্মৃত হইলেন। আপনাদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করিয়া, হীনযান মধ্যযান আদি বহু সম্প্রদায়ের ভিত্তি স্থাপন করিতে লাগিলেন। ত্যাগ, অহিংসা, জীবে দয়া ও বিশ্বমানবের প্রতি প্রেম প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলমন্ত্র গুলি ভুলিয়া, বাহ্য আড়ম্বরের প্রতি ও বাহ্য আচার ব্যবহারের প্রতি আসক্ত হইয়া উঠিলেন। নানা স্থানে বহু বৌদ্ধ মঠে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ সমবেত হইয়া আধুনিক 'নেড়ানেড়ী' দলের ন্যায় কাম-রাগ ভজনে ও ইন্দ্রিয় ভোগের অতি হেয় ও ঘৃণিত দৃষ্টান্ত মানবের চক্ষে অতি উজ্জ্বল ভাবে সমাজের বক্ষের উপর প্রতিনিয়ত প্রদর্শন করিতে লাগিল। ঠিক এমনি সময়ে কুমারীল ভট্ট ও গৌড়পাদ প্রভৃতি, প্রতিভাশালী মনস্বীগণ, হিন্দুধর্ম্মের ধ্বজা ধারণ করিয়া প্রবলবেগে সমুত্থিত হইলেন। তাঁহাদের প্রভায় ও প্রতিযোগীতায় এবং বৌদ্ধধর্ম্মের নেতাগণের নিজদোষে বৌদ্ধধর্ম্ম সঙ্কুচিত ও হীনপ্রভ হইয়া উঠিল। নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ দলে দলে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মঅনুভূতি লাভের জন্য, ব্যাকুল প্রাণে তত্ত্ব-অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বৈদান্তিক ধর্ম্মে নির্দ্ধারিত প্রচারিত মায়াতীত বিশুদ্ধ চিদানন্দময় ব্রহ্মে সংস্থিতিকে সত্য-ধর্ম্মের একমাত্র শ্রেষ্ঠস্তর বলিয়া তাঁহারা সাগ্রহে গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে সকল প্রধান প্রধান স্থানই হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের কেন্দ্র হইয়া উঠিল। সেই সকল কেন্দ্র হইতে বিদ্বান ও প্রতিভাশালী পণ্ডিতগণ বৈদান্তিক শিক্ষা দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মের ও

বৈদিক ধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি নানাভাবে নানা অঙ্গে বৈদান্তিক-ধর্ম্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। এই সকল বিবিধ বৈদান্তিক শাখাপ্রশাখার মধ্যে বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদই তৎকালে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিল। সমগ্র ভারতের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিশেষভাবে বিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। যে সকল পণ্ডিত মণ্ডলী, 'বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদের' পূর্ণপ্রতিষ্ঠা সাধন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আচার্য্য গোবিন্দপাদ একজন অতি শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অসাধারণ পণ্ডিত গৌড়পাদের প্রধান শিষ্য। গৌড়পাদ, বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রতিকুল ছিলেন। কুমারীল ভট্টের ন্যায়, তিনিও বৌদ্ধধর্ম্মের ও নাস্তিক কদাচারী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। আচার্য্য গোবিন্দপাদও গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের ও বৌদ্ধ জাতির বিপক্ষ হইয়াছিলেন।

গোবিন্দপাদ বৌদ্ধধর্ম্মের ও বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিপক্ষ হইলেও, তাহা কর্ত্তৃক বৌদ্ধজাতির অথবা কোন বৌদ্ধ ব্যক্তির কোনরূপ নিপীড়ন বা নির্য্যাতনের কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। সাধু সজ্জন ও সুপণ্ডিত বলিয়া তিনি সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। যেমন পাণ্ডিত্যের জন্য তেমনি সাধুতা ও সততার জন্য তিনি সাধারণের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার শিক্ষার প্রভাবে বহু শিষ্য শঙ্করের ন্যায় শিক্ষিত সুপণ্ডিত

হইয়াছিল। এই সকল কারণে ও তাঁহার উচ্চ শিক্ষাদান শক্তির পরিচয় পাইয়া বহু প্রতিভাশালী ছাত্র আসিয়া প্রতিনিয়ত তাঁহার পদপ্রান্তে নিপাতিত হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল। ফলতঃ আচার্য্য গোবিন্দপাদ সেই সময়ে বহু উৎকৃষ্ট ছাত্রের গুরুস্থানীয় হইয়াছিলেন। তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি বহুদূর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

তাঁহার যশ-সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া শঙ্কর তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য করযোড়ে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। গোবিন্দপাদের এই নিয়ম ছিল যে তিনি যে সে ছাত্রকে শিষ্যত্বে বরণ করিতেন না। শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে প্রার্থী ছাত্রকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। কেবল যে ছাত্রের বিদ্যাবুদ্ধি পরীক্ষা করিতেন এমন নহে, ছাত্রের চরিত্র এবং কুলশীল পর্য্যন্ত বিচার করিয়া দেখিতেন। যদি তাহাতে পরিতোষ লাভ করিতেন, তবেই প্রার্থী ছাত্রকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতেন।

শঙ্কর, গোবিন্দপাদের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া শিষ্যত্বের জন্য প্রার্থনা করিলে, তিনি শঙ্করের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। শঙ্করের অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া, আচার্য্য বিমুগ্ধ হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন বালকের বদনমণ্ডলে ও নয়নে যে অসামান্য জ্যোতি প্রতিভাত হইতেছে, তাহাতে কোন মতেই তাহাকে সাধারণ বালক বলিয়া তো মনে হয় না। বালক নিশ্চয়ই অসাধারণ দৈবীশক্তিসম্পন্ন। তাহার

মধ্যে নিশ্চয়ই মহাপুরুষের বীজ নিহিত রহিয়াছে যাহা কালে বিকশিত হইয়া, সংসারে বিশেষ কোন অসাধারণ কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইবে। এই ভাবিয়া তিনি বালকের নাম ধামাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহাকে সন্নিধানে উপবেশন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। গোবিন্দপাদের অপর যে সকল শিষ্য তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিল, তাহারাও বিস্ময়ান্বিত ও আগ্রহান্বিত হইয়া শঙ্করের মূর্ত্তি নীরিক্ষণ করিতে লাগিল। বাস্তবিক সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকগণ সকলেই একবাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে মানবের বাহ্য-মূর্ত্তি—বিশেষতঃ বদন ও নয়ন তাহার আভ্যন্তরীণ মানসিক শক্তির পরিচায়ক-দর্পন স্বরূপ। যাহার মানসিক বৃত্তি—বা মস্তিষ্কশক্তি যেরূপভাবে বা যেমন উপাদানে গঠিত, তাহার বাহ্য আকারে তাহা অতি বিশদ ভাবে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। যে দয়ালু, তাহার মূর্ত্তিতে দয়াদাক্ষিণ্যের ভাব, যে বুদ্ধিমান, তাহার মূর্ত্তিতে সূক্ষ্মদর্শন শক্তির ভাব, যে ভক্ত তাহার মূর্ত্তিতে ভক্তিভাব, পক্ষান্তরে যে নির্দ্দয় তাহার আকৃতিতে কঠোর কর্কশ ভাব, যে নির্ব্বোধ, তাহার আকারে জড়ভাব আবার যে ভক্তিহীন, তাহার মূর্ত্তিতে বৈষয়িক-ভাব স্বতঃই প্রকটিত হইয়া থাকে। যেমন অগ্নি-শিখা বস্ত্রে আবৃত থাকেনা, সেইরূপ প্রতিভা নিশ্চয়ই স্বীয় শক্তি বলে ফুটিয়া বাহির হইবেই হইবে। শঙ্করের অমানুষিক প্রভা প্রতিভা কখনই লুক্কায়িত রহিবার নহে। তাঁহার মূর্ত্তি ও রূপ লক্ষণাদি দেখিয়া আচার্য্য গোবিন্দপাদ স্বয়ং ও তাঁহার অপর উপস্থিত

শিষ্যবর্গ সকলেই মুগ্ধ প্রাণে ও বিস্মিত নয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন।

কতক্ষণ পরে গোবিন্দপাদ, তাঁহার শিক্ষাসম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ক্রমেই অতি জটিল দার্শনিক প্রশ্ন সমূহ উত্থাপিত হইতে লাগিল। বালক শঙ্কর এমন সুন্দর ও বিশদভাবে সেসকল জিজ্ঞাসার আলোচনা ও সমাধান করিতে লাগিলেন, যে উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ সকলেই তাহা শুনিয়া যেন চমৎকৃত ও আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক শঙ্করের সকল কার্য্যই অতি অদ্ভূত অমানুষিক। যখন গৃহে তাঁহার শিক্ষার আরম্ভ হয়, তখন সত্যই যেন অমানুষিক ভাবে তাঁহার বর্ণ পরিচয় হইয়াছিল। 'অ' 'আ' 'ক' 'খ' ইত্যাদি বর্ণগুলি উচ্চারিত হইবা মাত্র ও দেখিবা মাত্রই, শঙ্কর তাহা বলিতে ও চিনিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব শিক্ষা-শক্তি দেখিয়া তৎকালে সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন ও শঙ্করকে দৈবী শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া তখনই মানিয়াছিলেন। বাস্তবিক যখন শঙ্করের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়, তখন তাঁহার তৎকালের আদি শিক্ষাগুরু ও আত্মীয় স্বজনগণ সকলেই তাঁহার অদ্ভূত শিক্ষা প্রণালী দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। এমন কি তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শঙ্করের জীবনকাল ও পরমায়ু সম্বন্ধে সন্ধিহান হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে এমন ছেলে অধিক দিন এই সংসারে দীর্ঘজীবী হইয়া রহিতে পারিবে না। বাস্তবিক প্রথম শিক্ষার সময় শিশুকালেই শঙ্কর অতি অমানুষিক প্রতিভার পরিচয়

প্রদান করিয়াছিলেন। তখন ব্যাকরণ, অভিধান বা স্মৃতি ইত্যাদি ব্যতীত বিশেষ বিশেষ জটিল দার্শনিক গ্রন্থও তিনি সুচারুরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রাথমিক শিক্ষার ফলেই, তিনি গোবিন্দ পাদের ন্যায় মহাপণ্ডিত দার্শনিক প্রবরকে সম্যকরূপে পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আচার্য্য গোবিন্দ পাদ, শঙ্করের জ্ঞান ও বুদ্ধিতে পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। শঙ্কর তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া বেদ, বেদান্ত, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি সমুদয় প্রধান শাস্ত্র সম্যকরূপে অধ্যয়ন করিলেন। শাস্ত্র সমূহে শিষ্যের অসাধারণ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি দেখিয়া আচার্য্য গোবিন্দপাদের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। শঙ্কর অতি অল্পসময়ের মধ্যে অতীব জটিল দার্শনিক শাস্ত্র সমূহ যেরূপ আয়ত্তীকৃত করিলেন, তাহাতে কেবল আচার্য্য গোবিন্দপাদ কেন, স্থানীয় অপর অধ্যাপকবৃন্দ ও শঙ্করের সমতীর্থ সমপাঠীগণও পরম আনন্দিত ও চমৎকৃত হইলেন। বিদেশ বা দূরবর্ত্তী স্থান হইতে যে সকল পণ্ডিতবর্গ, আচার্য্য গোবিন্দ পাদের সহিত শাস্ত্রীয় আলোচনা বা তর্কবিতর্ক করিতে আসিতেন আচার্য্যের ঈঙ্গিত ও অভিপ্রায় অনুসারে শঙ্করই তাঁহাদের সহিত সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। বিনীত ভাবে এমন সুকৌশলে তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতেন যে তাঁহারা সে পরাজয়ে ক্ষুব্ধ হইবার অবসর পাইতেন না। আচার্য্য গোবিন্দপাদ, শঙ্করের বিজয়লাভে আপনাকে বিশেষ গৌরবান্বিত বলিয়া অনুভব করিতেন।

গোবিন্দ পাদের শিক্ষাগুরু ছিলেন সুবিখ্যাত পণ্ডিত প্রবর

গৌড়পাদ। গৌড়পাদ সময়ে সময়ে নিজ শিষ্যের আলয়ে থাকিয়া তাঁহার অধ্যাপনা ও তদীয় ছাত্রবর্গের অধ্যয়ন-ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তিনিও শঙ্করের অদ্ভুত জ্ঞান ও প্রতিভা সন্দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। গৌড়পাদ নাস্তিক নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রতিকূল ছিলেন। কি উপায়ে এদেশ হইতে সেই দুষ্টধর্ম্ম বিদূরিত হইতে পারে, তজ্জন্য তিনিও বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। সর্ব্বদাই তাঁহার মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইত যে সত্বর এ দেশে কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া হেয় বৌদ্ধধর্ম্মকে দূরীভূত করিবেন। শঙ্করের অসাধারণ প্রতিভা, অলৌকিক পাণ্ডিত্য এবং কুশাগ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া তিনি এতদিনে বিশেষ উৎসাহিত হইলেন। মনে করিলেন এই বালককে উপযুক্তরূপে প্রস্তুত করিতে পারিলে, কালে উহার দ্বারাই আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে—নাস্তিক বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ ঘটিবে।

এই চিন্তা করিতে করিতে গৌড়পাদ একদিন শিষ্য গোবিন্দ পাদকে কহিলেন,—"দেখ গোবিন্দ, তোমার এই শিষ্য শঙ্কর কখনই সাধারণ সামান্য বালক নহে। আমি উহার যেরূপ অদ্ভুত জ্ঞান বুদ্ধি প্রতিভা পরিদর্শন করিলাম, তাহাতে বুঝিলাম কালে উহার দ্বারা নিশ্চয়ই কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে। যে সকল লক্ষণে ভূষিত হইলে, মানব মহাপুরুষ হইয়া থাকে, সে সমুদয় লক্ষণই তোমার শিষ্য শঙ্করে বিদ্যমান। আমার মনে হয় উহার দ্বারাই আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইবে। আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারি শঙ্করই ঘৃণিত বৌদ্ধধর্ম্মের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ

হইবে। অতএব তুমি এখন হইতেই তাহাকে আমাদের মতের অনুবর্ত্তী হইবার উপযুক্তরূপে শিক্ষার বিধান কর। যাহাতে শঙ্কর সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধাবান হয়, তুমি তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান হও আর যাহাতে তাহার হৃদয়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করিতে পার তজ্জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইতে থাক। গোবিন্দ পাদ, গুরুকে কহিলেন,—"দেব, তজ্জন্য আমাদিগকে বিশেষ চিন্তা করিতে হইবে না। শঙ্কর এই বাল্যকাল হইতেই স্বভাবতঃ সনাতন ধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান ও সমুদয় কুধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। বিশেষতঃ নাস্তিক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাহার বিরাগ অতীব প্রবল। আপনি অল্পকাল মাত্র তাহাকে লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। তাহার সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, তাহার কথাবার্ত্তা শুনিলে ও ভাবভঙ্গি দেখিলে আপনি সহজেই বুঝিবেন যে বৌদ্ধধর্ম্মের এবং সকল কুধর্ম্মের বিনাশ সাধন করিবার জন্যই যেন সে আবির্ভূত হইয়াছে। আমার মনে হয় তজ্জন্য তাহাকে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিবার কোনই প্রয়োজন হইবে না।

আচার্য্য আলয়ে শিক্ষা সমাপন করিয়া শঙ্কর দিগ্বিজয়ে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি বিদ্যায় ও জ্ঞানে যেমন সুপণ্ডিত হইলেন, তেমনি সাধুতা ও সদাশয়তায় পরম পূজ্য পবিত্র মহাত্মা রূপে সত্বরই সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। তিনি বহির্গত হইয়া নানাস্থানে স্বীয় ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা ও প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। বেদান্তের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদই তাঁহার ধর্ম্মমতের প্রধান ও আদিম ভিত্তি।

একমাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই সত্য, তদ্ব্যতীত আর সকলই মিথ্যা মায়া এই তত্ত্ব প্রচার করাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য হইল। তৎকালে বৌদ্ধদিগের নিরীশ্বর-বাদের নির্ব্বাণ-তত্ত্ব ও অপরাপর দার্শনিক ধর্ম্মের শূন্যবাদ ভারতের ধর্ম্ম-জগতে অতি প্রবলভাব লাভ করিয়াছিল। যদিও কুমারীল, গৌড়পাদ প্রভৃতি মনীষী পণ্ডিত বর্গের প্রভাবে ও প্রতিপক্ষতায় সে সকল নাস্তিক শুষ্ক জ্ঞানধর্ম্ম হীনপ্রভ ও সঙ্কুচিত হইতেছিল, তথাপি সমাজের বহু শ্রেষ্ঠ স্থানে তাহাদের আধিপত্য একেবারে বিদূরিত হয় নাই। শঙ্করের প্রবল প্রতিকূলতার আঘাতেই প্রকৃতপক্ষে তাহারা এদেশে নিস্তেজ ও প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল।

শঙ্কর, প্রচার কার্য্যে নিরত হইয়া, কতকগুলি অতি উপযুক্ত শিষ্য তাঁহার সহিত যোগদান করিল। তাহাদিগকে লইয়া তিনি ধর্ম্মযুদ্ধে দেহ প্রাণ সমর্পণ করিলেন। এই সময়ে স্থানে স্থানে অনেক তাৎকালিক প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতের সহিত তাঁহার ধর্ম্মযুদ্ধ হইয়াছিল। সে সকল ধর্ম্মযুদ্ধে বিষম তর্কবিতর্ক ও বাদ বিতণ্ডা ঘটিয়াছিল। শঙ্কর, স্বীয় দক্ষতা ও প্রতিভা বলে বিপক্ষ দলের মত ও যুক্তি খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত ও স্বীয় ধর্ম্মের প্রাধান্য সংস্থাপিত করেন। বিপক্ষদলের মধ্যে যাহারা তাঁহার সহিত তর্কে পরাস্ত হয়, তাহাদের অনেকে তাঁহার মত গ্রহণ করে, আর অনেকে অবনত মস্তকে তাঁহার শিষ্যত্ব লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠা বোধ করে নাই। শেষোক্ত লোকদিগের মধ্যে মহাপণ্ডিত মণ্ডন মিশ্র একজন প্রধান ব্যক্তি।

মুণ্ডনকে কেহ কেহ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু মুণ্ডন প্রকৃত পক্ষে নাস্তিক বৌদ্ধ বা শূন্যবাদী ছিলেন না। তিনি কর্ম্মবাদী মীমাংসা-শাস্ত্রের অনুগামী ছিলেন। শঙ্করের সহিত তর্ক-যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি অবশেষে শঙ্করের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিশুদ্ধাদ্বৈত-বাদ গ্রহণ করেন।

শঙ্করের দিগ্বিজয় কালে, যে সকল তর্কসংগ্রাম উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে মুণ্ডন মিশ্রের সহিত বাদ-বিতণ্ডাই প্রধান ও সুবিখ্যাত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মুণ্ডন মিশ্র নিজে যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার পত্নীও তেমনি বিদুষী ছিলেন। মুণ্ডনের পত্নীর নাম অভয়া দেবী। অভয়া দেবীও পতির ন্যায় বেদ বেদান্ত ও অপরাপর দর্শন শাস্ত্র বিশেষ রূপে অধ্যয়ন করিয়া, সেই সকল শাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে যেমন বিদ্যাবতী তেমনি বুদ্ধিমতী ছিলেন। এমন কি পণ্ডিত প্রবর পতিমুণ্ডন মিশ্রও সময়ে সময়ে অভয়া দেবীর নিকট শাস্ত্রীয় বাদবিতণ্ডায় পরাজিত হইতেন। যে সকল বিদেশীয় পণ্ডিত মুণ্ডন মিশ্রের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে বা শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা বা তর্ক করিতে আসিতেন, তাঁহাদিগের সহিত অভয়া দেবী প্রতিযোগিতা করিতেন এবং স্বামীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিদেশীয় পণ্ডিতদিগকে পরাজয় করিতেন। এইজন্য, তদীয় স্বামী মুণ্ডনমিশ্রের ন্যায়, তাঁহারও বিদুষী ও প্রতিভাবতী বলিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল; এবং তাঁহার নাম ও যশ তৎকালে এমনই বিস্তার

লাভ করিয়াছিল যে সুদূর হইতেও বহু পণ্ডিত কেবল তাঁহারই সহিত ধর্ম্ম ও শাস্ত্র আলোচনা করিবার জন্য মিশ্র মহোদয়ের ভবনে সমাগত হইতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অভয়া দেবীর নিকট তর্ক-বিতণ্ডায় পরাজিত হইয়া, তাঁহাকে গুরুর্ব্বী স্থানীয় মনে করিয়া অবনত মস্তকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। ফলতঃ তদানীন্তনকালে পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তার জন্য স্বামী মুণ্ডন মিশ্রের ন্যায় পত্নী অভয়া দেবীরও যশঃ-সৌরভে ভারত পরিপূরিত হইয়াছিল। তাঁহাকে অনেকেই দেবী ভারতীর অংশ বলিয়া পূজা করিতে লাগিল।

শঙ্কর, বহু পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের অনেককে স্বমতে ও শিষ্যত্বে আনয়ন করিলেন। অবশেষে মুণ্ডন ও অভয়া দেবীর সহিত শাস্ত্র সমরে প্রবৃত্ত হইবার জন্য মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন। একদিন শিষ্যগণের নিকট সে প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, তাহারাও যেন কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হইয়া ইতঃস্তত করিতে লাগিল। তাহাদের মনে আশঙ্কা হইল, পাছে সকলের শীর্ষস্থানীয় গুরুদেব, মুণ্ডনের নিকট অথবা তদীয় পত্নী রমণীর নিকট পরাজিত হইয়া পড়েন। এই ভাবিয়া তাহারা নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু কেহই সাহস করিয়া গুরুর নিকট তাহাদের চিন্তার কথা বলিতে ও মনোভাব ব্যক্ত করিতে সাহস করিল না। আচার্য্য দেবের প্রভাবে অনেকেই নীরবে অধোবদনে রহিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে সকল শিষ্য গুরুদেবের অসাধারণ জ্ঞান বুদ্ধির কথা ভালরূপে

জানিত, যাহারা, তাঁহার অমানুষিক প্রতিভা ও কূটতর্ক-শক্তির বিষয় বিশেষরূপে বুঝিত, তাহারা কিঞ্চিৎমাত্রও কুণ্ঠিত বা চিন্তিত হইল না। তাহারা মুক্তকণ্ঠে সহাস্যবদনে আচার্য্যের প্রস্তাবে সম্মত হইল। তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট কোন কোন শিষ্য গুরুদেবকে রাখিয়া, নিজেরাই যাইয়া মুণ্ডন ও তদীয় পত্নী অভয়া দেবীর সহিত তর্ক-যুদ্ধ করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। তাহারা বিনীতকণ্ঠে কহিল—'মুণ্ডন বা অভয়াদেবী আপনার পক্ষে সামান্য মাত্র। তাহাদিগের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিবার জন্য আপনার যাইবার প্রয়োজন কি? প্রভো, আপনি আমাদিগকে আজ্ঞা করুণ, আমারাই অগ্রে তাঁহাদের সহিত শাস্ত্রীয় আলোচনা করিয়া আসি।' বুদ্ধিমান আচার্য্য পূর্ব্বেই মণ্ডন ও তদীয় পত্নীর বিদ্যা ও বুদ্ধির কথা নানা স্থানে শুনিয়াছিলেন। সুতরাং শিষ্যদিগকে অগ্রে প্রেরণ করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। স্বয়ং যাইয়া মণ্ডন ও অভয়া দেবীর সহিত শাস্ত্রীয় যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসুক হইলেন ও শিষ্যদিগকে কহিলেন,—"তোমরা মিশ্র মহাশয়কে জান না। তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁহার সমকক্ষ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান এদেশে অতি অল্প। তাঁহার সহিত শাস্ত্র সম্বন্ধে বিতর্ক বা বিতণ্ডা করিয়া তোমাদের জয়লাভের কোনই আশা নাই। এমন কি আমিও তাঁহার নিকট যাইয়া শাস্ত্র আলোচনা বা তর্ক করিতে বিশেষ উৎসাহিত নহি। তোমরা কেন এমন দুঃসাহস ও দুরাশা করিতেছ? বহু বিজ্ঞ বিদ্বান ব্যক্তি তাঁহাকে

স্বয়ং ব্রহ্মার অংশ অবতার বলিয়া পূজা ও সম্মান করিয়া থাকে। তাঁহার নিকট তোমরা নিতান্তই ক্ষুদ্র বলিয়া জানিও।”

এইরূপে শঙ্কর, স্বীয় শিষ্যগণের দম্ভ অহঙ্কার বিলোপের জন্য প্রকারান্তরে নানাভাবে বুঝাইলেন। নিজে যাইয়া মুণ্ডন ও অভয়া দেবীর সহিত শাস্ত্রীয় আলোচনা ও শাস্ত্রীয় তর্ক করাই যুক্তি যুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। শঙ্কর স্বভাবতঃ অতি সদাশয় ও বিনয়ী ছিলেন। মুণ্ডন ও অভয়া দেবীকে পরাজয় করিয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠা বা প্রতিপত্তি লাভ তাঁহার, মুণ্ডন মিশ্রের সহিত শাস্ত্র আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল না। কেবল স্বীয় মতের সত্যতা ও সারবত্তা উপলব্ধি করিবার ও করাইবার জন্যই, তাঁহার প্রতিপক্ষের সহিত তর্ক বা আলোচনা করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

সেই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি মুণ্ডনের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিনীতভাবে তাঁহার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলেন। মণ্ডন সে দিবস বাটীতে বিশেষ দৈবকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। সুতরাং শাস্ত্রীয় তর্ক আলোচনার জন্য তাঁহাকে আর একদিন অপেক্ষা করিতে হইল। অবশেষে নির্দ্ধারিত সময়ে শঙ্কর ও মুণ্ডন উভয়ে শাস্ত্রীয় তর্ক সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। অভয়া দেবী ও অপর পণ্ডিতবর্গও কেহ কেহ তর্কস্থলে উপস্থিত রহিলেন। প্রথমেই দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ লইয়া তর্ক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল।

শঙ্কর, বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক

তিনি কহিলেন—একই সত্য। এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর সকল মিথ্যা মায়া মাত্র। মুণ্ডন কর্ম্মবাদী মীমাংসা শাস্ত্রের অনুগামী ব্যক্তি। তিনি দ্বৈতবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি এক ব্রহ্ম ব্যতীত জগৎ ও জীবের সত্বা স্বীকার করিয়া, শঙ্করের যুক্তি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিলেন। শঙ্কর নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া মুণ্ডনের দ্বৈতবাদ খণ্ডন করিলেন। তৎপরে বর্ণাশ্রম ও অধিকার তত্ত্ব লইয়া উভয়ের মধ্যে বহু তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। শঙ্কর বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার মত অনুসারে জীবই ব্রহ্ম। মায়ার বশেই জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন ভাবে ও সকলকে পৃথক পৃথক ভাবে উপলব্ধি করে। মায়ার মোহ টুটিলে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য কিছুই থাকে না। এইরূপ অভিমত পোষণ করিলে, সকল জীবই সমান হইয়া পড়ে, তাহাতে সংসার সমাজে মহাসাম্য ভাব সংস্থাপিত হইয়া দাঁড়ায় কোনরূপ ভেদাভেদ ভাব আর তিষ্ঠিতে পারে না। সুতরাং তদনুসারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাহাতে শঙ্কর নির্দ্দেশ করেন যে অধিকার এবং গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিম কাল হইতে সংস্থিত ও মহাজনগণ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। পারমার্থিক ভাবে উহার সত্যতা সারবত্তা স্বীকার্য্য না হইলেও ব্যবহারিক ভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই স্বীকার্য্য। শঙ্কর তাহা মানিয়া লইলেন ও স্বীয় অদ্বৈতবাদ সংস্থাপনের জন্য বহুভাবে বহু তর্ক করিলেন। সেই তর্ক-যুদ্ধে মুণ্ডন সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও পরাজিত হইলেন। মুণ্ডন, নিজ পক্ষ ও

নিজ মত সংস্থাপনের জন্য যত প্রকার যুক্তি তর্কের অবতারণা করিলেন শঙ্কর সে সকলই খণ্ডন করিয়া নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মুণ্ডন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন।

তর্ক সমরে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে শঙ্কর ও মুণ্ডন উভয়ে এই নিয়ম ও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন যে যে জন পরাজিত হইবে, সে অপর পক্ষের মত গ্রহণ করিবে ও তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। মুণ্ডন পরাজিত হইলে, পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য হইলেন। তখন মুণ্ডনের পত্নী অভয়া দেবী শঙ্করকে কহিলেন—"আপনি শাস্ত্রীয় বিধান মতে সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে পারেন নাই।" শঙ্কর কহিলেন,—"কেন? তোমার স্বামী পরাজিত হইয়াছেন কি না তিনিই বলুন। যদি তিনি স্বয়ং পরাজয় মানিতে অস্বীকার করেন, তবে আমি বিনা আপত্তিতে তাঁহার কথা মানিয়া লইব।" সত্য পথাবলম্বী মুণ্ডন, প্রতিপক্ষ শঙ্করের নিকট বিশেষ ভাবে পরাজিত হইয়া কিরূপে আর তাহা অস্বীকার করিবেন? তিনি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া নীরবে রহিলেন। তাহা দেখিয়া শঙ্করের দলস্থ সকলেই বলিলেন—এই মৌন ভাবই আপনার স্বামীর পরাজয়ের লক্ষণ ও সম্মতি। তখন অভয়া দেবী তেজগর্ব্বে কহিলেন,—'না, তাহা কখনই হইতে পারে না। এরূপ পরাজয় কখনই শাস্ত্র-সম্মত হইতে পারে না। আমি সে পরাজয় সম্পূর্ণ বলিয়া কখনই স্বীকার করি না। কারণ শাস্ত্র অনুসারে পত্নী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী। আচার্য্য শঙ্কর আমার স্বামীকে পরাজয় করিতে পারেন। তাহাতে অর্দ্ধাঙ্গ মাত্র পরাজিত হইতে

পারে। কিন্তু আমি যখন পরাজিত হই নাই, তখন আচার্য্য কখনই পূর্ণ জয়লাভ করিতে পারেন নাই।"

অভয়া দেবীর কথায় প্রতিপক্ষ অগত্যা নীরব হইলেন। তাঁহারা বুঝিয়া দেখিলেন অভয়াদেবীর কথা অসঙ্গত ভীত্তিহীন নহে। তাঁহার কথা শাস্ত্রসঙ্গতই বটে। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে পত্নী যথার্থই স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী। পত্নীকে পরাজয় করিতে না পারিলে তাঁহার পূর্ণ জয় লাভ হয় না। স্বামী মুণ্ডনকে পরাজিত করিয়া প্রকৃতপক্ষে অর্দ্ধমাত্র তিনি জয় লাভ করিয়াছেন।

শঙ্কর তখন অভয়া দেবীকে শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা ও তর্ক করিতে কহিলেন। অভয়া দেবী শাস্ত্র লইয়া আলোচনা ও বিতর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বামীর ন্যায় পণ্ডিতা পত্নীও বহুক্ষণ ধরিয়া শঙ্করের সহিত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া পরাজিত হইলেন ও অবশেষে কামশাস্ত্র লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলেন। শঙ্কর কহিলেন—"সে সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বা বিশেষ বুৎপত্তি নাই। তজ্জন্য আমাকে প্রস্তুত হইতে এক বৎসর কাল লাগিবে। অতএব আমাকে অদ্য হইতে এক বৎসর সময় দেওয়া হউক।"

প্রতিপক্ষ তাহাতে সম্মত হইলেন। কামশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য শঙ্কর এক বর্ষ সময় লইয়া শিষ্যগণসহ প্রস্থান করিলেন।

শঙ্কর অতি তরুণ বয়সেই সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং কামশাস্ত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতা বা অধিকার জন্মিবার কোন সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল না। তিনি আজন্ম

কৌমারব্রত অবলম্বন করিয়া অবিবাহিত অবস্থায় দিন যাপন করিয়াছেন। যিনি জীবনের কোন কালে কোন অবস্থায় রমণী-সংসর্গে বা সংস্রবেও আসেন নাই, তিনি কামশাস্ত্রের কোন তত্ত্বই বা কিরূপে অধিগত করিবেন ?

শঙ্কর মুণ্ডন-আলয় পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—এখন কি উপায়ে কাম-শাস্ত্রের গুঢ় তত্ত্ব অধিগত করা যায় ? উপযুক্ত যোষিৎসঙ্গ ভিন্ন কামশাস্ত্রের রহস্য উদ্ভেদ করা অসম্ভব ব্যাপার। যদি সুন্দরী সুরসিকা বুদ্ধিমতী রমণীর সংসর্গ অন্ততঃ কিছু কালের জন্য লাভ করিতে পারা যায় তবেই কামশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ হইতে পারে। নতুবা কোন অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিয়া কাম-তত্ত্বের নিগুঢ় রহস্য কিছুতেই উদ্ভেদ করিতে পারা যায় না। কিন্তু তেমন রমণীসঙ্গ লাভের সুযোগ বা সম্ভাবনা কোথায় ? তিনি ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীমনুষ্য। রমণী সংসর্গ তাঁহার পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ এবং তাঁহার স্বভাব ধর্ম্মেরও অত্যন্ত বিরুদ্ধ। শাস্ত্র সঙ্গতরূপে যদি কোন উপযুক্ত রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে পারা যায়, তবে কাম ব্যাপারে অভিজ্ঞতা লাভ হইতে পারে। কিন্তু পরম পবিত্র ও চিরআচরিত সন্ন্যাস ধর্ম্ম ও জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মসাধনায় জন্মের মত জলাঞ্জলি দিয়া সামান্য সংসারভোগী বিষয়-কীটের ন্যায় বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইবেনই বা কিরূপে ? অভয়া দেবীর নিকট অঙ্গীকার করিয়া শঙ্কর এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া তিনি নানা দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে শিষ্যগণ সহ অমরদেব নামক এক বিখ্যাত রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজা যেমন বুদ্ধিসম্পন্ন তেমনি ভোগী ও বিলাসী ছিলেন। এই রাজার রাজ্যে আসিয়া শঙ্কর এক পাহাড়ের নিকট শিষ্যগণ সহ অবস্থান করিতে লাগিলেন। যেস্থানে তাঁহারা বাস করিতে লাগিলেন, তাহার চারিদিক সামান্য অরণ্যে আবৃত ছিল। তজ্জন্য সাধারণতঃ সকলে, তাঁহাদিগকে দেখিবার সুযোগ বা সুবিধা পাইত না। শঙ্কর তথায় অতি নিভৃতে আত্মচিন্তায় ও আত্মধ্যানে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন ও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন কি উপায়ে কোন সুযোগে কামশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও পারদর্শিতা লাভ করিবেন ও মণ্ডনপত্নীর সহিত তৎসম্বন্ধে আলোচনা ও বিতর্ক করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিবেন।

এমন অবস্থায় কয়দিন অতিবাহিত হইলে, রাজা অমরু দেবের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। রাজার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে, শঙ্কর তাহা অবগত হইলেন। তখন তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন 'এই তো উত্তম সুযোগ। অমরু রাজের পত্নী বিশেষ গুণবতী ও কামশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা। তাঁহার সহিত কিছুকাল অবস্থান করিতে পারিলে, তিনি কামশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিবেন। তাহাহইলে অভয়াদেবীকে অনায়াসে পরাভব করিতে সমর্থ হইবেন।' এই ভাবিয়া তিনি নিজ আত্মাকে, অমর রাজের মৃতদেহে সংক্রামিত করিবার চেষ্টা করিলেন। তৎপরে

বদ্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমাধিস্থ হইলেন এবং বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংযত ও সমাহিত করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় সহ আত্মায় নিবিষ্ট করিলেন। এমন সময়ে অমরু রাজের মৃত দেহ সৎকারের জন্য শ্মশানক্ষেত্রে সমানীত হইল। রাজার অমাত্য ও প্রধান প্রধান সচিব ও কর্ম্মচারী বৃন্দ, অমরু রাজের মৃতদেহ সহ তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজ্ঞী ও রাজার আত্মীয় স্বজন কাঁদিতে কাঁদিতে তথায় আগমন করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে মৃত রাজার শব-দাহনের জন্য শ্মশানক্ষেত্রে চিতা প্রস্তুত হইল। রাজার দেহ প্রজ্বলিত চিতায় উত্তোলন করিবার জন্য উদ্যোগ আয়োজন হইতে লাগিল। শোকাকুলা রাজ্ঞী স্বামীর মৃতদেহ আবেষ্টন করিয়া ঘোরতর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। এদিকে শঙ্কর তখন সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইলেন এবং মানস ও সমুদয় ইন্দ্রিয় বৃত্তিসহ স্বীয় আত্মাকে অমরু রাজের মৃতদেহে সংক্রামিত করিবার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি তখন শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন :—"বৎসগণ, তোমরা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। আমি কিছু কালের জন্য স্থানান্তরে গমন করিতেছি। আমার দেহ তোমাদিগের নিকট সমর্পণ করিয়া যাইতেছি। কেবল প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গ্রাম সহ আমি কিছুকাল তথায় অবস্থিতি করিব। যতদিন পর্য্যন্ত আমি প্রত্যাগমন না করি, ততদিন তোমরা বিশেষ যত্ন ও সতর্কতার সহিত আমার এই দেহ রক্ষা করিও। সাবধান যেন কাহার দ্বারা আমার এই দেহ বিনষ্ট না হয়। যদি কোন লোক বা রাজকীয় ভৃত্যগণ

আমার এই দেহ অন্বেষণ করে তবে তোমরা তৎকালে বিশেষ সতর্ক হইবে এবং তখনই আমার কর্ণে এই শ্লোকগুলি উচ্চারণ করিবে। সে শ্লোকগুলি শ্রবণ মাত্রেই আমি জাগ্রত হইব এবং আমার মৃতপ্রায় দেহে জীবন সঞ্চারিত হইবে। এই বলিয়া কতিপয় শ্লোক, শিষ্যগণকে শিখাইয়া দিলেন। সে গুলি অতি সুবিখ্যাত শ্লোক। মোহমুদ্গর নামে সে শ্লোকগুলি সংসারে সুবিখ্যাত ও সুপরিচিত। প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দু তাহা অবগত আছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে সকল ধর্ম্মজ্ঞ হিন্দুই সেই শ্লোক গুলি পরম পবিত্র ও নিত্য উচ্চার্য্য বোধে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন ও অনেক সময় উচ্চৈস্বরে পাঠ করিয়া আপনাকে কৃত কৃতার্থ মনে করিতেন। দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, ঐ শ্লোকগুলি আধুনিক বহু শিক্ষিতের মধ্যে প্রচারিত ও প্রচলিত নাই। তজ্জন্য নিম্নে অনুবাদ সহ আমরা সেই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মূঢ় জহী হি ধনাগম তৃষ্ণাং কুরুতনুবুদ্ধি মনস্থ বিতৃষ্ণাম।
যল্লভসে নিজ কর্ম্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম॥ ১

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোহয়—মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥ ২॥

মা কুরু ধনজন যৌবন গর্ব্বং হরতি নিমেষাৎ কাল সর্ব্বম্।
মায়াময় মিদ মখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদ প্রবিশন্তে বিদিত্বা॥ ৩॥

নলিনী দলগত জলমতি তরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্।
ক্ষণমপি সজ্জন সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা ॥৪

যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননী জঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষঃ কথমিহ মানব তব সন্তোষ ॥ ৫॥

দিন যামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ শিশির বসন্তৌ পুনরায়তঃ
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি নঃ মুঞ্চত্যাশা বায়ু ॥ ৬ ॥

অঙ্গ গলিতং পলিতং মুণ্ডং দন্ত বিহিনং জাতং তুণ্ডম্
করধৃত কম্পিত শোভিত দন্তং তদপি নংমুঞ্চত্যাশা ভাণ্ডম্ ॥॥৭॥

সুরবর মন্দির তরুতল বাসঃ শয্যা ভূতলমজিনং বাস।
সর্ব্ব পরিগ্রহ ভোগত্যাগঃ কস্য সুখং নঃ করোতি বিরাগঃ ॥ ৮ ॥

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মা কুরু যত্নং বিগ্রহ সন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বম্ ॥ ৯ ॥

অষ্টকুলাচলাঃ সপ্তসমুদ্রাঃ ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোক ॥ ১০॥

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুর্ব্যর্থং কুপ্যসি মধ্য সহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যত্বম্যাত্মানং সর্ব্বত্রোৎসৃজে ভেদ জ্ঞানম ॥ ১১ ॥

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত স্তরুণস্তাব তরুণীরক্ত
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তা মগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ ॥ ১২ ॥

অর্থ মনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখলেশ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজা ভীতিঃ সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ ॥ ১৩ ॥

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্ত স্তাবন্নিজ পরিবারোরক্ত।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে ॥১৪॥

কামং ক্রোধং লোভং মোহং, ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যতি কোঽহম্।
আত্মজ্ঞান বিহীনা মূঢ়াস্তে পচ্যন্তে নরকে নিগূঢ়াঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ পজ্ঝটিকাভির শেষঃ,শিষ্যাণাং কথিতোঽভ্যুপদেশঃ।
যেষাং নৈষং করোতি বিবেকং তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকম ॥১৬॥

রে মূঢ়! ধনার্জ্জনের তৃষ্ণা পরিত্যাগ কর; শরীরে বুদ্ধিতে এবং মনে ইহার প্রতি বিতৃষ্ণভাব প্রদর্শন কর। তুমি নিজে কর্ম্মফলে যাহা লাভ করিতে পার, তাহাতেই চিত্তের পরিতোষ জন্মাও ॥ ১ ॥

কে তোমার স্ত্রী? তোমার পুত্রই বা কে? এই সংসারের ব্যাপার অতি বিচিত্র। তুমি কাহার এবং কোথা হইতেই বা আসিলে হে ভ্রাতঃ! এই নিগূঢ় তত্ত্ব চিন্তা কর ॥ ২ ॥

ধন জন যৌবন গর্ব্ব পরিত্যাগ কর। কাল নিমেষ মধ্যে ঐ সমুদয় হরণ করিয়া লয়। মায়াময় এই নিখিল জগৎ পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মপদ বিদিত হইয়া তাহাতে আশু প্রবেশ করিতে যত্নবান হও ॥ ৩ ॥

পদ্ম-পত্রস্থিত জলের ন্যায় জীবন অতীব চঞ্চল। ক্ষণকালের জন্যও সাধু-সঙ্গই কেবল সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র নৌকা স্বরূপ ॥ ৪ ॥

যখন জন্মগ্রহণ হইল, তখনই মরণ তাহার পশ্চাদ্‌গামী হইয়াছে,

এবং মৃত্যুর পশ্চাৎ পুনর্ব্বার জননী-জঠরে প্রবেশ করিতে হইবে। সংসারে এই প্রকাশ্যরূপ দোষ দৃষ্ট হইয়াছে, অতএব হে মানব! তোমার ইহাতে সন্তোষের বিষয় কি আছে ॥ ৫ ॥

দিন যাইতেছে, রাত্রি আসিতেছে, সন্ধ্যা গত হইতেছে, প্রাতঃকাল আবার উপস্থিত হইতেছে, শিশির এবং বসন্ত প্রভৃতি ঋতু সকলের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে। কাল ক্রীড়া করিতেছে। জীবের পরমায়ু দিন দিন গত হইতেছে। তথাপি আশা বায়ুর কিছুতেই বিরাম হইতেছে না ॥ ৬ ॥

শরীর গলিত হইতেছে, শিরোদেশ পলিত হইয়া পড়িতেছে, মুখমণ্ডল দন্ত বিহীন হইয়া যাইতেছে। হস্তধৃত যষ্টি খানা হস্তের অবসন্নতা প্রযুক্ত কম্পিত এবং স্খলিত হইতেছে। তথাপি আশা ভ্রান্তি পরিত্যক্ত হইতেছে না ॥ ৭ ॥

দেবমন্দিরের অভ্যন্তরে কিম্বা তরুতলে অবস্থিতি, ভূমিতলে শয্যা কিম্বা মৃগচর্ম্ম পরিধান ও সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ ও ভোগ সুখ পরিত্যাগ এ প্রকার বৈরাগ্য কাহার না প্রীতি উৎপাদন করে ॥৮॥

শত্রু এবং মিত্র, পুত্র অথবা বন্ধুলোক, ইহাদের সকলেরই প্রতি সমান যত্ন করিবে। কাহারও প্রতি ন্যূনাতিরেক বোধ করিবে না। বিগ্রহ কিম্বা সন্ধি উভয়েই সমান যত্ন করিবে। যদি তুমি অচিরে বিষ্ণুপদ বাঞ্ছা কর তবে সর্ব্বত্র সমভাবে দৃষ্টি করিবে ॥ ৯ ॥

অষ্টকুলাচল, সপ্ত সমুদ্র, ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্র, দিবাকর, রুদ্রদেব, তুমি, আমি, এই সব লোক, কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই। অতএব কি জন্য শোক করিতেছ ॥ ১০ ॥

তোমাতে আমাতে এবং অন্যত্র সকল বস্তুতেই একমাত্র বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন, অতএব অসহিষ্ণু হইয়া আমার প্রতি কি জন্য কোপ করিতেছ? আত্মাকে অন্য আত্মা হইতে স্বতন্ত্র মনে করিও না এবং সর্ব্ব ভূতের আত্মাতে তোমাকে দর্শন করিবে সর্ব্বত্রই ভেদ জ্ঞান পরিত্যাগ করিবে ॥ ১১ ॥

বালক ক্রীড়াতেই আসক্ত হইয়া দিন যাপন করিতেছে; তরুণ বয়স্ক তরুণীতে অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছে, বৃদ্ধ কেবল চিন্তাতেই মগ্ন হইয়া দিনযাপন করিতেছে। অতএব কেহই কোন সময়ে পরব্রহ্মে মন স্থির করিতে পারিতেছে না ॥ ১২ ॥

অর্থকেই নিত্য অনর্থ স্বরূপ চিন্তা কর, সত্যই ইহাতে সুখের লেশ মাত্র নাই; কেন না ধনবান দিগের পুত্র হইতেও ভীতি সঞ্চার হইতে দেখা যায়, এই নীতি সর্ব্ব স্থলেই কথিত হইয়া থাকে॥১৩॥

যে পর্য্যন্ত তুমি অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম থাকিবে ততদিন নিজ পরিবার তোমাতে অনুরক্ত হইয়া থাকিবে। অনন্তর তোমার শরীর (বৃদ্ধাবস্থায়) জরাজীর্ণ হইলে যখন উপার্জ্জনে অক্ষম হইবে, তখন তোমার সংবাদ পর্য্যন্তও কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না ॥১৪॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, 'আমি কে', 'আত্মাকে' এই ভাবে অনুসন্ধান করিবে। আত্মা-জ্ঞান বিহীন মূঢ় লোকেরাই নরকে নিমগ্ন হইয়া পচ্যমান হয় ॥১৫॥

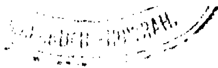
ষোড়শ শ্লোক পজ্ঝটীকা ছন্দে লিখিত হইল। এই ছন্দ অনুসারে অশেষ শিষ্যদিগকে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতেও যাহাদিগের উপদেশ না হয় অথবা বিবেকের উদয় না হইল,

তাহাদিগের বিবেক জন্মিবার জন্য কি উপায় হইবে, বুঝিতে পারা যায় না ॥ ১৬ ॥

শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়া শঙ্কর প্রাণবায়ুকে মৃতরাজদেহে সংক্রামিত করিলেন। শঙ্করের আত্মা অমরু রাজের মৃতদেহে তৎক্ষণাৎ সঞ্জীবীত হইয়া উঠিল। নিদ্রাভঙ্গের পর জাগ্রত অবস্থা লাভের ন্যায় মৃত অমরু রাজা উত্থিত হইলেন। এবং পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণকে আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—একি! তোমরা আমাকে এখানে কি জন্য আনয়ন করিয়াছ?

অমরু রাজের অবস্থা দেখিয়া ও তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ ভীত ও চমৎকৃত হইল। পরস্পর পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিতভাবে চিন্তা করিতে লাগিল—একি অপূর্ব্ব অদ্ভুত কাণ্ড!

তাহারা সহজে রাজার কথার উত্তর প্রদান করিতে পারিল না। তখন রাজা ব্যাকুলকণ্ঠে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—কেন তোমরা আমাকে শ্মশানে এ অবস্থায় আনয়ন করিয়াছ? রাজার কথায় কেহই কোন উত্তর প্রদানে সাহসী হইল না দেখিয়া রাণী কহিলেন,—"দেব, আপনি পীড়িত অবস্থায় সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলেন। আপনার মৃত্যু আগত মনে করিয়াই আপনাকে সৎকারের জন্য এখানে আনয়ন করা হইয়াছে। যাহা হউক আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আপনি জাগ্রত হইয়া উত্থিত হইলেন। আমরা কেহই আশা করি নাই যে আপনি পুনরায় আর জীবন লাভ করিবেন।" এই বলিয়া রাণী আনন্দ-অশ্রু বিসর্জ্জন



করিতে করিতে রাজার পদতলে নিপতিত হইলেন। রাজা মহা সমাদরে রাণীর হস্ত ধারণ করিয়া উঠাইলেন ও গৃহে গমনের অনুমতি প্রদান করিলেন। মৃত রাজা পুনরায় জীবন লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, রাজভবন আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। রাজধানীতে নানাবিধ আনন্দ উৎসব হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিল রাজা বিশেষ দৈববলে পুনরায় জীবন লাভ করিয়াছেন। কেহ কেহ কহিতে লাগিল রাজার প্রকৃত মৃত্যু হয় নাই। কেবল পীড়ার জন্য কিছুকাল সংজ্ঞাহীন হইয়া অচেতন প্রায় ছিলেন। পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়া সুস্থ হইয়াছেন। প্রকৃত কারণ কেহই বুঝিতে পারিল না।

শঙ্কর এইরূপে স্বীয় আত্মা, মৃত অমরু রাজের দেহে সংক্রামিত করিয়া রাজসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় রাণীর সংসর্গ লাভ করিয়া তিনি কাম-শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। এই অবস্থায় থাকিয়া রাজভোগ সম্ভোগ করিয়াও শঙ্করের পবিত্র আত্মা সংসার সুখে কখনই কিছুমাত্র আশক্ত হইল না। তিনি সেই মহাপুরুষ আচার্য্য শঙ্কর রূপেই অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। শঙ্করের বাহ্য ইন্দ্রিয় মাত্র রাজকীয় ভোগ সুখ উপভোগ করিতে লাগিল ও বহিরিন্দ্রিয় মাত্রে তিনি রাণীর সহিত সহবাস করিতে লাগিলেন। পদ্মপত্রে জলের ন্যায় শঙ্করের বিশুদ্ধ আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র ও নির্ম্মলই রহিল। বিশুদ্ধ মনের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া অমরু রাজের দেহও যেন পরম পবিত্র ও সমুজ্জল ভাব ধারণ করিল। তখন সকলে সে মূর্ত্তি দেখিয়া অতি

বিস্ময়াবিষ্ট হইতে লাগিল। এমন কি পুরমহিলাগণ ও স্বয়ং রাণী পর্য্যন্ত রাজদেহের সে বৈলক্ষণ্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও বিমুগ্ধ হইলেন।

এই অবস্থায় শঙ্কর সময়ে সময়ে অতি উচ্চ জ্ঞান-বৈরাগ্য-পূর্ণ শ্লোক, অমরু রাজ-মুখে পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন। সেই শ্লোক যাহারা শুনিতে পাইল, তাহারাই বিমোহিত হইল ও চিন্তা করিতে লাগিল—এ কি হইল! রাজা অমরু বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইলেও এমন ভাবপূর্ণ ভক্তিজ্ঞানময় শ্লোক রচনা করিবার শক্তি কথনই তো তাঁহার ছিল না। এমন অপূর্ব্ব অমানুবিক শক্তি তিনি কোথা হইতে কিরূপে লাভ করিলেন? এই ভাবিয়া সকলেই বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া উঠিল। রাজার অমাত্যগণ পণ্ডিত সভাসদবৃন্দ, অমরু রাজার এই অদ্ভুত দৈবশক্তির ন্যায় শক্তি লাভের কথা লইয়া নানারূপ কল্পনা ও আন্দোলন আলোচনা করিতে লাগিল। হঠাৎ কেহই যথার্থ কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিল না।

রাজ্ঞী ও রাজার আত্মীয়বর্গ, সেই অদ্ভুত ভাব দেখিয়া উৎকন্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহরা নানাস্থান হইতে বিখ্যাত দৈবজ্ঞ ও গুঢ় মন্ত্রে পারদর্শী তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত গোপনে রাজার অজ্ঞাতসারে আনয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আসিয়া বহু গণনা ও দৈবী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুতেই কোন ফল ফলিল না। অবশেষে এক সন্ন্যাসী আসিয়া রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। তিনি এক দেহ হইতে অন্য দেহে আত্মা সংক্রমনের তত্ত্ব বিশেষরূপে জানিতেন। তিনি অমরু রাজের

অপূর্ব্ব অদ্ভুত ভাব ভঙ্গি দেখিয়া বুঝিলেন যে নিশ্চয়ই অমরুর মৃতদেহে মহাপুরুষের আত্মা সংক্রমিত হইয়াছে। ইহা নিসংশয়ে বুঝিয়া তিনি রাজার প্রধান অমাত্যের নিকট সে গুপ্ত রহস্য পরিব্যক্ত করিলেন। তিনি আরও কহিলেন এই ভৌতিক আত্মাকে সত্বর রাজদেহ হইতে অপসারিত করা নিতান্ত প্রয়োজন। নতুবা রাজার ও রাজ সংসারের বিষম বিপদের বিশেষ সম্ভাবনা।

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া রাজা অমরুর অমাত্য ও আত্মীয়বর্গের বিশেষ চিন্তা ও উৎকণ্ঠা জন্মিল। প্রধান অমাত্য সঙ্গিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজ্ঞী ও পুরমহিলাগণকে সে কথা জানাইলেন। বৃদ্ধ অমাত্য রাজ্ঞীকে করযোড়ে কহিলেন,—"মাতঃ! আপনি বিশেষ বুদ্ধিমতী ও ধীরবুদ্ধিসম্পন্না। তাই আপনাকে সকল কথাই অকপটে বলিল। আপনি অবশ্য পূর্ব্বেই বাহ্য ভাব ভঙ্গি ও লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন যে রাজদেহে আর অমরু রাজ বিদ্যামান নাই। তাঁহার দেহে অপর কোন মহাপুরুষের আত্মা সংক্রামিত হইয়াছে। তাঁহার মুখ হইতে যে সকল অপূর্ব্ব ধর্ম্মকথা সময়ে সময়ে বহির্গত হইতেছে, এবং কখন কখন কথা বার্ত্তায় ও আলাপ পরিচয়ে তিনি যেরূপ অদ্ভুত জ্ঞান বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তাহাতে কখনই মনে হয় না যে বর্ত্তমান রাজ দেহে সেই অমরুরাজ বিদ্যমান আছেন। আমরা বুঝিতেছি যে এই দেহে নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষের জ্ঞানময় পবিত্র আত্মা, রাজার মৃত্যুর সুযোগ পাইয়া, রাজ দেহ অবলম্বন করিয়া রাজভোগ উপভোগ করিতেছেন। বোধ হয় আমাদের বুঝিবার পূর্ব্বেই

আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে সে কথা ও সে ভাব সমুদিত হইয়াছে। আমরাও সেইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছি। বিশেষতঃ অধুনা যে সন্ন্যাসী সাধু মহোদয় রাজধানীতে অবস্থান করিতেছেন, তিনিও সেই অভিমত নিঃসন্দেহে আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।"

প্রধান মন্ত্রীর নিকট এই কথা শুনিয়া রাজ্ঞী সহচরীগণ সহ চমকিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। অতি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহা হইলে এক্ষণে কর্ত্তব্য কি ?"

বৃদ্ধ অমাত্য কহিলেন,—"আমরা সেই জন্যই, আপনার অভিমত ও অনুমতি জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই, আপনার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিরুচি হইবে এবং আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিবেন আমরা তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্য করিব।"

বুদ্ধিমতী রাজ্ঞী কহিলেন,—"পূর্ব্বেই আমার মনে সে সন্দেহ উদিত হইয়াছে। বাহ্য লক্ষণে ও কথায় বার্ত্তায় আচার ব্যবহারে আমারও মনে হয় যেন মৃত রাজা বিশেষ কোন দৈবশক্তি লাভ করিয়া পুনরায় জীবন লাভ করিয়াছেন অথবা কোন শ্রেষ্ঠ আত্মা রাজার মৃতদেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। যখন সন্ন্যাসী সাধুও সেই কথাই সমর্থন করিয়াছেন, তখন কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন। তিনি যেরূপ বলিবেন, সেইরূপই করিতে হইবে। যদি প্রেতাত্মার দূরীকরণের জন্য কোনরূপ দৈব-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন হয়, তবে তাহাই করিতে হইবে। ফলে তিনি যেরূপ অনুমতি করিবেন সেইরূপই ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।"

রাণীর অনুমতি লইয়া, সচিব সেই সন্ন্যাসী সাধুর নিকটে উপস্থিত হইয়া বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভো, আপনার কথাই প্রকৃত সত্য। আমরা এতদিন যথার্থ ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যদিও বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া ও রাজার মুখে নানারূপ সারগর্ভ কথা ও জ্ঞানপূর্ণ বিবিধ ধর্ম্ম কথা শুনিয়া, আমাদের মনে পূর্ব্ব রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহ জন্মিয়াছিল, তথাপি আমরা নিসংশয়ে আপনার নির্দ্দেশ অনুধাবন করিতে পারি নাই। আপনার স্থির সত্য সিদ্ধান্ত চিন্তা করিয়া আমরা ও স্বয়ং রাজ্ঞী বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছি। আপনি পরম কৃপাবান এবং রাজসংসারের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন কি উপায় অবলম্বন করিলে, কি কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে, এ বিষম বিপদ সঙ্কুল সঙ্কট হইতে এই রাজ সংসার ও এই রাজ্য উদ্ধার লাভ করিতে পারে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন,—"তোমাদিগের কোন চিন্তা করিতে হইবে না। উপস্থিত বিপদ নিবারণের উপায় আমি পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি। এক্ষণে আমি যেরূপ বিধানের ব্যবস্থা করি, তোমরা তদনুসারে কার্য্য কর, তাহা হইলেই এই ঘোর সঙ্কট হইতে অনায়াসে সকলেই উদ্ধার লাভ করিতে পারিবে।"

অমাত্য কহিলেন,—"দেব, তবে এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করিব, তাহাই অনুমতি করুন। তদনুসারে আমরা সত্বরই আপনার আজ্ঞা অনুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান করি।"

সন্ন্যাসী কহিলেন,—"আমি যাহা দেখিলাম, তাহাতে বেশ

বুঝিতে পারিয়াছি যে নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষের আত্মা কোন গুঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাজ দেহে আশ্রয় লইয়াছেন। আর সেই মহাজনের মৃতবৎ দেহ এই রাজ্যের কোন গুপ্ত স্থানে সংরক্ষিত রহিয়াছে সত্বরই সেই দেহের দহন সৎকার প্রয়োজন। সেই দেহ ভস্মীভূত হইবামাত্র রাজদেহ হইতে মহাজনের আত্মা অপসারিত হইবে। অতএব তোমরা রাজ্যের সমুদয় গুপ্তস্থান তন্ন তন্ন রূপে অনুসন্ধান করিয়া সেই মৃতবৎ মহাজন-দেহের আবিষ্কার করিয়া তাহার দহন সৎকার কর।”

সন্ন্যাসীর অনুমতি পাইয়া অমাত্যগণ রাজ্যের সকল নিভৃত স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বহু গুপ্তচর বহু গুপ্ত স্থানে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। চরগণ অনুসন্ধান করিতে করিতে যে পর্ব্বতের নিকট গুপ্তস্থানে, শঙ্করের দেহ মৃতের ন্যায় সংজ্ঞাহীন হইয়া শিষ্যগণ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইতেছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইল। শঙ্করের শিষ্যগণ তাহাদিগকে অদূরে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তাহারা তাহাদের গুরুর দেহ ধ্বংস করিবার জন্য তথায় আগমন করিতেছে। তখন তাহারা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল। গুরুর উপদেশ স্মরণ করিয়া মোহমুদ্গরের শ্লোক সমূহ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিভে আরম্ভ করিল। রক্ষিত সংজ্ঞাহীন শঙ্করের আবির্ভাব হইল। এদিকে রাজগৃহে পুনরায় অমরু রাজের মৃত্যু সংঘটিত হইল।

আধুনিক কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি মনে করিতে পারেন যে এ সকল নিতান্ত মিথ্যা গাঁজাখোরী গল্প। কিন্তু যাঁহারা আধ্যাত্মিক

শক্তির ক্রিয়া কলাপ অবগত আছেন তাঁহারা কখনই এমন ব্যাপারকে মিথ্যা অসম্ভব বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। এক দেহ হইতে অপর দেহে আত্মার সংক্রমণ যে অসম্ভব বা মিথ্যা কাণ্ড নয় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহু ভৌতিক ব্যপারে অনেকে উপলব্ধি করিয়াছেন। অনেকে অনেক স্থানে অনেক ভূতগ্রস্ত মানুষ দেখিয়াছেন। সে সকল ভৌতিক ব্যাপার আত্মার সংক্রমণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তবে কথা এই যে সেরূপ ভৌতিক ব্যাপার প্রেত আত্মার সংক্রমণ; কিন্তু জীবিত আত্মার একদেহ হইতে ভিন্ন দেহে সংক্রমণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? শঙ্কর জীবিত অবস্থায় কিরূপে নিজ দেহ হইতে স্বীয় আত্মাকে অমরু রাজের দেহে সংক্রামিত করিলেন? যাহাঁরা যোগ-শক্তির অদ্ভুত প্রক্রিয়ার কথা অবগত আছেন, তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারেন যে যোগীদের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নহে। বহু হিন্দু সন্তান যোগ-সাধনার অপূর্ব্ব ফল, অষ্টসিদ্ধির নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাত আছেন। তাঁহারা এরূপ আত্মার ভিন্ন ভিন্ন দেহে সংক্রমণকে কখনই অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া উপেক্ষা করেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ভারতের আর সেদিন নাই—এখন হিন্দু সন্তান পতিত—অন্ধ-তামসে সমাচ্ছন্ন! তাহার সাধনা নাই—আধ্যাত্মিক শক্তির অনুশীলন নাই, বিকাশ নাই। সুতরাং তাহার পক্ষে এরূপ আধ্যাত্মিক জগতের অদ্ভুত অমানুষিক প্রক্রিয়া অসম্ভব বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাপার যে কেবল প্রাচ্য জগতের মিথ্যা অসার কাল্পনিক কথা এমন নহে; অধুনা পাশ্চাত্য জগতও উহার সত্যতা সারবত্তা

স্বীকার করিয়া থাকে। অভিভরন (Mismerisme) ও প্রেততত্ত্ব (spiritualisn) প্রভৃতি অধ্যাত্ম-জগতের ব্যাপার আজি কালি শিক্ষিত সমুন্নত পাশ্চাত্য-জগতে বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া সমাদৃত হইতেছে। এমন কি ওয়ালেস প্রমুখ প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক-গণও অধ্যাত্ম-জগতের অদ্ভুত প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে সেরূপ প্রক্রিয়ার সত্যতা ঘোষণা করিয়াছেন। কবিকুল চূড়ামণি সেক্সপীয়রের বাণী— "There are more things on earth Horatiso than your philosophy can explain :—কেবল কবি কল্পনার কথা নহে। অন্ততঃ আমাদের অতি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ বুদ্ধিতে অধ্যাত্ম জগতের সে গুঢ়তত্ত্ব অধিগত করিতে পারি না, তাহা মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করা বা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে কখন রসগোল্লা সন্দেশ ভোজন করে নাই তাহাকে রসগোল্লা সন্দেশ মিষ্ট বলিয়া বুঝান যায় না। তেমনি যে কখন নিজে সাধনা করিয়া কিছু রহস্য উপলব্ধি করে নাই, তাহাকে অধ্যাত্ম তত্ত্বের সত্যতা বুঝাইতে পারা যায় না। কারণ সত্যটা স্বীয় বোধরূপ উপলব্ধির বিষয়। উহা যুক্তি তর্কের অতীত সামগ্রী। সে সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। যাহার যেরূপ মতি গতি, যেরূপ সাধনা সুকৃতি সে সেইরূপই উপলব্ধি করিবে ও গ্রহণ করিবে।

শঙ্কর স্বীয় দেহে পুনরায় আবির্ভূত হইয়া মুণ্ডন মিশ্রের আলয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। মুণ্ডনের পত্নী অভয়া দেবীর সহিত পুনরায়

শাস্ত্র-আলোচনা ও তর্কে প্রবৃত্ত হইলেন। মুণ্ডন মিশ্র ও তদীয় পত্নী, শঙ্করের সহিত শাস্ত্র সমরে সম্পূর্ণরূপে পরাস্থ হইলেন। তখন উভয়ে অবনত মস্তকে শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

এই শেষ তর্কের সময় সন্ন্যাস-ধর্ম্ম লইয়া বহু বিতণ্ডা ঘটিয়াছিল। শঙ্করের প্রতিপক্ষ, কলিতে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ বলিয়া প্রস্তাব করেন। সন্ন্যাস ধর্ম্ম সম্মত যুক্তিযুক্ত ও শাস্ত্রগ্রাহ্য হইলে বাস্তবিক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। শঙ্কর উভয়েরই সমর্থন করিয়া, বিপক্ষের প্রস্তাব খণ্ডন করিয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে উপযুক্ত অধিকারীর পক্ষে সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থলে সন্ন্যাস বিধেয় হইতে পারে। অনধিকারীর পক্ষে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই বিধেয়, সন্ন্যাস অবিধেয়।

মুণ্ডন মিশ্র শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাহারই ধর্ম্মমত ও তাঁহারই পন্থা অবলম্বন করিলেন ও বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। মুণ্ডন মিশ্রের ন্যায় পণ্ডিত শিষ্য পাইয়া শঙ্কর বৌদ্ধ ধর্ম্মের নাস্তিক্য ভাব বিদূরীত করিতে বহুল পরিমাণে সফলকাম হইয়াছিলেন। কারণ মুণ্ডন মহা পণ্ডিত ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন সুতার্কিক ছিলেন। অনেকে বলেন মুণ্ডনই পরিশেষ বাচস্পতি মিশ্র হইয়া, বিখ্যাত স্মার্ত্ত ও বেদান্তের টীকাকার রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। এদেশে এক সময়ে হিন্দু রাজা ও সাধারণ হিন্দু প্রজাগণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধগণ বিশেষ রূপে উৎপীড়িত ও অত্যাচারগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সে ভীষণ নির্য্যাতন ও নিষ্ঠুরতার কাহিনীতে তাৎকালিক ভারতের ইতিহাস কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। দলে দলে বৌদ্ধগণকে ধরিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ ও পর্ব্বতচূড়া হইতে ভূমিতে নিক্ষেপ

প্রভৃতি লোমহর্ষণ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিখ্যাত অত্যাচারী রোম-সম্রাট নিরোর রাজত্ব কালে যেমন খ্রীষ্টান দিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হইয়াছিল, বহু হিন্দুরাজগণ বৌদ্ধদিগের উপর সেইরূপ নিষ্ঠুরতা করিয়াছিলেন। নিরো যেমন নিরীহ ধার্ম্মিক খ্রীষ্টানদিগকে দলে দলে বদ্ধ করিয়া সিংহ ব্যাঘ্রের মুখে নিক্ষেপ ও জ্বলন্ত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছিল, এ দেশীয় বহু হিন্দু রাজাও বৌদ্ধগণকে সেইরূপ ভীষণ নিষ্ঠুর ভাবে নিপীড়ন করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন এদেশে সেই বৌদ্ধ অত্যাচারের মূল কারণ শঙ্করাচার্য্যের উত্তেজনা। ইহা কিন্তু নিতান্তই ভ্রমাত্মক কল্পনা মাত্র। ভারতবর্ষের কোন ঐতিহাসিক তথ্যে ইহা নির্দ্ধারিত বা সমর্থিত হয় নাই। বিশেষত শঙ্কর স্বয়ং অতি সদাশয় ও পরম সাধু উদাসীন বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত ও সংপূজিত হইয়াছেন। তাঁহার দ্বারা তেমন অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হওয়া তো দূরের কথা, কল্পিত হইতে পারে বলিয়াও মনে হয় না। শঙ্কর সম্বন্ধীয় কোন ঐতিহাসিক তত্ত্বেই তেমন কথা প্রমানিত হয় নাই বা কখন হইতে পারে বলিয়াও আমরা মনে ধারণা করিতে পারি না। শঙ্কর কোন ধর্ম্মের বা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বৈরী বা বিদ্বেষ্টা ছিলেন না। তাঁহার সময়ে এদেশে যে সকল ধর্ম্মের আবির্ভাব বা অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্মের মধ্যে বহু কদাচার ও কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছিল। ধর্ম্মের সেই সকল ভ্রম ও কুসংস্কার প্রদর্শন করিয়া, তাহাদের উৎকর্ষ উন্নতি সাধনই তাঁহার প্রচার ক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একথা আমরা বারবার মুক্তকণ্ঠে

ঘোষণা করিয়া বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই। কেবল বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কেন, শৈব ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের দোষ ভ্রম দেখিয়া, তিনি কোথাও নীরব থাকিতেন না। সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থলে ধর্ম্মের সে সকল দোষভ্রান্তি উদ্ঘাটিত করিয়া, তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী কালে হয়তো তাঁহার প্রতিপক্ষ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক শঙ্কর দ্বারা বৌদ্ধগণের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী কল্পিত ও প্রচারিত হইতে পারে। ধর্ম্মের যাহা অত্যুন্নতস্তর—অদ্বৈতবাদ—ধ্যান ধারণাদি দ্বারা বদ্ধ আত্মার মুক্তিসাধন করিয়া, ব্রহ্মে সংলীন করণ—হিংসা ক্রোধ আদি রিপুবর্জ্জন—শম দম তিতিক্ষাদি ত্যাগ বৃত্তির অনুশীলন শঙ্করের অভিপ্রেত ধর্ম্মমত ছিল। এবং সেই ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মভাব সর্ব্ব ধর্ম্মক্ষেত্রে সংস্থাপনই তাঁহার প্রচার কার্য্যের পরম পবিত্র ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। হেন মহাপুরুষ সাধু মহাত্মা দ্বারা অমানুষিক অত্যাচারের অনুষ্ঠান বা তৎপক্ষে কোনরূপ উৎসাহ উত্তেজনা প্রদান নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার। উহা কেবল মিথ্যা কাল্পনিক গল্প কথা মাত্র। যিনি, শম, দম, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা সমাধান প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মার্গের পরিচর্চ্চাও পরিস্ফুরণ মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া পরিকীর্ত্তন করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বভূতে ব্রহ্মসত্বা, উপলব্ধি করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনি কখনই হিংসা ক্রোধের ব্যাপারকে উত্তেজনা বা সমর্থন করিতে পারেন না। যিনি শঙ্কর-জীবনী ও শঙ্করতত্ত্ব বিশেষ ভাবে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি কখনই তাহা মুহূর্ত্তের জন্যও মনে চিন্তা করিবেন না। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কুমারীল ভট্টকে অনেকে বৌদ্ধ-পীড়নের

মূলভূত কারণ বলিয়া অনুমান করেন এবং সে অনুমানের মূলে কতকটা সত্য আছে বলিয়া কেহ কেহ স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে শঙ্করাচার্য্য নাস্তিক বৌদ্ধ ধর্ম্মকে পরাভূত ও এদেশ হইতে বিদূরিত করিতে যে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন একথা সকল ঐতিহাসিক মানিয়া লইয়াছেন ও স্বীকার করিয়া থাকেন। শঙ্কর-বিজয়াদি গ্রন্থে তাহার বিশদ প্রমাণ পাওয়া যায়।

একবার মধ্য ভারতের এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজার গৃহে শঙ্করের সহিত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিষম তর্ক-সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে এইরূপ পণ নির্দ্ধারিত ছিল যে যে পক্ষ পরাজিত হইবে, তাহাকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হইতে হইবে। এই রাজা ক্ষমতাবান ও ঐশ্বর্য্যবান ছিলেন। কিন্তু তিনি তেমন বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন না। বৌদ্ধ নেতাগণের সহিত যখন শঙ্করের তর্কযুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল, তখন রাজা কহিলেন,—"আপনারা উভয় পক্ষ তর্ক করিবেন। তাহাতে এক পক্ষ একরূপ নির্দ্দেশ করিবেন। প্রতিপক্ষ অন্যরূপ নির্দ্ধারণ করিবেন। কিন্তু কোন পক্ষের সিদ্ধান্ত যে সত্য ও অভ্রান্ত তাহা আমরা কিরূপে বুঝিব?"

তাহাতে উভয় পক্ষই ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কোন পক্ষই রাজার কথার কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। অবশেষে শঙ্কর কহিলেন,—'মহারাজের যেমন অভিরুচি হইবে, সেইরূপেই পরীক্ষা করিয়া সত্য মিথ্যা বুঝিয়া লইবেন।" এই কথায় রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন—কি উপায়ে উভয় পক্ষের সিদ্ধান্ত হইতে প্রকৃত সত্য নিষ্কাশিত হইতে পারে? রাজা কিছু

স্থির করিতে না পারিয়া মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীও চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া রাজমন্ত্রী এক মন্ত্রণা স্থির করিলেন। মন্ত্রী তখন গোপনে রাজাকে কহিলেন,—"রাজন্, আমি এক মন্ত্রণা স্থির করিয়াছি। এমন অবস্থায় এরূপ ক্ষেত্রে সেই মন্ত্রণাই প্রকৃত উপযোগী বলিয়া আমার মনে হয়।"

এই বলিয়া মন্ত্রী রাজ সন্নিধানে স্বীয় মন্ত্রণা প্রকাশ করিতে ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন, কেননা পাছে রাজা সে মন্ত্রণা শুনিয়া কোনরূপ অবহেলা বা উপহাস করেন। রাজা তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া, মন্ত্রীকে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন,—"তোমার কি মন্ত্রণা তাহা অনায়াসে বলিতে পার। উপযুক্ত বোধ হইলে, আমি সেই মন্ত্রণাই গ্রহণ করিব।"

মন্ত্রী তখন গোপনে কহিলেন,—"প্রভো, আমার বোধ হয় প্রথমতঃ উভয় পক্ষের শক্তি পরীক্ষা করিয়া বুঝা যাউক।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি উপায়ে উভয় পক্ষের শক্তি বিশেষরূপে বুঝিয়া লইতে পারা যায়? সে সম্বন্ধে তোমার যুক্তি পরামর্শ কি?"

মন্ত্রী কহিলেন,—'আমি বিবেচনা করি কোনরূপ দৈবী বা অমানুষিক পন্থা অবলম্বন করিয়া, উভয়ের শক্তি পরীক্ষা করিতে হইবে। যখন উভয় পক্ষই ভাবে দৈবীবলে বলবান বলিয়া প্রকাশ করিতেছে, তখন দৈবী-পন্থা দ্বারা পরীক্ষা করাই কর্ত্তব্য। আমার মনে হয় একটা শূন্য ভাণ্ড তাহাদের উভয় পক্ষের সম্মুখে সংস্থাপন করা হউক। তৎপরে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাউক যে হাঁড়ির

মধ্যে কি আছে? যে পক্ষ ঠিক সত্য উত্তর দিতে পারিবে তাহাদের কথাই সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইবে এবং তাহারাই জয়মাল্য লাভ করিবে।”

রাজা মান্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং মন্ত্রীর মন্ত্রণাই যথার্থ উপযুক্ত বলিয়া সেইরূপ আয়োজন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তখন একটী ভাণ্ডের মুখ আবরণ দ্বারা উত্তমরূপে আবদ্ধ ও আবৃত করিয়া, শঙ্কর-পক্ষ ও বৌদ্ধ-পক্ষ উভর পক্ষের মধ্যে সংস্থাপন করা হইল। রাজা কহিলেন,—আপনাদের উভয় পক্ষের মধ্যে যিনি বলিতে পারিবেন এই ভাণ্ডের মধ্যে কোন দ্রব্য আছে, তিনিই জয়লাভ করিবেন।”

বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের নেতাগণের নানাজন নানা কথা কহিতে লাগিলেন। অবশেষে শঙ্কর কহিলেন,—“হাঁড়ির মধ্যে বিষধর ভুজঙ্গম বিদ্যমান রহিয়াছে।”

শঙ্করকে অনেকেই মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিয়াছিল। তাঁহার সিদ্ধান্তে আস্থা প্রদান করিয়া, কেহ কেহ হাঁড়ির মুখের বন্ধন উন্মোচন করিতে আশঙ্কা করিতে লাগিল। অবশেষে রাজার আদেশে হাঁড়ির মুখ খোলা হইল। তখন দেখা গেল সত্যই হাঁড়ির মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর কালসর্প গর্জ্জন করিতেছে!

অবিসম্বাদিত রূপে শঙ্কর বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে পরাজিত করিলেন। কিন্তু তাহাদের প্রতি কোনরূপ দণ্ড প্রদান করিতে বা তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে এক্ষেত্রেও কখনই বলেন নাই—অন্যক্ষেত্রেও বলেন নাই।

কিছুকাল পূর্ব্বে প্রতিভাসম্পন্ন ভট্ট কুমারীলের সময় হইতেই এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম নিষ্প্রভ ও ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। শঙ্করের প্রতিপক্ষতায় অতপর নাস্তিক বৌদ্ধ ধর্ম্মের শীর্ষদেশ চূর্ণীকৃত হইল।

শঙ্কর স্বয়ং এবং তাঁহার অনুগামী শিষ্য ও পণ্ডিতবর্গ এইরূপ নানাস্থানে বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও বৌদ্ধ সংঘকে তর্ক বিতণ্ডায় এবং দৈবী প্রক্রিয়ায় পরাজয় করিতে লাগিলেন। তখন তাহাদের প্রভা নিতান্তই মলিন হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ তাহাদের মধ্যে নানারূপ কুক্রিয়া ও কদাচার আশ্রয় লওয়ায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবস্থা দিন দিন অতীব শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ একটী প্রচলিত কথা আছে যে, 'সকল ঘরে পাপ সয়, কিন্তু ধর্ম্মের ঘরে কখন পাপ সয় না।' ইহা নিতান্ত সামান্য বা তুচ্ছ সাধারণ কথা নহে। ধর্ম্ম যে ভগবানের পরম প্রিয় নিজস্ব ধন। ধর্ম্মেই জগৎ সংরক্ষিত, ধর্ম্ম বলেই সংসার সমুন্নতির পথে পরিচালিত। সৎ শুভ ধর্ম্মের অনুশীলন ও পরিস্ফুরণ হেতুই মানব জাতির উদ্ভব। এমন যে সূক্ষ্ম সৎ সামগ্রী ধর্ম্ম, তাহার বর্জ্জন বা অবনতি ঘটিলে, ভগবান কখনই তাহা সহ্য করিতে পারেন না। তিনি বিশেষ বিধান, বিবিধ উপায় দ্বারা সে ধর্ম্মের বিলোপ বা সংস্কার সাধন করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান বঙ্গে নেড়া নেড়ীর দল জুটিয়া যেমন পবিত্র, অতি মঙ্গলময় বৈষ্ণবধর্ম্মের ভীষণ গ্লানি অপকার সংঘটন করিয়াছে, তেমনি বৌদ্ধযুগের শেষ দশায়, বৌদ্ধ ভিক্ষুভিক্ষুনীগণ, স্থানে স্থানে সংস্থাপিত বৌদ্ধ সংঙ্ঘে বা মঠে সমবেত হইয়া বিবিধ বিভৎস ক্রিয়া

কলাপের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। কিছুদিন পূর্ব্বে এদেশে তান্ত্রিক সম্প্রদায়, মদ্য মৎস্য মাংস প্রভৃতি পঞ্চমকার সাধনের দোহাই দিয়া, যেমন পতিতা পরিত্যক্তা রমণী লইয়া পাপাচারে প্রবৃত্ত রহিত, বৌদ্ধ সম্প্রদায়েও বহু পথভ্রষ্ট পুরুষ ও রমণী, পবিত্র ধর্ম্মের নাম লইয়া, সেই রূপ কদাচারে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। অহিংসার সে মহামন্ত্র তাহাদের মধ্যে বিলুপ্ত প্রায় হইয়া উঠিল। ধৈর্য্য দয়া আদি ত্রিমার্গী সাধন প্রক্রিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিত্যক্ত হইয়া দাঁড়াইল। তৎপরিবর্ত্তে কদর্য্য তান্ত্রিকাচারের ন্যায় মদ্য মাংস ও মৈথুনাদি কুক্রিয়ার স্রোত তাহাদের মধ্যে অতি প্রবল ভাবে বহিতে আরম্ভ করিল। বৌদ্ধ দলের এইরূপ ভাবভঙ্গী মতি গতি দেখিয়া জন সাধারণ তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল। অনেকে অনুমান করেন যে পতিত বৌদ্ধগণের অনুষ্ঠিত বহু কুৎসিৎ সাধন প্রণালী ও মারাণ উচাটন বশীকরণাদি আচরণ প্রচ্ছন্ন ভাবে পরবর্ত্তী তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

এই সকল ঘৃণিত কুক্রিয়া কদাচারে বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্ম, জনগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইল। তদুপরি বহু স্থানে বহু রাজ-সভায় ও সভাস্থলে বৌদ্ধনেতাগণ সনাতন-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতাগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইতে লাগিল। তখন বহু হিন্দুরাজা তাহাদিগকে দলে দলে নিজ নিজ দেশ হইতে বিতাড়িত করিলেন এবং রাজাগণের মধ্যে কোন কোন নিষ্ঠুর রাজা তাহাদিগকে অত্যাচারে নির্য্যাতনে নিপীড়ন করিতে লাগিলেন, ইহা অবশ্য ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া অবধারিত ও গৃহীত হইয়াছে।

বহু প্রাচীন কালের ন্যায় বৌদ্ধ-যুগের ভারত-ইতিহাসও অতীব তমসাচ্ছন্ন। বহু-প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বৌদ্ধকালের ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যতার অনুসন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই তৎসম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। একই বিষয়—একই ঘটনা সম্বন্ধে দুইজন ঐতিহাসিক দুই প্রকার বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ সকল ব্যাপারে সকল ঘটনায় ঐতিহাসিক গণের মধ্যে মত-পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শঙ্করের আবির্ভাব ও অভ্যুদয়ের ঘটনাও বৌদ্ধযুগের শেষ সময়ে ঘটিয়াছিল। তখনকার ভারত ইতিহাস ঘোর আঁধারে সমাকীর্ণ। তৎকালের এ দেশীয় ঐতিহাসিক তথ্য যথার্থরূপে নির্দ্ধারিত করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। সুতরাং শঙ্করের সমসাময়িক ঘটনাবলির সত্যতা কখনই নিসন্দেহে নিরূপিত হইতে পারে না। বিশেষত এখনকার মত সে কালে ইতিবৃত্ত সম্বন্ধীয় প্রকৃত কথা লিখিবার পদ্ধতি প্রায় কোন দেশেই প্রচলিত ছিল না—এদেশেও ছিল না। এদেশে প্রায় সকল ঘটনা সকল কথা কবিতা ছন্দে—কাব্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইত। কাব্যে অনেক সময় অলঙ্কার ছলে, সৌন্দর্য্যের অনুরোধে ও রসোল্লাসের উচ্ছাসে সহজেই অতিরঞ্জন ও বৈচিত্র্য আসিয়া পড়ে। এদেশীয় বহু মহাপুরুষের জীবনী কাব্য রূপে কবিতাছন্দে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শঙ্কর-বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের জীবনীও সেইরূপ কাব্য আকারে কবিতা-ছন্দে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং কাব্যের যাহা দোষ, সেই অতিরঞ্জন অলঙ্কার ও কাল্পনিক কাহিনীও যে তাহাতে স্থান পায়

নাই এমন কথা কেহই বলিতে পারে না এবং আমরাও তাহা বলি না। তবে সেই সকল জীবনীগ্রন্থ ও সমসাময়িক অপর গ্রন্থ নিচয় বা কিম্বদন্তী হইতে যে সারোদ্ধার হইয়াছে, তাহাতে এমন কথা ও ঘটনা শঙ্কর জীবনী সম্বন্ধে লাভ করা যায়, যাহাতে স্বতঃই আস্থা জন্মিতে পারে। সেই সকল সূত্র অবলম্বন করিয়াই আমরা শঙ্কর-জীবনী এইরূপে সংগৃহীত করিয়াছি। প্রায় সকল প্রধান কথা ও সূক্ষ্ম ঘটনা তদনুসারে বিবৃত করা হইল। যাহা নিতান্ত অসার বা নিতান্ত অলীক নিরর্থক কবিকল্পনা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহাই উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পরিশেষে শঙ্করের জীবনে যে যে প্রধান গুঢ়তর ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আধুনিক শিক্ষিত সমাজে বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া বোধ হইলেও আমরা তাহা উল্লেখ না করিয়া এই মহৎজীবনী পরিসমাপ্ত করিতে পারি না। শঙ্কর, দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, ভারতবর্ষের বহুস্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বহুস্থানে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রচারিত হইতে লাগিল। তাঁহার যশ-সৌরভ সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। শত শত সুপণ্ডিত শিষ্য প্রশিষ্য আসিয়া তাঁহার পদতলে মস্তক লুণ্ঠন করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র ব্যক্তি, কি সাংসারিক কি সন্ন্যাসী সকলেই তাঁহার সম্প্রদায়ে যোগ দান করিয়া বিশেষরূপে দলপুষ্টি করিয়া তুলিল। এই সময়ের মধ্যে শঙ্কর বহু মৌলিক ও ভাষ্য টীকা পুস্তক লিখিয়া প্রচার করিলেন। সেই সকল গ্রন্থ ও পুস্তকের মধ্যে বেদান্তের ভাষ্য বিশেষ লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। শঙ্কর কৃত এই ভাষ্যের নাম শারিরিক ভাষ্য।

দার্শনিক শ্রেণীর পণ্ডিত গণের মধ্যে শারিরিক ভাষ্যের বিশেষ সমাদর হইল। এ পর্য্যন্ত বেদান্তের যত ভাষ্য হইয়াছে তন্মধ্যে দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে শারিরিক ভাষ্যের যেরূপ সম্মান ও সমাদর তেমন আর কোন ভাষ্যেরই নহে। বিশুদ্ধ অদ্বৈত তত্ত্ব ও অদ্বৈত-বাদ শারিরিক ভাষ্যে যেরূপ যুক্তি ও চিন্তার সহিত নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এমন আর কোথাও নহে। বাস্তবিক একমাত্র শারিরিক ভাষ্যের সহিত বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যয়নেই মানব আপন তত্ত্বচিত ও মহত্ব বুঝিতে পারে—তাহাতেই তাহার মায়া মোহ কাটিয়া যায়। তখন সে বিশদভাবে বুঝিতে পারে যে মায়ার আঁধারে জীবাত্মা অন্ধ হইয়া 'সংসার' 'সংসার' করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে—তখনই সে জানিতে পারে যে তাহার আত্মার ভূমাভাব কেবল মোহের বন্ধনে পড়িয়া সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই মায়ার আঁধার, মোহের বন্ধন কাটাইতে পারিলেই জীব শিব হইয়া যায়—জীবাত্মা পরমাত্মায় পরিণত হয়। তখন বদ্ধ জীব, দুঃখ দৈন্যের হাত এড়াইয়া ভূমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। শ্রবণ মনন নিধিধ্যাসনাদি বিজ্ঞান-মার্গের সাধন ও আত্মবোধের দ্বার দিয়া সেই পরমানন্দপুরে পঁহুছিতে হয়। শারিরিক ভাষ্যে এই সকল গুঢ় তত্ত্ব কথা অতি সুন্দর ও বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই সকল কারণে, সাধকের নিকট শারিরিক ভাষ্যের তুল্য সমাদরের সামগ্রী আর কিছুই নাই। তবে যাঁহারা দ্বৈতবাদী, ভক্তি পন্থার অনুসরণকারী, তাঁহাদের নিকট 'শারিরিক' তেমন উপাদেয় বলিয়া

বোধ হয় না। তাঁহারা এই উপাদেয় ভাষ্যকে নিতান্ত হেয় বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এমন কি জ্ঞান ভক্তির পরমাধার স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গদেব পর্য্যন্ত শারিরিক ভাষ্যকে নিতান্ত হেয় ও পরিত্যাজ্য গ্রন্থ বলিয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি যাহাই বলুন বা যেরূপ চক্ষেই দেখুন, এদেশে এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন সমাজে ধর্ম্ম স্থাপন ও ধর্ম্ম রক্ষণের জন্য এরূপ গ্রন্থের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল। এখন যুক্তিবাদ (Rationalism) যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষিত জগতের শ্রেষ্ঠ অপূর্ব্ব ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তেমনি বৌদ্ধ যুগে সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া যুক্তিবাদের জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছিল। চারিদিকে লয়-তত্ত্বের (Annihilation, destruction of Self) প্রবল ঝটিকা সমুত্থিত হইয়াছিল। ভগবানই বা কে? মনের একটা ভ্রম। জগৎই বা কি? মনের একটা বিকার। ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নয়। কেবল কতকগুলা কল্পনা ভ্রম 'আমি' 'তুমি' সাজিয়া মিছা কষ্ট ভোগ করিতেছে। এই 'আমি 'তুমির' ভ্রম গুলাকে ধ্বংস (anrnihilation of self) করিয়া ফেলাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—তাহাতেই মনুষ্যত্বের মহত্ত্ব—তাহাই পুরুষকার। ইহা বৌদ্ধ যুগের নূতন কথা তাহা নহে। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বেও সাংখ্য শাস্ত্রকার কপিলদেবও এইরূপ শিক্ষাই দিয়াছিলেন। নিরীশ্বর সাংখ্যবাদের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের লয় সাধন, এই নির্ব্বাণ-কামী বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে বড় বেশী পৃথক সামগ্রী নহে; তবে সাংখ্য বাদের নাস্তিক্য অপেক্ষা বৌদ্ধধর্ম্মের নাস্তিকতা অতি বিকট আকারে মস্তক উত্তোলন করিয়া, ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্র বিপর্য্যস্ত করিবার উপক্রম

করিল। তখন শঙ্করের ন্যায় মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া, শারিরিক ভাষ্যাদির ন্যায় তত্ত্ব গ্রন্থ প্রচার না করিলে বৌদ্ধ-নাস্তিকার প্রবল স্রোতে বিশেষ বাধা পড়িত বলিয়া মনে হয় না।

শারিরিক ভাষ্য প্রচারিত হইলে বহু পণ্ডিত যেমন সাদরে ও আগ্রহে উহা গ্রহণ করিলেন, তেমনি আবার কতকগুলি পণ্ডিত উহার বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন। স্বয়ং বেদব্যাস শারিরিক ভাষ্যের শ্লোক লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন—এতই উহার গুঢ়ত্ব ও মহত্ত্ব প্রখ্যাত হইয়াছিল। এমন কি তিনি একদা, শারিরিক ভাষ্যের এক তথ্য সম্বন্ধে স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যের সহিত তর্কালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে শঙ্কর, শারিরিক ভাষ্য প্রচার করিয়া একদা ৺ কাশীধামে পরম পবিত্র মণিকর্ণিকার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া একাগ্র মনে আত্মচিন্তায় রত আছেন, এমন সময়ে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া বেদব্যাস তথায় উপস্থিত হইলেন। বেদব্যাস অমর—দেবযোনির ন্যায় সর্ব্বত্র গমনক্ষম সর্ব্বদর্শী। তিনি শারিরিক ভাষ্যের সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিগুঢ় ভাবে অবগত হইয়া, পরম সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি শারিরিক ভাষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে সমুৎসুক হইলেন।

সেই জন্য তিনি নিজেই পবিত্র মণিকর্ণিকার সন্নিধানে শঙ্করের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যদিও তিনি অতি বৃদ্ধ ব্রহ্মাণের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিতে দিব্য জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। প্রজ্বলিত অগ্নি কখন ভস্মাচ্ছাদিত

থাকিতে পারে কি? শঙ্কর বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার সম্মুখে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। শঙ্কর, শিষ্টাচার ও সৎকারাদি সমাধান করিয়া, বিনীত বচনে তাঁহার অগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহিলেন,—'তুমি শঙ্করাচার্য্য। তুমি বেদান্তের এক বিশদভাষ্য প্রস্তুত করিয়াছ। আমি তাহা পাঠ করিয়াছি। তোমার কৃত ভাষ্যের কোন কোন স্থানে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার সহিত সে সম্বন্ধে আলোচনা ও তর্ক করিয়া সন্দেহ দূরকরিতে ইচ্ছা করিয়াছি।"

শঙ্কর সম্মত হইলে, উভয়ের মধ্যে বেদান্তের ভাষ্য লইয়া বিষম বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। ক্রমে বেদান্ত সম্বন্ধে নানা তর্ক হইতে হইতে একটী সূত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশধারী ব্যাস নিম্নলিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তদনন্তর প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্যক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং"

এই প্রশ্ন লইয়া উভয়ের মধ্যে ক্রমে বিবাদ বাধিয়া উঠিল। উভয়েই ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। শঙ্কর এতই ক্রুদ্ধ হইলেন যে বৃদ্ধকে চপেটাঘাৎ করিলেন ও তাহাকে তথা হইতে দূরীভূত করিবার জন্য প্রিয় শিষ্য পদ্মপাদকে আদেশ করিলেন। পদ্মপাদ সামান্য শিষ্য ছিলেন না। তিনিও উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। তিনি দিব্য-দৃষ্টিতে নিজ গুরু শঙ্করকে যেমন জানিয়াছিলেন, তেমনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশধারী বেদব্যাসকে চিনিয়াছিলেন। গুরুদেব শঙ্করাচার্য্যের কঠোর আদেশ শুনিয়া

তিনি ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন, এবং আপনা আপনি স্বগত কহিতে লাগিলেন :—

"শঙ্কর শঙ্কর সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণং স্বয়ং।
তয়োর্ব্বিবাদে সম্প্রাপ্তে ন জানে কিংকরোম্যহম্ ॥

অর্থাৎ আচার্য্যদেব শঙ্কর সাক্ষাৎ শঙ্কর আর ব্যাসদেব স্বয়ং নারায়ণ। এখন দুইজনের মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছে। এমন স্থলে আমি করি কি ?"

যাহা হউক ব্রাহ্মণরূপী ব্যাসদেব শঙ্করের কথায় ও বিচারে পরিতুষ্ট হইলেন ও আত্ম-প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"আচার্য্য শঙ্কর, আমি তোমার বিচারে অতীব আনন্দিত হইয়াছি। এক্ষণে আমি প্রস্থান করিতেছি। যাইবার পূর্ব্বে তোমায় একটি বর প্রদান করিয়া যাইব। তোমার পরমায়ু অতি অল্পকাল মাত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কেবল ষোড়শবর্ষ মাত্র তোমার জীবন কাল। আমার বরে তোমার পরমায়ু বর্দ্ধিত হইবে। তুমি দ্বাত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া, তোমার ধর্ম্মমত প্রচার করিতে পারিবে।"

শঙ্কর, বৃদ্ধব্রাহ্মণ বেশধারী বেদব্যাসকে বিনয়-নম্র বচনে পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় দান করিলেন। তর্কফলে শিষ্য পাদ্মপাদও পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

শঙ্কর-শিষ্য পদ্মপাদও অপূর্ব্ব অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার উপাখ্যান অতি অদ্ভুত। ইনি চোল দেশীয় ব্রাহ্মণ-সন্তান। ইহাঁর আদি নাম সনন্দন। আচার্য্য শঙ্কর কাশীধামে আসিয়া,

গঙ্গাতীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গঙ্গার পরপারে সনন্দনকে দেখিয়া, শঙ্কর জানিতে পারিলেন যে সনন্দন অসাধারণ ব্যক্তি। সনন্দন শঙ্করের শিষ্য হইবার জন্য আগ্রহ চিত্তে তথায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। গুরুদেব উপযুক্ত শিষ্যকে দেখিয়া উৎফুল্ল হইলেন ও হস্ত-সঙ্কেত দ্বারা গঙ্গার অপর পারস্থ শিষ্যকে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। পরপারে তখন নদী পার হইবার জন্য নৌকা উপস্থিত ছিল না। সনন্দন সঙ্কটে পড়িয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। আচার্য্যদেব তাঁহাকে বার বার হস্ত-সঙ্কেতে ডাকিতে লাগিলেন। সনন্দন [illegible] হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—গুরুদেবের আদেশ অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে। আচার্য্য দেব সাধারণ ব্যক্তি নহেন। যাঁহার অনুগ্রহে ভবনদী উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়, তাঁহার কৃপা হইলে, অবশ্যই আমি এই নদী অনায়াসে পার হইতে পারিব! এই ভাবিয়া সনন্দন নদীর জলে অবত[illegible] করিলেন। তাঁহার অদ্ভুত গুরুভক্তি ও অসাধারণ বিশ্বাস বলে নদীতে পার হইবার সময় এক অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হইল। সুনন্দন যেখানে যেখানে নদীর সলিলে পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন, নদীগর্ভ হইতে সেই সেই স্থানে এক একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম উদ্গত হইতে লাগিল। প্রতি পদক্ষেপে পদ্মের আবির্ভাব দেখিয়া, সনন্দন উৎসাহিত হইয়া প্রত্যেক পদ্মের উপর পদস্থাপন পূর্ব্বক অনায়াসে নদী পার হইলেন। গুরুদেবের সকাশে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং বিনীতভাবে করযোড়ে কহিলেন,—"আপনার কৃপায়, অদ্ভুত দৈববলে আমি এই

নদী পার হইলাম। আপনি দয়া করিয়া অদ্ভুত শক্তিবলে আজি আমাকে এই ক্ষুদ্র পার্থিব নদীতে পার করিলেন। কিন্তু আমার সম্মুখে অতি ভীষণ দুস্তর ভব-সমুদ্র। এই ভবনদী পার হইবার এক মাত্র উপায় আপনার পদতরণী। পরম দয়াময় প্রভো, দয়া করিয়া আমাকে পদ-তরণীতে আশ্রয় দান করুন। যাহাতে আমি আপনার অনুগ্রহে এই নিদারুণ সঙ্কট-সঙ্কুল-ভবসাগর পার হইতে পারি তাহার উপায় বিধান করুন। আপনি ভিন্ন এ জীবন-সঙ্কটে আমার উদ্ধারের আর উপায়ন্তর দেখি না।" এই বলিয়া পরম গুরুভক্ত সনন্দ আচার্য্যদেবের চরণ-তলে নিপতিত হইয়া ভক্তি অশ্রুতে গুরু-চরণ অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। আচার্য্যদেব পরম করুণার নিধান পরম শিষ্য-বৎসল। তাঁহারই কৃপাবলে সনন্দ প্রস্ফুটিত পদ্মে পদক্ষেপ করিয়া নদী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারই কৃপায় ভবসাগর পার হইবেন বলিয়া একান্ত মনে গুরুদেবের শরণাপন্ন হইয়া শিষ্যত্ব লাভের প্রার্থনা করিলেন। আচার্য্যদেব নিজ ধর্ম্মমত সংস্থাপন ও প্রচারের জন্য সনন্দের ন্যায় পণ্ডিত গুরুভক্ত শিষ্যই চাহিতে ছিলেন। সনন্দনকে পাইয়া, তিনি পরম পরিতুষ্ট হইলেন। আচার্য্যদেব তাঁহাকে পদ্মপাদ নাম প্রদান করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। যেরূপ অদ্ভুত ঘটনা-বলে, আচার্য্য দেব শিষ্য সনন্দকে নদী পার করাইয়া, আপনার নিকট আনয়ন করেন, সেইরূপ অমানুষিক কাণ্ড তিনি বহুবার বহু স্থানে প্রদর্শন করেন। সে কথা পরে বিশেষভাবে বর্ণিত হইবে।

একদা অধ্যয়নকালে যখন শঙ্কর গুরু-গৃহে অবস্থান করিতে-ছিলেন, তখন তাঁহার আচার্য্য ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য জনপদে গমন

করিতে আদেশ করেন। গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, শঙ্কর গ্রামের মধ্যে গমন করিলেন। তথায় ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য এক ব্রাহ্মণের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। তাঁহাকেও ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইত। সুতরাং ব্রাহ্মণ, গৃহিণীকে গৃহে রাখিয়া, নিজে ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। শঙ্কর আসিয়া সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পত্নীর নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণী মহা সঙ্কটে পতিত হইলেন। প্রার্থীকে ভিক্ষা প্রদান না করিয়া কিরূপে প্রত্যাখ্যান করিবেন এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। ভাবিতে ভাবিতে নিতান্ত অধীর হইয়া তিনি আপনাআপনি কহিতে লাগিলেন,—"দয়াময় ভগবন, একি ঘোর বিপদ! ভিক্ষাপ্রার্থী বালকের মূর্ত্তি দেখিয়া, সামান্য বা সাধারণ বালক বলিয়া মনে হয় না। এমন ভিক্ষাপ্রার্থীকে ভিক্ষা প্রদান না করিয়া বিদায় দান কি বিষম ব্যাপার। অহো এ কথা ভাবিতেও যে হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে। তদপেক্ষা যে এই মূহুর্ত্তে আমার মৃত্যু হওয়াই পরম মঙ্গল ছিল। এখন কি করি? কোন মুখে 'ঘরে কিছু নাই' বলিয়া এমন ভিক্ষার্থী বালককে গৃহ হইতে বিদায় প্রদান করি?"

ব্রাহ্মণীকে চিন্তাকুল অবস্থায় নিপতিতা দেখিয়া শঙ্কর কাতর কণ্ঠে কহিলেন,—'মাত, আপনি মনে কিছু করিবেন না; আমি সকলই বুঝিয়াছি। আপনাদের আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও ভিক্ষুককে ভিক্ষা প্রদানের অবস্থা নাই। আমি হৃষ্টচিত্তে আশ্রমে

প্রত্যাগমন করিতেছি। আপনি তজ্জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেন না।”

এই বলিয়া শঙ্কর সেই ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন। তখন ব্রাহ্মণী অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া একটী হরিতকী নিজ হস্তে লইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে শঙ্করকে কহিলেন “বৎস, তুমি যথার্থই বুঝিয়াছ আমরা নিতান্তই দরিদ্র। ভিক্ষা দ্বারা আমরা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। গৃহে তেমন কোন সামগ্রী নাই যাহা ভিক্ষা দিয়া তোমায় পরিতুষ্ট করিতে পারি। কিন্তু যে গৃহস্থের গৃহ হইতে অতিথি বা ভিক্ষাপ্রার্থী হতাশ হইয়া যায় তাহার গৃহ-আশ্রমের ধর্ম্মকর্ম্ম পণ্ড হয়। কিন্তু কি করি বৎস আমরা নিতান্তই মন্দভাগ্য; তাই তোমাকে ভিক্ষা প্রদান করিতে পারিলাম না। যাহা হউক এই সামান্য ফলটি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর।”

ব্রাহ্মণীর হস্ত হইতে ফলটি গ্রহণ করিয়া শঙ্কর সেই গৃহস্থের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। গৃহস্থ-পরিবার যে ধর্ম্মপরায়ণ কিন্তু নিতান্ত দরিদ্র, তাহা বিশেষরূপে বুঝিয়া তাঁহার করুণ হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি তখনই একান্ত মনে গৃহস্থের দারিদ্র্য-দুঃখ বিমোচনের জন্য কমলা দেবীর উপাসনায় নিরত হইলেন। শঙ্করের উপাসনাও প্রার্থনায় কমলা তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হইলেন। অল্পকালের মধ্যে সেই দরিদ্র গৃহস্থের অভাব দুঃখ দূরীভূত হইল। গৃহস্থ প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হইলেন। শঙ্করের এই অদ্ভুত দৈবী-শক্তির কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল।

শঙ্কর গুরুগৃহ হইতে নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, তদ্দেশীয় নরপতি একটি হস্তী ও বহু ধন রত্ন সহ শঙ্করকে পূজা করিবার জন্য স্বীয় সচিবকে প্রেরণ করেন। রাজা পুত্রহীন ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন শঙ্কর যেরূপ অদ্ভুত দৈববলে বলীয়ান, তাহাতে তাঁহার কৃপালাভ করিলে তিনি পুত্রলাভ করিতে পারিবেন। সচিব রাজদত্ত উপহার লইয়া শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইলেন ও বিনীতভাবে কহিলেন,—'মহাত্মন, নরপতি আপনার জন্য এই হস্তী, এই সকল বিবিধ ধন রত্ন প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি এই সকল গ্রহণ করিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলে তিনি ধন্য ও কৃতার্থ হইবেন। উপহারের হস্তী ও ধন রত্ন দেখিয়া শঙ্কর মন্ত্রীকে কহিলেন, 'মহাশয়' আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। সামান্য ভিক্ষায় জীবন ধারণ ও সামান্যভাবে জীবন যাপন করি। কেবল ভগবৎ-আরাধনা ও ধর্ম্মচর্চ্চা করাই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। তাহাই ব্রাহ্মণের প্রকৃত পন্থা। সে পবিত্র পন্থা ত্যাগ করিয়া বিলাসভোগে লিপ্ত হওয়া কখনই সুব্রাহ্মণের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ যাহাতে সদাচারে ও সৎ নিষ্ঠায় থাকিয়া ধর্ম্ম চর্চ্চা করিতে পারেন, তৎপক্ষে উৎসাহ দান ও ব্যবস্থা বিধান করাই হিন্দু নরপতির প্রধান কর্ত্তব্য। আমি রাজ-দত্ত ঐ সকল বিলাস দ্রব্য ও ভোগ্য সামগ্রী গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিনা। রাজাকে আমার আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়া আমার অভিপ্রায় কহিবেন। আমি ভগবানের নিকট একান্ত মনে রাজার মঙ্গল প্রার্থনা করি। যিনি সর্ব্বব্যাপী, সকল মঙ্গলের আধার, তাঁহার কৃপায় রাজার মন-বাসনা

সত্বর পূর্ণ হইবে।” এই বলিয়া উপহার দ্রব্যাদি গ্রহণ না করিয়া মন্ত্রীকে বিদায় দিলেন। মন্ত্রী বারম্বার অনুরোধ ও প্রার্থনা করিলেও মহাত্যাগী মহাত্মা শঙ্কর সে সকল ভোগ্য-উপহার গ্রহণ করিলেন না। পরন্তু শঙ্করের আশীর্ব্বাদে সত্বরই রাজার অভিলাষ সংপুরিত হইল। তিনি অচিরে পুত্র সন্তান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

আর একবার মধ্যার্জ্জুন নামক স্থানে গমন কালে, শঙ্করাচার্য্য তথায় প্রভাকর নামক এক ব্রাহ্মণের ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করেন। শঙ্কর ধনী বিলাসীর গৃহে অতিথি হইতে ইচ্ছুক ছিলেন না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ গৃহই তাঁহার আতিথ্য গ্রহণের অভিপ্রেত আশ্রয় ছিল। ব্রাহ্মণ প্রভাকর নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। দরিদ্র হইলেও তিনি সাধু ছিলেন ও অতিথি সৎকারে সর্ব্বদাই যত্ন করিতেন। শঙ্কর প্রভাকরের গৃহে উপস্থিত হইলে, সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া মধুপর্ক দ্বারা সৎকার করিলেন। তাঁহার পরিচর্য্যায় শঙ্কর অতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন। উক্ত ব্রাহ্মণের একটি জড় ভাবাপন্ন পীড়াগ্রস্ত পুত্র ছিল। পুত্রটি মূক ও বধিরের ন্যায় ছিল। পরিষ্কার ভাবে বাক্য উচ্চারণ করিতেও পারিত না। ব্রাহ্মণ পুত্রের পীড়া ও জড়ভাব দূরীকরণের জন্য শঙ্করের চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ নিজে সাধু ধার্ম্মিক ব্যক্তি। ধর্ম্মের অপূর্ব্ব প্রভাবে শঙ্করের দৈবী-শক্তির বিষয় ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছিলেন। তাই কাতর কণ্ঠে শঙ্করের নিকট পুত্রের আরোগ্য মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। শঙ্কর সাধু সজ্জন ব্রাহ্মণের উপর পরিতুষ্ট ছিলেন। তিনি প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিলেন। শঙ্করের বরে ও

আশীর্ব্বাদে ব্রাহ্মণ-পুত্র আরোগ্য লাভ করিয়া, দিব্য দেহ, রূপ ও জ্ঞান বুদ্ধিলাভ করিল। সে শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অল্পকালেই মহা পণ্ডিত হইয়া উঠিল। আচার্য্যদেব তাহাকে হস্তামলক নাম প্রদান করিলেন। সুবিখ্যাত তত্ত্বপূর্ণ "হস্তামলক" পুস্তিকা ইহাঁরই দ্বারা প্রণীত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। হস্তামলক আচার্য্যের অনুবর্ত্তী হইয়া পরিব্রজ্যা অবলম্বন করেন।

বিদেশে অবস্থান কালে শঙ্কর যোগ-সমাধি বলে জানিতে পারিলেন যে তাঁহার মাতার শরীর ক্রমেই নিতান্ত শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাহা জানিতে পারিয়া জননীগত-প্রাণপুত্রের হৃদয় বিগলিত হইল। শঙ্কর মহৎ কার্য্য সাধনের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, সংসারে এমন কি নিজদেহে পর্য্যন্ত তাঁহার কিছুমাত্র আসক্তি ছিলনা, তাহাও সত্য, কিন্তু তিনি মাতার কথা মাতার প্রতি ভক্তি কখন ভুলিতে পারেন নাই। মাতৃবৎসল পুত্রের প্রাণ জননীর চরণ-দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শঙ্কর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেই মাতার নিকট অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন যে জননীর অন্তিম-কালে, তিনি মাতৃসন্নিধানে স্বয়ং উপস্থিত হইবেন ও নিজে উপস্থিত থাকিয়া মাতার সৎকার সাধন করিবেন। সেই সময় সমাগত দেখিয়া, শঙ্কর সত্বর বিদেশ হইতে নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে আসিয়া স্বচক্ষে দেখিলেন জননীর শারিরিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তদ্দর্শনে শঙ্কর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি যে জন্মাবধি পরম মাতৃভক্ত। এমন মাতৃভক্ত সন্তানের প্রাণ, মাতার বিষম অসুস্থতা

দেখিয়া, কিরূপে স্থির হইয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়া রহিতে পারে? তাঁহার মাতৃভক্তির ইহা নূতন নিদর্শন বা পরিচয় নহে। শঙ্করের বাল্যাবস্থায় একবার তাঁহার জননী দূরবর্ত্তী নদীতে স্নান ও তপস্যার জন্য গমন করেন। স্নান সমাধা করিয়া তিনি একান্ত মনে তথায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অনেকক্ষণ তপস্যা করিতে করিতে রৌদ্র তাপে তিনি নিতান্ত ক্লিষ্ট ও অবশেষে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। মাতার এই অবস্থা শুনিয়া বালক শঙ্কর অতি ব্যাকুল প্রাণে দৌড়াইয়া নদীতীরে মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। রোদন করিতে করিতে মাতার সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। পুত্রের সেবা ও যত্নে জননী চৈতন্য লাভ করিয়া উত্থিত হইলেন। জননীবৎসল পুত্র মাতার সংজ্ঞালাভ দর্শন করিয়া মহা আনন্দিত হইলেন ও মাতার হস্তধারণ করিয়া গৃহে আনয়ন করিলেন। জননী গৃহে আসিয়া কহিলেন,—"বৎস, আমাদের গৃহ হইতে নদী বহু দূরে অবস্থিত। অতদূরে গমন করিয়া নদীজলে স্নান পূজাদি সমাধা করিতে আমার নিজের ও গ্রামের সকল অধিবাসীর বড়ই কষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার প্রতিবিধানের উপায়ই বা আর কি হইতে পারে?"

মাতৃভক্ত পুত্র মাতার কথা শুনিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহারই সাধনার ফলে দূরবর্ত্তী নদী অগ্রসর হইয়া গ্রামের অতি নিকটে আসিয়া অবস্থিত হয়।

শঙ্কর এমনই মাতৃভক্ত ছিলেন যে মাতার জন্য তিনি স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। যাহা

হউক শঙ্কর জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শোচনীয় শারিরিক দশা দর্শনে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। মাতা বহুদিন পরে পুত্রের বদন সন্দর্শন করিয়া, সেই জীর্ণ শীর্ণ-অবস্থায় অতিশয় উৎফুল্ল হইলেন। পুত্রকে নিকটে বসাইয়া গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন-প্রান্তে পুলক-অশ্রু দরবিগলিত ধারে ঝরিতে লাগিল। শঙ্কর মাতাকে প্রবোধ-বাক্যে শান্ত করিলেন। মাতা ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কম্পিত-কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—"বৎস শঙ্কর, আমার তো শেষ কাল সমুপস্থিত হইয়াছে। আমার শরীর নিতান্ত জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। দেহ এতই দুর্ব্বল হইয়াছে যে সামান্য কারণে সঞ্চালিত হইলেই দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কম্পিত হইতে থাকে। শরীরের ভার বহন নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। চক্ষে দেখিতে ও কর্ণে শুনিতে ভ্রমপ্রমাদ পাইলাম। এমন অবস্থায় আর আমি এ দেহভার বহন করিতে ইচ্ছা করি না। তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র। এখন তুমি আমার উপযুক্ত গতি বিধান কর। আর আমি ক্লেশকর সংসারে থাকিয়া বিষম যন্ত্রণাপ্রদ দৈহিক দুর্দ্দশা সহ্য করিতে পারি না।" জননীর কথা শুনিয়া শঙ্কর, প্রাণ মন সংযত করিয়া, শিবের আরাধনায় নিরত হইলেন। তাঁহার আরাধনায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া মহাদেব শঙ্কর-জননীকে শিবলোকে আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। মহেশ্বরের আদেশ অনুসারে প্রমথগণ আসিয়া শঙ্করের জননীকে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইল। প্রমথগণের ভীতিজনক মূর্ত্তি ও ভাব নিরীক্ষণ করিয়া, শঙ্করের জননী ভয়ে বিহ্বলা হইয়া উঠিলেন

এবং পুত্রকে কহিলেন,—"আমার শিবলোকে যাইবার ইচ্ছা নাই। আমি বিষ্ণুলোকে যাইতে ইচ্ছা করি। আমি সেই শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম-ধারী নারায়ণের সন্নিধানে রহিয়া অনন্তকাল তাঁহারই পূজা, তাঁহারই অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করি। অতএব যাহাতে আমার বিষ্ণুলোকে যাইবার সংগতি ঘটে, যদি তাহার কোন উপায় বিধান করিতে পার তবেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। জননীর কথা শুনিয়া মাতৃভক্ত পুত্র তখন একমনে নারায়ণের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শঙ্করের পূজা প্রার্থনায় নারায়ণ পরিতুষ্ট হইলেন এবং অচিরাৎ শঙ্করের জননীকে বিষ্ণুলোকে আনয়ন করিবার জন্য বিষ্ণুদূত প্রেরণ করিলেন। বিষ্ণুদূত আসিয়া শঙ্কর জননীকে বিষ্ণুলোকে আনয়ন করিল। শঙ্কর, জননীর সংকার করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু স্বমত অদ্বৈতবাদ সর্ব্বত্র প্রচারের জন্য অতঃপর তিনি দেহ মন সমর্পণ করিলেন। বিবিধ ভ্রান্তমত, মত খণ্ডন ও প্রতিপক্ষ পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিয়া, তাহাদিগকে স্বীয় ধর্ম্মে ও স্বীয় মতে আনয়নের জন্য সমুৎসুক হইলেন।

শঙ্করাচার্য্য স্বীয় মত প্রচারের জন্য, বহুস্থানে বহু ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে ও ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিগণকে যে পরাজিত করেন, তাহারই নাম শঙ্কর-দিগ্বিজয়। এই দিগ্বিজয় জন্য তিনি যে সকল প্রধান প্রধান স্থানে গমন করেন তথাকার পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিয়া তথায় নিজমত দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা কল্পে এক এক বিদ্যামন্দির বা মঠ

সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সে সকল মঠের মধ্যে চারিটি সর্ব্বপ্রধান ও অতি বিখ্যাত। পরে তাহাদের যথাযথ বিবরণ বিবৃত হইবে।

শঙ্করাচার্য্য যৎকালে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন তখন তিনি কতিপয় নির্ব্বাচিত শিষ্য নিজ সঙ্গে লইয়াছিলেন। এই নির্ব্বাচিত শিষ্য-গণের মধ্যে পদ্মপাদ হস্তামলক, সমিৎপানি, জ্ঞানকন্দ বিষ্ণুগুপ্ত, শুদ্ধকীর্ত্তি, ভানুমরিচী কৃষ্ণ দর্শন, বুদ্ধি বিরিঞ্চি, পাদশুদ্ধান্ত, আনন্দ গিরি প্রভৃতি তাঁহার পরম প্রিয় ও প্রধান শিষ্য ছিলেন। এই শিষ্যগণ পরম জ্ঞানী ও পণ্ডিত। এই সকল শিষ্যবর্গ ব্যতীত, বীর্য্যবান রাজা সুধন্বা স্বয়ং বহু অনুচর সহ তাঁহার অনুগমন করিয়া-ছিলেন। রাজা সুধন্বা প্রথম অবস্থায় নাস্তিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। পরে শঙ্কর কর্ত্তৃক বৌদ্ধগণ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তর্ক ও আলোচনায় পরাভূত হইলে, তিনি হিন্দুমতাবলম্বী হইয়া, শঙ্কর-পন্থার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের সৎগুণে ও দৈব-শক্তিতে তাঁহার এতই বিশ্বাস ও ভক্তি জন্মিয়াছিল, যে তিনি দিকবিজয়ের উদ্দেশে যে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন, রাজাও উপযুক্ত রক্ষীবর্গ লইয়া সেই সেই স্থানে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন। রাজা সুধন্বা শঙ্করা-চার্য্যকে পরম গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। পাছে কোন স্থানে তাঁহার কোনরূপ বিপদ ঘটে এই আশঙ্কায় রাজা বহু সৈন্য সামন্ত সহ আচার্য্যের অনুগমন করিলেন।

কাশীধাম বহুকাল হইতে পরাবিদ্যা, তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য সংসারে সুবিখ্যাত হইয়াছিল। ভারতভূমিতে প্রাচীনকালে যত উচ্চবিদ্যা বা বিশিষ্ট ধর্ম্মমত প্রখ্যাত হইয়াছে,

কাশীধাম সে সকলেরই আদিম ভিত্তিক্ষেত্র ও কেন্দ্রভূমি স্বরূপ। বিশেষ বিশেষ বিদ্যা বা ধর্ম্মমত প্রচারকগণ সর্ব্বাগ্রে প্রায় এইখানে প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইতেন। শঙ্কর কাশীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন এই পরম ধর্ম্মক্ষেত্রে বহু উপধর্ম্ম ও দুষ্টধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এমন কি বিশুদ্ধ শৈব ধর্ম্মও নিতান্ত কলুষিত ও অবনত হইয়া পড়িয়াছে। তান্ত্রিক ধর্ম্মেও কতকগুলি ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সেইরূপ কলঙ্কিত ও পতিত হইয়া ভ্রষ্টাচারের আশ্রয় স্থল হইয়াছিল। এই সকল কদাচারী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ধর্ম্মের নামে নানারূপ কুক্রিয়াসক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মদ্য মাংস মৈথুনাদি কদাচার তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও এখানে তাহাদের নেতৃত্ব করিয়া দুষ্ট বাসনার তৃপ্তি সাধন করিতেছিল। শঙ্কর তাহাদিগকে লইয়া, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক ও আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া তাহাদিগের মধ্যে অনেককে স্বীয় মতে আনয়ন করিলেন। দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই ভারতের সর্ব্বত্র শঙ্করাচার্য্যের খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার নাম শ্রবণে অনেকে তাঁহাকে দর্শন করিবার মননে, কেহ কেহ তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিবার জন্য, বিশেষ ঔৎসুক্য সহকারে তাঁহার নিকটে আগমন করিতে লাগিল। তিনি যখন যেখানে পদার্পণ করিতেন সেই স্থানের কি বড় কি ছোট সকল লোকই সাগ্রহে তাঁহাকে সমাদর করিতে আরম্ভ করিল। তিনি সকল স্থানেই ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী পণ্ডিত ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতাগণের

সহিত যুক্তি তর্ক করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। এইরূপে শঙ্করের সহিত তর্ক-যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বৌদ্ধ-সম্প্রদায় ও তান্ত্রিক সম্প্রদায় তাঁহার বিষম বৈরী হইয়া দাঁড়াইল। এমন কি কোন কোন স্থানে তাঁহার প্রাণনাশ করিবার ষড়যন্ত্র পর্য্যন্ত হইয়াছিল। মহামতি শঙ্কর কোন বিপদেই কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজ ধর্ম্মমত প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মহা উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন।

শঙ্কর বিজয়-কল্পে বহির্গত হইয়া, মধ্যার্জ্জুন নামক বিখ্যাত স্থানে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে ঐ স্থান তন্ত্র-সাধনার জন্য সুবিখ্যাত হইয়াছিল। বহু তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের লোক এই স্থানে সমবেত হইয়া তন্ত্রোক্ত সাধনার ছলনা করিয়া ও নানারূপ ধূর্ত্ততা ও প্রতারণা দ্বারা সাধারণ জনগণকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিত। মদ্য মাংশ ব্যবহার প্রভৃতি কুক্রিয়া ও কদাচারে আসক্ত থাকিয়া তাহারা বিশুদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম্মকে নিতান্ত কলুষিত ও কলঙ্কময় করিয়া তুলিয়াছিল। শঙ্কর তাহাদের অবস্থা ও পরম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের অধোগতি ও দুর্গতি দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। এই স্থানে ধর্ম্মের অবস্থা ও ধর্ম্মনেতাগণের আচার ব্যবহার দেখিয়া শঙ্কর বুঝিলেন যে কেবল মৌখিক তর্ক যুক্তি বা আন্দোলন আলোচনা দ্বারা তিনি কোনরূপ ধর্ম্মসংস্কার সাধন বা তথাকার বদ্ধমূল ধারণার পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবেন না। এই চিন্তায় আকুল হইয়া তিনি প্রকৃত উপায় নির্দ্ধারণের জন্য, একান্ত মনে আশুতোষের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই অবস্থায় একদিন

তিনি, তথাকার শিব-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ও ভক্তিভরে মন্দির মধ্যস্থ মধ্যার্জ্জুন নামক শিবমূর্ত্তির উপাসনা করিতে লাগিলেন। মহাদেবের প্রসন্নতা স্বীয় হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া জানিলেন যে তিনি এখন স্থানীয় তান্ত্রিক সম্প্রদায়কে পরাজিত করিয়া স্বীয় মতে আনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন। এই বুঝিয়া তিনি তাহাদিগকে নিজ সান্নিধানে, ধর্ম্ম আলোচনার জন্য আনয়ন করিলেন। তাহারা সকলে উপস্থিত হইলে বহু সমাগত লোকের সম্মুখে বিচার বিতর্ক আরম্ভ হইল। তখন শঙ্কর আবার মধ্যার্জ্জুন নামক শিবমূর্ত্তির মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিলেন। শঙ্কর দেখিলেন যে দশমহাবিদ্যা রূপে মহাদেবী মধ্যার্জ্জুন নামক শিবমূর্ত্তির উপাসনা করিতেছেন। তদ্দর্শনে শঙ্করের হৃদয় ভক্তিভরে উচ্ছ্বলিত হইল। তিনি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে শিব সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, আপনি দেবাদিদেব মহাদেব, আপনি বিশ্বপতি। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আপনারই প্রকটিত বাহ্যমূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আপনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান। আপনার অবিদিত জগতে কি আছে? আমি কায়মনোবাক্যে আপনাকে উপসনা করিতেছি—প্রাণের সহিত প্রার্থনা করিতেছি। আপনি পরম করুণার আধার। যে ভক্তিভরে একান্ত প্রাণে আপনার নিকট যাহা প্রার্থনা করে, সে আপনার দয়ায় তাহাই অনায়াসে লাভ করিয়া থাকে। আমি অতি কাতরে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে দয়া করিয়া বলুন কোন তত্ত্ব প্রকৃত সত্য? দ্বৈত ভাব সত্য কি

অদ্বৈত ভাব সত্য ?” শঙ্করের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী তিনবার উচ্চারিত হইল—অদ্বৈত মতই সত্য। এই অদ্ভুত দৈববাণী শ্রবণ করিয়া নিকটস্থ সমুদয় লোক চমৎকৃত হইল। তখন বিপক্ষ সম্প্রদায় স্তম্ভিত হইয়া নীরবে রহিল। তাহারা সকলে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল আচার্য্য শঙ্কর সাধারণ মনুষ্য নহেন। তিনি নিশ্চয়ই অসাধারণ মহাপুরুষ। তাহারা আর কোন কথাই কহিতে পারিলনা। একটি মাত্র বাক্য প্রয়োগ না করিয়া শঙ্করের কথা শিরোধার্য্য করিয়া গ্রহণ করিল। অনেকেই তাঁহার পরম ভক্ত শিষ্য হইয়া আপনাদের পূর্ব্ব অনুষ্ঠিত ভ্রান্ত আচার ব্যবহার উপাসনা পদ্ধতি পরিত্যাগ করিল ও শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতমত অবলম্বন করিয়া তাঁহারই নির্দ্ধারিত পবিত্রপন্থায় পরিচালিত হইতে লাগিল।

অতঃপর আচার্য্য দেব ঐ প্রদেশস্থ অন্য কয়প্রধান ও প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সম্প্রদায় মহাশক্তির উপাসক, কোন সম্প্রদায় সরস্বতীর উপাসক, কোন সম্প্রদায় বামাচারী ; ইহারা অনেকেই মদ্য ও মাংসাদি সেবায় অত্যন্ত আসক্ত ছিল। তাহাদের সহিত শঙ্করের, ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে, ঘোর বিচার-বিতর্ক আরম্ভ হইল। বিচার তর্কে তাহাদের যুক্তি-জাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া শঙ্কর তাহাদিগকে শাস্ত্রের নির্দ্ধারিত বচন কহিতে লাগিলেন। পরিশেষে মনুসংহিতায় উল্লিখিত বিখ্যাত এই শ্লোকটি কহিলেন ;—

"যস্য কায়গতং ব্রহ্ম মদ্যেন প্লাবতে সকৃৎ।
তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ স গচ্ছতি॥"

অর্থাৎ বিষসংযুক্ত বাণ দ্বারা নিহত মৃগমাংসকে কলঞ্জ কহে। যাহারা সেই কলঞ্জ ভক্ষণ করে ও সুরা পান করিয়া থাকে তাহাদের ব্রাহ্মণ্য বিলুপ্ত হয়। অতএব তোমরা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ। এখন সেই সকল কদাচার পরিত্যাগ করিয়া পাতিত্য হইতে উদ্ধার লাভ কর। শঙ্করের উপদেশ বাক্যে ও যুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ বিচারে তাহাদের ভ্রম ও মূঢ়তা-অন্ধকার বিদূরিত হইল। তখন তাহারা যথাবিধি অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শঙ্করের বৈধ-পন্থায় চলিতে আরম্ভ করিল।

তৎপরে শঙ্কর যেস্থানে উপস্থিত হইলেন তথায় সুবিখ্যাত তুলা ভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানে বহু তান্ত্রিক বামাচার মত অবলম্বন করিয়া, মদ্যমাংসাদি সেবন দ্বারা অপধর্ম্মের সাধনায় প্রবৃত্ত ছিল। তথায় সেই সকল তন্ত্র-পন্থীর সহিত শঙ্করের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক আরম্ভ হইল। তাহারা নিজ নিজ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া শঙ্করের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা বুঝাইতে চাহিল প্রথম অবস্থায় প্রবৃত্তি মার্গের অনুসরণে কর্ম্ম বাসনা ক্ষয় করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক। তদ্ভিন্ন সামান্য মানবের পক্ষে আত্মোদ্ধারের উপায়ন্তর নাই। শঙ্কর বুঝাইতে লাগিলেন সেইরূপ কুপন্থার অনুসরণে ও কদাচারে মানবের ধর্ম্মপন্থার উৎকর্ষ সাধিত কখনই হইতে পারে না। তাহাতে অধোগতি অনিবার্য্য। সেরূপ

প্রবৃত্তি মার্গের সাধনায় মানব ক্রমে পশুত্বে পরিণত হইয়া থাকে। এইরূপ উপদেশ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, শঙ্কর তাহাদের যুক্তি জাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। শঙ্করের উপদেশ বাক্যে ও তাঁহার মাহাত্ম্য দর্শনে তাহাদের ভ্রম ও মোহ বিদূরিত হইল। তাহারা অতি বিশদ ভাবে বুঝিতে পারিল যে শঙ্করের পন্থাই অতি পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ পন্থা, সেই পন্থা অবলম্বন ব্যতীত ধর্ম্ম-জগতে উন্নতি লাভের উপায়ন্তর নাই। তখন তাহারা আনন্দিতমনে আপনাদের পূর্ব্ব আচরিত ভ্রান্ত মত ও ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল ও তাঁহার বিশুদ্ধ অদ্বৈত বাদ গ্রহণ করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইল। এই তুলাভবানীর তান্ত্রিক সম্প্রদায় তৎকালে অতীব বিখ্যাত ও প্রভাব-সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদিগকে পরাজিত ও স্বীয় মতে আনয়ন করিয়া, শঙ্কর সর্ব্বত্র ধর্ম্ম-বিচারে অদ্বিতীয় বিজয়ী বলিয়া বিখ্যাত ও বিঘোষিত হইলেন।

শঙ্কর একদিকে যেমন নাস্তিক শূন্যবাদী বৌদ্ধগণকে ও জৈন দলকে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ বহু দ্বৈতবাদী আস্তিক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কেও ধর্ম্ম-বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বীয় মতে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে শাক্ত ও শৈব মতাবলম্বী বহু ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভারতে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কাপালিক, ভৈরব, ক্ষপণক প্রভৃতি দল সমধিক প্রভাব সম্পন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নাস্তিক বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহারাও আচার্য্য

শঙ্কর কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল। অবশেষে তাহাদের অনেকেই তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া অদ্বৈত মতাবলম্বী হয়।

শঙ্কর দাক্ষিণাত্যে বিজয়লাভ করিতে করিতে যখন সেতুবন্ধ রামেশ্বর অভিমুখে গমন করেন, তখন দ্রাবিড়, পাণ্ড্য ও চোল প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানে উপস্থিত হন। তথায় বহু পণ্ডিত বসবাস করিতেন। তাঁহারা অনেকেই দ্বৈতবাদী ও বিভিন্ন ধর্ম্ম মতাবলম্বী ছিলেন। এই সকল স্থানে আসিয়া শঙ্কর তথাকার পণ্ডিতবর্গকে সাদরে আহ্বান করিলেন ও তাহাদের সহিত ধর্ম্ম বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রায় সকলেই শৈব মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম অনুষ্ঠান, বাহ্য চিহ্নাদি ধারণেই বিশেষরূপে প্রকটিত হইত। শৈব-ধর্ম্ম অনুসারে বহু প্রকারের ত্রিপুণ্ড্রক ও অপর ত্রিশূলাদি চিহ্ন ধারণ ঐ সকল শৈবগণের ধর্ম্ম সাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল। ধর্ম্ম বিচারে এই সকল কৈশব পণ্ডিতগণ সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন। তাঁহারা শঙ্করকে মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। শঙ্কর তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন কেবল বাহ্য-আড়ম্বরে— অথবা কেবল মাত্র—বাহ্য চিহ্ন ধারণ করিলে—ধর্ম্মঅনুষ্ঠান বা ধর্ম্ম সাধন হয় না। চিত্তশুদ্ধি, সংযম ও আত্মজ্ঞান প্রকৃত ধর্ম্মলাভের যথার্থ সোপান। এই বলিয়া তাহাদিগকে অদ্বৈত তত্ত্ব বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহারাও শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত বিশুদ্ধাদ্বৈত-পন্থায় পরিচালিত হইতে লাগিলেন।

রামেশ্বর হইতে শঙ্কর অনন্তশয্যা নামক বৈষ্ণব-প্রধান স্থানে গমন

ষ্করেন। এই স্থানে বহু সম্প্রদায়ের বহু বৈষ্ণব বাস করিতেন; তাঁহাদের মধ্যে ভক্ত, ভাগবত, বৈশানশ, বৈষ্ণব, কর্ম্মহীন, পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি কয়টি সম্প্রদায় অতিশয় প্রবল ও প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন। শঙ্কর তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম-বিচারে আহ্বান করিলেন ও প্রত্যেক সম্প্রদায়কে আপন আপন ধর্ম্মমত পরিব্যক্ত করিতে কহিলেন। তাঁহারা আপন আপন ধর্ম্মমত প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদেরও অঙ্গে তিলক চক্রাদি নানারূপ বাহ্য চিহ্ন প্রকটিত ছিল। শঙ্কর যুক্তি ও বিচার দ্বারা তাহাদের ধর্ম্ম-মত বিশেষ যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিলেন। তৎপরে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"হে বৈষ্ণবগণ, তোমরা জানিও বাহ্যচিহ্ন ধারণ করিলে ধর্ম্ম-সাধনা হয় না। বাহ্য আড়ম্বর বরং ধর্ম্মের প্রতিকূল। প্রকৃত ধর্ম্মসাধনা বিনাআড়ম্বরে নীরবে সংসিদ্ধ হইয়া থাকে। তোমরা মনে কর, বাহ্যচিহ্ন ধারণ করিয়া, বাহ্য আড়ম্বর করিতে পারিলেই ধর্ম্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। এরূপ ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। প্রকৃত ধর্ম্মসাধনা করিতে হইলে, নিষ্কাম ভাবে ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। বাসনার বশে কর্ম্ম করিলে ধর্ম্মের প্রকৃত পথ কখনই পাওয়া যায় না। বাসনায় অভিভূত হইলে চিত্ত মলিন হইয়া যায়। তাহাতে বন্ধনের উপর বন্ধন ঘটিয়া থাকে। একেই দুর্ব্বল মানব, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি আদি বহুবিধ বৃত্তির বন্ধনে নিবদ্ধ। সেই সকল বৃত্তির বন্ধন হইতেই বাসনা বিকট হইয়া উঠে। বিকট বাসনা চিত্ত মালিন্যের ও বুদ্ধি বিকারের প্রধান হেতু। চিত্ত-শুদ্ধি ও বুদ্ধি-সংস্কার গুঢ় ধর্ম্মসাধনার সর্ব্ব-

শ্রেষ্ঠ উপায় ও উপাদান। বাসনা বিকট হইলে, চিত্ত-শুদ্ধি ও বুদ্ধি সংস্কার সাধিত হইতে পারেনা। তাহা হইলে কি উপায়ে মুক্তিপ্রদ ধর্ম্ম-সাধনা হইতে পারে? অতএব যাহাতে বাসনা ত্যাগ করিতে পার—বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পার—তৎপক্ষে যত্নবান হও। নিষ্কাম ভাবে সৎ-গুরুর আশ্রয় লাভ করিবার চেষ্টা কর। অদ্বৈত মতাবলম্বী গুরুই উপযুক্ত সৎগুরু। নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়া ব্যাকুল প্রাণে অনুসন্ধান করিলে সৎগুরুর আশ্রয় লাভ করিতে পারিবে। তিনি তোমাদিগকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিবেন। তিনি জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত করিবেন। তত্ত্বদর্শী গুরুই ভবার্ণবে তরিবার একমাত্র তরণী-স্বরূপ। একান্ত প্রাণে ভক্তিভরে তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনিই উদ্ধারের প্রকৃত পন্থা দেখাইয়া দিবেন। তাঁহার তত্ত্ব উপদেশে তোমাদের মায়া মোহ ঘুচিয়া যাইবে। তোমার ভ্রম বিদূরিত হইবে। তখন 'তুমি কে' তাহা বুঝিতে পারিবে। তখন তুমি সংসারের সকল প্রকার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে। 'আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞান, তখন তোমার সুস্পষ্টভাবে উদয় হইবে। বাস্তবিক পক্ষে 'আমিই ব্রহ্ম' "ব্রহ্ম হইতে আমি ভিন্ন নহি'—এই জ্ঞানই প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞান। এই জ্ঞান যতক্ষণ না জন্মাইবে ততক্ষণ তুমি মুক্তি লাভ করিতে পারিবেনা—ততক্ষণ কিছুতেই তোমার উদ্ধার সাধিত হইবেনা। বাস্তবিক যতক্ষণ মায়া, যতকাল মায়া জনিত ভ্রম থাকে ততকাল জীব আপনাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক মনে করিয়া বিষমরূপে আবদ্ধ হইয়া থাকে। 'আমি ব্রহ্ম' বলিয়া

বুঝিলে—উপলব্ধি করিলে, জীবাত্মার সকল বন্ধন সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। তখন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম হইয়া মুক্ত জীব পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। অতএব হে বৈষ্ণবগণ, তোমরা বাহ্য আড়ম্বর পরিত্যাগ কর। বাহ্য চিহ্ন ধারণ করিও না। তত্ত্বদর্শী গুরুর আশ্রয় লইয়া 'আত্মতত্ত্ব' অধিগত করিবার চেষ্টা কর।" আচার্য্য শঙ্করের অপূর্ব্ব ধর্ম্মবিচারে, তাঁহার অখণ্ডনীয় যুক্তি-তর্কে, তাহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ভ্রমাত্মক ধারণা পূর্ব্বেই বিদূরিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার উপদেশাবলি শ্রবণ করিয়া, সকল বৈষ্ণব তাঁহার পদে প্রণত হইল। তাহারা অতঃপর শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইল। তৎপরে সুব্রহ্মণ্য নামক স্থানে গমন করিয়া শঙ্কর বহু অদ্বৈতবাদী ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে স্বীয় শিষ্যত্বে ও স্বীয় মতে আনয়ন করিয়াছিলেন।

কাশী অবস্থান কালে আচার্য্য দেখিলেন যে সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম, আর্য্যস্থান হইতে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম করিয়াছে। পরম ধর্ম্মক্ষেত্র কাশী ধামে বৈদিক ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে বিবিধ অপধর্ম্মের প্রভাব পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। তথায় কর্ম্মবাদী, চন্দ্রোপাসক, গ্রহোপাসক, গরুড়োপাসক, ত্রিপুরসেবী প্রভৃতি নানা কদাচারী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। তাহারা বিকট ধর্ম্মমতের অনুষ্ঠান ও প্রচার করিয়া, পবিত্র বৈদিক সনাতন ধর্ম্মকে বিলুপ্ত করিবার উপক্রম করিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে ধর্ম্মবিচারে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত ও নিষ্প্রভ করিয়া বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্ম কিরূপে

পুন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এবং বেদের যাহা চরম কথা—পরম সিদ্ধান্ত বৈদান্তিক সারতত্ত্ব অদ্বৈতবাদ—কি উপায়ে প্রচারিত হইতে পারে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি শিষ্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ও নিজে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে যেসকল অপধর্ম্ম ভারতে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহাদের ধ্বংস সাধন ও বেদ-ধর্ম্মপ্রচারের জন্য স্থানে স্থানে ধর্ম্ম-মঠ সংস্থাপন তৎপক্ষে প্রধান প্রয়োজন ও প্রকৃষ্ট উপায়। তজ্জন্য তিনি ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া সকল অপধর্ম্মের সম্প্রদায়কে পরাজয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে কুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিপোষক সম্প্রদায়কে পরাজয় করিতে করিতে ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ও ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চতুর্দ্দিকে চারি প্রধান মঠ সংস্থাপন করিলেন। সর্ব্বোত্তর প্রান্ত ভ্রমণকালে কুরুক্ষেত্র হইয়া তিনি বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তথায় অথর্ব্ববেদ প্রচার করিবার সঙ্কল্প করিয়া এক শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমঠ সংস্থাপন করিলেন। উক্ত মঠের নাম যোষি মঠ। তথায় প্রধান শিষ্য সনন্দনকে মঠের অধ্যক্ষ করিয়া বৈদিক ধর্ম্মপ্রচারের ব্যবস্থা করিলেন।

অতঃপর তথা হইতে শঙ্কর বহির্গত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে বহু পণ্ডিত ও ধর্ম্মসম্প্রদায়কে জয় করিতে করিতে মধ্যার্জ্জুনে শৃঙ্গগিরি নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই স্থান অতি মনোরম। উহা তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে অবস্থিত। এইখানে আসিয়া আচার্য্যদেব তথাকার নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শনে পরম আনন্দিত

হইলেন। কিছুদিন তথায় রহিয়া, তথাকার পণ্ডিত ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নেতাগণের সহিত ধর্ম্মের বিচার ও ধর্ম্ম আলোচনা করিতে লাগিলেন। স্থানীয় ছোট বড় সকল শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের লোক তাঁহার সূক্ষ্ম বিচার-শক্তি, অদ্ভুত বুদ্ধি-কৌশল, ও অপূর্ব্ব যুক্তি তর্ক উপলব্ধি করিয়া বিমুগ্ধ হইল। অনেকেই ভক্তিভরে তাঁহার অনুগামী হইয়া ধর্ম্ম আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। কিছুকাল পূর্ব্বে এই স্থান অসৎ ধর্ম্মের ও নাস্তিকতার আলয় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। আচার্য্য শঙ্করের আগমনে ও তাঁহার ধর্ম্ম-আন্দোলনে, উক্ত প্রদেশের ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিল। সেই ধর্ম্মভাব সন্দর্শন করিয়া আচার্য্যদেব পরম উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হইলেন। কিছুদিন তথায় অতিবাহিত করিয়া সেখানে যজুর্ব্বেদ প্রচারের জন্য এক প্রধান ধর্ম্মমঠ সংস্থাপন করিলেন। এই অতি শ্রেষ্ঠ মঠের নাম বিদ্যামঠ। সুরেশ্বর ও বিদ্যাধর নামক শঙ্করের দুই প্রধান শিষ্য এই মঠের অধ্যক্ষ-নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা গুরুদেবের অভিপ্রায় ও আদেশ অনুসারে এই বিদ্যামঠে অবস্থান করিয়া সনাতন বৈদিক ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। বহু পণ্ডিত শাস্ত্র-পারদর্শী ব্যক্তি এই মঠে যোগদান করিয়া এক প্রবল সঙ্ঘ সংস্থাপন করিলেন। এখানকার শিষ্যবর্গের সঙ্ঘের নাম সুবিখ্যাত ভারতী সম্প্রদায়।

এই মঠের নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী বহু স্থানে চতুর্দ্দিকে বহু বৌদ্ধ অবস্থিতি করিত। ঐ সকল বৌদ্ধ সঙ্ঘের নাম বায়ু বরুণ, উদক, ভূমি ইত্যাদি। শঙ্কর, বিদ্যামঠ হইতে বহির্গত হইয়া ঐ

সকল নাস্তিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। তাহারা, অনেকেই শঙ্করের উপদেশে আপনাদের ধর্ম্মমতের ভ্রম বুঝিতে পারিল। তাহাদের অনেকেই আপনাদের ভ্রান্তমত পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ শঙ্কর ধর্ম্মমত গ্রহণ করিল।

শঙ্কর আর্য্যাবর্ত্তের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। সেই পবিত্র ক্ষেত্রে ধর্ম্মমঠ সংস্থাপনের জন্য তিনি নিতান্ত উৎসুক হইলেন ও সঙ্গী শিষ্যগণকে তজ্জন্য উদ্যোগী হইতে আদেশ করিলেন। শিষ্যগণ উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। অল্পদিনেই আচার্য্য দেবের অভীষ্ট-সিদ্ধ হইল। এইস্থানে যে ধর্ম্মমঠ সংস্থাপিত হইল, তাহারই নাম বিখ্যাত সারদা মঠ। এই মঠ হইতে কোন বেদের অনুশীলন ও প্রচার হইবে—এই কথা লইয়া শিষ্যবর্গের মধ্যে আন্দোলন.আলোচনা চলিতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন শিষ্য ভিন্ন ভিন্ন বেদের প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। আচার্য্য দেব মনে করিলেন দ্বারকা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা ভূমি। তিনি নিজ মুখে পরিব্যক্ত করিয়াছেন—'বেদের মধ্যে আমি সাম বেদ' "বেদানাং সাম বেদোস্মি।" এমন মহাপবিত্র তীর্থক্ষেত্রে যে ধর্ম্মমঠ সংস্থাপিত হইবে, তথায় শ্রেষ্ঠ সামবেদের আলোচনা ও প্রচার হওয়াই বিধেয়। এই মনে স্থির করিয়া সামবেদ-পারদর্শী পরম পণ্ডিত শিষ্য বিশ্বরূপকে এই মঠের অধ্যক্ষ ও পরিচালক পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এখান হইতে আচার্য্য কুবলয়পুর ও ভবানীনগরে গমন করেন। গমন পথে হিরণ্যগর্ভ আদিত্য গানপত্য ও অগ্নিহোত্র প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী

সম্প্রদায়ের অধিনেতা পণ্ডিতগণকে ধর্ম্মবিচারের জন্য আহ্বান করেন। তাহারা আসিয়া শঙ্করের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার ও তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইল। শঙ্কর তন্ন তন্ন করিয়া সেই সকল দ্বৈতবাদীগণের ধর্ম্মমত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন ও বিশদরূপে তাহাদিগের ভ্রম বুঝাইয়া দিলেন। তাহারা অনেকেই তাঁহার যুক্তি উপদেশের সত্যতা সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই শঙ্করের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অদ্বৈতবাদের সাধনায় প্রবৃত্ত হইল।

শঙ্কর অতঃপর অহোবন নামক স্থানে আগমন করেন। তথায় নৃসিংহ-উপাসক এক দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় ছিল। শঙ্কর এইখানে সেই দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের সহিত ধর্ম্মবিচারে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের মধ্যে স্বীয় ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এখান হইতে কাঞ্চী প্রদেশে আগমন করেন। তৎকালে হিমশীতল নামক এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ঐ প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। নরপতি হিমশীতল স্বয়ং বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন ও তাঁহার আশ্রয়ে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত শ্রমণ বসবাস করিত। কাঞ্চীপ্রদেশে তখন বৌদ্ধ ধর্ম্ম এমনই প্রভাব সম্পন্ন হইয়াছিল যে সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম তথায় বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছিল। শঙ্কর এখানে উপস্থিত হইয়া বৌদ্ধগণকে ধর্ম্মবিচারের জন্য আহ্বান করিলেন। এখানকার বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিষম বিচার ও বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। তাহারা শূন্য বাদের ও নির্ব্বাণ তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য বিশেষ তর্ক ও যুক্তি জালের

অবতারণা করিল। শঙ্কর যুক্তি ও সূক্ষ্ম তর্কের সুকৌশলে তাহাদের নাস্তিক ভাবাপন্ন শূন্য বাদ ও নির্ব্বাণ বাদ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন ও বিধ্বস্ত করিলেন। এবং তাহাদিগকে একেবারে পরাভূত করিয়া স্বীয় অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া রাজা হিমশীতল স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি শঙ্করের অনুবর্ত্তী হইলে, তথাকার বহু প্রধান প্রধান বৌদ্ধ শঙ্করের মত অবলম্বন করিল।

কাঞ্চীপ্রদেশে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া আচার্য্য দেব এখানে দুই প্রধান হিন্দু সম্প্রদায়ের দুই কেন্দ্রভূমি প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহার এক কেন্দ্রের নাম 'বিষ্ণু কাঞ্চী' ও অপর কেন্দ্রের নাম 'শিব কাঞ্চী' বলিয়া অভিহিত করিলেন। এই দুই কেন্দ্র আজিও বৈষ্ণব ও শৈব উভয় সম্প্রদায়ের প্রধান ক্ষেত্র বলিয়া প্রখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

পরিশেষে আচার্য্য দেব হিন্দুর বিখ্যাত তীর্থ কামরূপে গমন করিলেন। তৎকালে কামরূপে সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ এক পরম পণ্ডিত ব্যক্তি বাস করিতেছিলেন। তাঁহার নাম অভিনব গুপ্ত। কামরূপে শঙ্কর, পণ্ডিত প্রবর অভিনব গুপ্তের সহিত ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। বিচারে অভিনব গুপ্ত সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। অভিনব গুপ্ত পণ্ডিত হইলেও অতিশয় কুমতি ছিলেন। অভিচার বিদ্যায়ও তাঁহার অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা ছিল। তিনি আচার্য্য দেবের সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া আপনাকে বিশেষ

অপমানিত মনে করিলেন। কি উপায়ে সে অপমানের প্রতিশোধ লইবেন তাহাই অনুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে অতি হীন ঘৃণিত উপায়ে অভিচার প্রক্রিয়া বলে আচার্য্য দেবের শারিরিক অনিষ্টসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শঙ্করের প্রতি 'অভিচার ক্রিয়াই প্রয়োগ করিলেন। অচিরে অভিচার ক্রিয়ার ফল ফলিল। আচার্য্য দেব বিষম ভগন্দর রোগে প্রপীড়িত হইয়া শয্যাগত হইলেন। তখন তাঁহার নিকটে এক বিশেষ মন্ত্রজ্ঞ ও মন্ত্রকুশল শিষ্য ছিলেন। সেই শিষ্য সিদ্ধ মন্ত্র জপ ও অনুষ্টানাদি দ্বারা গুরুদেবের ভগন্দর পীড়ার শান্তি বিধান করিলেন।

শঙ্কর একদিন ব্রহ্মপুত্রে অবগাহন করিয়া স্নান করিতেছিলেন। তখন আরও কয়জন সাধু ব্রহ্মপুত্রে স্নানার্থ গমন করেন। তাঁহারা পরস্পর বলিতেছিলেন যে কাশ্মীরের মঠে যে সারদা দেবী প্রতিষ্ঠা আছেন, তিনি জাগ্রতা দেবী। তাঁহাকে দর্শন করিলে মহামঙ্গল লাভ হয়। এই কথা শুনিয়া আচার্য্য শঙ্কর সেই দেবীকে দর্শন করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক ও ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। দেবী সন্দর্শন মানসে তিনি অনতিবিলম্বে কাশ্মীর যাত্রা করিলেন। কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া, যখন তিনি উন্নত শিখর ভূমিতে বিস্তা ব্রহ্মণে অধিষ্ঠিত সারদা দেবীর মন্দিরে গমন করিতেছিলেন তখন দেবীর প্রত্যাদেশ হইল,—"তুমি পরস্ত্রী সহবাস করিয়াছ। তোমার দেহ মন তজ্জন্য কলুষিত হইয়াছে। তুমি কিরূপে এই পবিত্র মন্দিরে দেবীর সকাশে আগমন করিবে?" তদুত্তরে শঙ্কর বিনীত

কণ্ঠে বলিলেন,—"দেবী, আমি এই দেহে কখন পরকামিনী সঙ্গ করি নাই। তবে কি জন্য আমার এই দেহ অপবিত্র হইবে?" এই উত্তরে দেবী বুঝিলেন শঙ্করের কথা অতি সত্য। সত্যই তিনি এ বর্ত্তমান দেহে রমণী সঙ্গ করেন নাই। তবে তিনি দেবী দর্শনে বঞ্চিত হইবেন কেন? সারদা দেবী তখন তাঁহাকে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবী দর্শনে অনুমতি প্রদান করিলেন। দেবীর আদেশ পাইয়া শঙ্কর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবীর বন্দনা করিলেন। অতঃপর স্থানে স্থানে ধর্ম্মবিচারে বিপক্ষ পণ্ডিত ও ধর্ম্মসম্প্রদায়কে পরাজিত করিয়া তিনি পরম পবিত্র বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। এইখানে আসিয়া তিনি কেদার নাথে সমাধি লাভ করেন।

শঙ্করের সমাধি হইলে, তাঁহার শিষ্যগণ নিতান্ত শোকার্ত্ত হইলেন। তাঁহারা গুরুদেবের বিরহে কাতর হইয়া কিছুকাল নীরবে অতিবাহিত করিলেন। পরে তাঁহারাই আবার বিশেষ উদ্যম সহকারে অদ্বৈতবাদ প্রচার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। তাঁহাদের প্রচার বলে ভারতের অনেক স্থলে অদ্বৈতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ফলতঃ শঙ্করের তিরোভাবে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ নিষ্প্রভ হয় নাই। কারণ একদিকে তাঁহার শিষ্যগণ যেমন উৎসাহ সহকারে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন, তেমনি শঙ্করের বহু ভাষ্য, বিশেষতঃ তৎপ্রণীত শারিরক ভাষ্য বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ প্রচারের পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। তাঁহার কৃত সমুদয় ভাষ্য ও বার্ত্তিক যে কেবল অদ্বৈতবাদ প্রচারের জন্য বিখ্যাত এমন নহে, সেগুলি এতই গভীর গবেষণা ও উচ্চ যুক্তি ও ভাবপূর্ণ যে

চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই তাহা পাঠ করিতে করিতে মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া থাকেন। শঙ্করের জীবদ্দশাতেই সে সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বহু উপনিষদের ভাষ্য প্রণয়ন করিলে, তাহা অল্পকালেই পণ্ডিত-সমাজে সমাদৃত হইয়াছিল। তি'ন সেই সময়ে কাশ্মীর যাইবার পথে পরম পণ্ডিত ও ঋষি তুল্য মহাত্মা গৌড়পাদের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মহাত্মা গৌড়ীপাদের সহিত শঙ্করের ঐভাষ্য সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয়। শঙ্কর নিজকৃত মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্য পাঠ করিয়া গৌড়ীপাদকে শুনাইলেন। গৌড়ীপাদ তাহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। শঙ্কর প্রণীত ঐ সকল ভাষ্য নাস্তিকতা দমনে যেমন উপযুক্ত, দ্বৈতবাদ নিরশনে ও আত্মজ্ঞান সংস্থাপনে তেমনি উপাদেয়।

পূর্ব্বেই অনেকস্থলে কথিত হইয়াছে আচার্য্য দেব পরম সদাশয় ও পূত চরিত্র ছিলেন। তাঁহার অন্তর্ধানে যে কেবল শিষ্যগণ বা দেশীয় আত্মীয় স্বজনগণ দুঃখিত হইয়াছিলেন এমন নহে, তিনি যে যে স্থানে গমন বা অবস্থিতি করিয়াছিলেন ও যেখানে পরিচিত হইয়াছিলেন, তথাকার সকলেই তাহার জন্য নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। তিনি যে বৌদ্ধগণের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার বা প্রপীড়নের জন্য উৎসাহ বা উত্তেজনা প্রদান করেন নাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার অন্তর্ধানে, বহু বৌদ্ধ পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ কোথাও কোথাও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। শঙ্কর কাহারও বৈরী ছিলেন না। মহাত্মা মহাপুরুষের ন্যায়

তিনি সর্ব্বভূতে অদ্বেষ্টা ও শত্রু মিত্রে সমজ্ঞানী ছিলেন। আঁধার আচ্ছন্ন ভারতগগণে, তিনি মধ্যাহ্ন-ভাস্করের ন্যায় উদিত হইয়া ছিলেন, আবার অল্পসময়ের মধ্যে সে আঁধার বিদুরিত করিয়া তিনি অস্তমিত হন।

তিনি তত্ত্বজ্ঞানের যেমন শ্রেষ্ঠ আধার ছিলেন, তেমনি সূক্ষ্ম আন্বীক্ষিকি বা তর্কবিদ্যার মহাক্ষেত্র স্বরূপ ছিলেন। সেই শক্তি বলে তিনি, সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক, বৈভাষিক ও যোগাচার প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ দার্শনিক মত বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ক্ষমতায় বৌদ্ধদিগের মত এইরূপে খণ্ডন করেন সত্য, কিন্তু তাহাদিগের প্রতি বা অন্য কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যাচারের উত্তেজনা কখনই করেন নাই, একথা আমরা বার বার মুক্ত কণ্ঠে বলিতে কুণ্ঠিত নহি। বৌদ্ধদিগের প্রতি, ভারতে এক সময়ে বিশেষ অত্যাচার উৎপীড়ন যথেষ্টই হইয়াছিল, তাহার কারণ শঙ্কর নহেন। অনেকে কুমারীল ভট্টকে তাহার হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কুমারীল মীমাংসা শাস্ত্রকার জৈমিনীর শিষ্য ছিলেন। কোন কোন মতে কুমারীলকে শঙ্করের সমসাময়িক ব্যক্তি বলিয়া, ও সেই মতে কুমারীল শঙ্করের সম্মুখে অগ্নি প্রবেশ করেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। সে যাহাই হউক কুমারীল ভট্ট যে বৌদ্ধ-নিপীড়নের হেতু, শঙ্কর নহেন একথা অনেক ঐতিহাসিক স্বীকার করেন। শঙ্করের জীবন কালে, তাঁহার সম্প্রদায় এত ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয় নাই। তাঁহার পরে তদীয় শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ হইতে নানারূপে

বহু দলের সৃষ্টি হয়। শঙ্করের শিষ্যগণের মধ্যে পদ্মপাদ, হস্তমলক, ও তোটক প্রধান ছিলেন। পদ্মপাদের দুই শিষ্য তীর্থ ও আশ্রম হইতে উক্ত নামধেয় দুই শাখা সম্প্রদায়, হস্তমলকের দুই শিষ্য হইতে বন ও অরণ্য, এবং সুরেশ্বরের তিন শিষ্য হইতে গিরি, পর্ব্বত, সাগর, আর তোটকের তিন শিষ্য হইতে সরস্বতী, ভারতী, পুরী প্রভৃতি শাখা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে।

আচার্য্যদেবের অমানুষিক ক্রিয়া।

শঙ্করের অদ্ভূত অমানুষিক শক্তি সম্বন্ধে বহু কথা অতি প্রসিদ্ধ রূপে প্রচলিত রহিয়াছে! সে কথা পূর্ব্বে বহুস্থলেই বহুবার কথিত হইয়াছে। সন্দিহান নাস্তিক অনেকে তাহা মানিতে চাহে না। সাধারণতঃ অনেকের ধারণা এই যে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়—যাহা স্থূল ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত তাহাই সত্য; তদ্ভিন্ন যাহা কিছু অতিমানুষিক, যাহা স্থূল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে তাহাতে বিশ্বাস বা আস্থাস্থাপন করা মহা ভ্রম বা কুসংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা নিতান্ত স্থূলভাবাপন্ন ভ্রান্তদর্শী মূঢ় অজ্ঞজনের ভ্রান্তি বিকার ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ দর্শন ও শ্রবণাদিস্থূল ইন্দ্রিয় শক্তি ব্যতীত মানবের জানিবার ও বুঝিবার আরও বিশেষ শক্তি আছে। সেই সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকার ফলেই মানব অপর সকল জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নতুবা পশুতে আর মানবে পার্থক্য কি? আহার বিহারাদি স্থূল ব্যাপার যেমন ইতর প্রাণীগণ সাধন অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, মানবও সেইরূপেই সে সকল স্থূল বৈষয়িক ব্যাপার অনুষ্ঠান ও সমাধান করিয়া থাকে। তাহাতে ইতর জীব হইতে মানবের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। কেবল আধ্যাত্ম শক্তির বিকাশ পরিস্ফুরণেই মানব পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি নিম্নশ্রেণীর জীব হইতে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। যে মানবে যে পরিমাণে এই আধ্যাত্মিক শক্তির পরিস্ফুরণ পরিদৃষ্ট হয়, সেই মানব সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠত্ব

লাভ করিয়া থাকে—তাহার শক্তি তদনুরূপ অতিমানুষিক হইয়া থাকে। তাহার ক্রিয়া কলাপ সতি বিধি সাধারণ স্থূল ও প্রাকৃত মানব স্থূল ইন্দ্রিয় শক্তির সাহায্যে বুঝিতে পারে না। কারণ সাধারণ মানব আধ্যাত্মিক শক্তির অনুশীলন করে না—তাহার অদ্ভূত বল, অপূর্ব্ব ফলকে সাধারণ বোধে বুঝিতে পারে না এমন কি কল্পনাও করিতে পারে না। তাই সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায় অজ্ঞ অশিক্ষিত জনের ন্যায় স্থূলভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিও আধ্যাত্মিক ও অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ও সন্দিহান হইয়া থাকে। তাহারা মহাপুরুষের অনুষ্ঠান প্রক্রিয়া উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ণ অন্ধ অসমর্থ হইয়া থাকে। সাক্ষাৎ শঙ্কর সম পুরুষশ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য্যের গতি বিধি কিরূপে সে অনুধাবন করিতে সামর্থ হইবে? তাই শঙ্কর সম্বন্ধে যে সকল অদ্ভূত কথা প্রচলিত আছে, তাহারা সে সকল কথা অসার কাল্পনিক কিম্বদন্তী বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু শক্তিমান বিশ্বাসী ব্যক্তি সে সকল কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া আত্মোৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকেন।

একদা আচার্য্য শঙ্কর শিষ্যসহ মৌনঅস্তিকা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই স্থানটি অতি পবিত্র প্রাকৃতিক শোভার পরম লীলাক্ষেত্র। দেখিলে মনে হয় যেন চিরবসন্ত মূর্ত্তিমান হইয়া তথায় বিরাজিত। নিকটে মনোহর সরোবর। সরোবরে কমল ফুল বিকসিত হইয়া মৃদু মারুত হিল্লোলে মকরন্দ সৌরভ বিতরণ করিতেছে।

মধুকরগণ গুণ গুণ রবে ঝঙ্কার ধ্বনিতে প্রস্ফুটিত কমল সমূহকে

যেন প্রেম সমাদরে সম্ভাষণ করিতেছে। অদূরে পরম সুন্দর বনরাজি মনোহর বৃক্ষ লতাদিতে পরিমণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। সে সকল বৃক্ষলতা নব নব পত্র পল্লবে ও বিবিধ ফল ফুলে বিভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সম্ভার বিতরণ করিতেছে। বন বৃক্ষ মাঝে কোকিল পাপিয়া প্রভৃতি নানাজাতীয় পক্ষী সমুহ সুমধুর গানে জীবকুলের মনপ্রাণ হরণ করিয়া অপূর্ব্ব স্বর্গ-সুধা বর্ষণ করিতেছে। এমনই সে স্থানের মনোহর শোভা যে যোগী জনও সে শোভা সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধ নেত্রে নিরীক্ষণ করিবার জন্য যেন ব্যাকুল হইয়া উঠেন। তাহা ছাড়িয়া তাঁহারাও যেন নয়নের দৃষ্টি ফিরাইয়া চক্ষুদ্বয়কে ভ্রূযুগল মধ্যে সংস্থাপন করিতে অক্ষম। এমনই সে স্থানের সৌন্দর্য্য! এতই তাহার মাধুর্য্য মনোহারিত্ব।

শঙ্কর শিষ্যগণ সহ পরমানন্দে এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রকৃতির শোভায় মুগ্ধ হইয়া তিনি হৃদয়ে ভগবৎ মহিমা অনুভব করিতেছেন। এই ভাব অনুভব করিতে করিতে তিনি তন্ময় হইলেন। ক্রমে বিভোর তন্ময় হইয়া আত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ সাধন করিয়া, জুঞ্জুন অবস্থায় পরম সমাধি সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ অদূরে রহিয়া গুরুদেবের সে অপূর্ব্বভাব দেখিয়া, বিমুগ্ধ হৃদয়ে কত ভাবের কথা ভাবিতে লাগিল। কেহ ভাবিল,—"আমাদের, গুরুদেব সত্যই সাক্ষাৎ শঙ্কর। একাধারে এমন মনোহর রূপ মাধুরী, এতো বিদ্যা বুদ্ধি, এমন গম্ভীর জ্ঞান গবেষণা কি সাধারণ মনুষ্যে সম্ভব? না—না তাহা যে নিতান্তই অসম্ভব!" কেহ মনে করিল,—"ঠাকুর যখন শিক্ষা প্রদান ছলে

বাক্যালাপ করিতে থাকেন, তখন বোধ হয় সত্যই দেব-দেব মহাদেব সংসারের পাপ তাপ হরণের জন্য ধরাতলে অবতরণ করিয়াছেন। নতুবা তাঁহার অমৃতময় কথা সমূহ যখনই শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করে, তখন মন প্রাণ আলোড়িত করিয়া হৃদয় কেন এমনভাবে উথলিয়া উঠে! তখনই মনে হয় যেন পৃথিবীর সকল জ্বালা যন্ত্রণা জন্মের মত জুড়াইয়া গিয়াছে! তাঁহার এক একটি উপদেশবাণী এক একটি অমূল্য মহারত্ন! সে রত্ন যে ভাগ্যবান একবার হৃদয়ে ধারণ করিয়াছে, সেই সংসার-সন্তাপ হইতে চিরতরে মুক্তিলাভ করিয়াছে।”

শঙ্করের পরম প্রিয় মহাভক্ত শিষ্য সনন্দন ভাবিতে ভাবিতে আত্মহারা হইয়া কহিলেন,—“অহো! কি অপূর্ব্ব ভগবৎ লীলা এই শঙ্কররূপে সাক্ষাৎ দেব দেব মহাদেব অবতীর্ণ হইয়া কি অপূর্ব্ব লীলা প্রকটিত করিতে বাসনা করিয়াছেন! ভাবিবা দেখিলে সত্যই মনে হয় জগতের ভ্রম অন্ধকার দূরীভূত করিয়া, পরম তত্ত্বা-লোক প্রকাশের জন্যই দয়ার ঠাকুর দয়া করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আহা, জীবের কি সৌভাগ্য! এই যুগে যাহারা জন্ম লাভ করিয়াছে, তাহারা যদি কোনরূপে আচার্য্যদেবের প্রকাশিত জ্ঞানালোকের কণামাত্র অধিগত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে অনায়াসে দুস্তর ভব-পারাবার উত্তরণ করিতে পারে।

অপর শিষ্য সে কথা শুনিয়া কহিলেন,—“আমরাই বা কি মহাভাগ্যবান, যাঁহার কৃপাবলে পরিতপ্ত পতিত সংসার সুশীতল হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে, তাঁহার সেবা তাঁহার সান্নিধ্য

লাভ, তাঁহার মুখে শিক্ষা উপদেশের বাণী শ্রবণ কি সামান্য সৌভাগ্যের বিষয়! প্রভু আমাদের সত্যই পতিত আঁধারগ্রস্ত সংসারকে উদ্ধার করিতেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভ্রান্ত মূঢ় মানব সততই আত্মহারা। সে দুর্ভাগ্য বশে আপনাকে চিনিতে পারে না—জানিতে পারে না। অন্ধ ক্ষুদ্র জীবাত্মা স্বীয় ভূমা ভাব ভুলিয়া সদাই বদ্ধ অবস্থায় রহিয়া মহা দুর্দ্দশায় কালযাপন করিতেছে। তাহারা আপনারা আপনাকে জানে না—আপনাকে চিনিতে চেষ্টা করে না। তাই তাহাদের যত যন্ত্রণা—যত দুর্দ্দশা দুরবস্থা। হস্তী, বন হইতে লোকালয়ে বদ্ধাবস্থায় রহিয়া যেমন কিছুকালে আপনার সে স্বাধীন সুখের অবস্থা ভুলিয়া যায়; আর তাহা কল্পনায়ও ভাবিতে পারে না, তেমনি মানুষও আপনাকে বিস্মৃতি বিভ্রমের কূপে নিমগ্ন রহিয়া মহা দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে থাকে। আচার্য্য দেব তাহাদের সেই দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধারকল্পে সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি পতিত অন্ধ মানবকে জ্ঞান চক্ষু প্রদান করিবেন। দিব্য দৃষ্টি দিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন—মানব সত্যই অমৃতের সন্তান। সেই মহদ্বাণী—পরম তত্ত্ব কথা—তাহারা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে এবার প্রভু তাহাদিগকে মহানিদ্রা হইতে জাগ্রত করিবেন—তাহাদিগকে জানাইবেন—চক্ষু উদ্‌ঘাটন করিয়া বুঝাইবেন—অন্ধ পতিত মানব হতভাগ্য তুমি তুচ্ছ সামান্য কীটের ন্যায় নহ—তোমার মধ্যে যে মহৎ জ্ঞানের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ রহিয়াছে। তোমার আলস্যে ঔদাস্যে উহা নির্ব্বাপিত প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। জাগ্রত হইয়া উত্থান কর—সেই মহৎ জ্ঞান অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিবার জন্য কায়মনোপ্রাণে

স্বচেষ্ট হও। সেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইলেই সুস্পষ্ট বুঝিবে তুমি সামান্য ক্ষুদ্র বদ্ধ জীব নও। তুমি অমৃতময়---তুমিই স্বয়ং স্বর্গ-স্বরূপ। তোমারই মধ্যে অসীম ব্রহ্ম বিরাজমান—তুমিই স্বয়ং ব্রহ্ম। তুমি মায়াভ্রমের বন্ধনে বদ্ধাবস্থায় সংসার-সন্তাপ ভোগ করিতেছ। তোমার দুঃখ যন্ত্রণা সবই মিছা—সবই মায়ার ছায়াবাজী মাত্র। প্রভু এই পরম কল্যাণকর মহাতত্ত্ব পতিত পথভ্রান্ত মানবকে প্রদান করিতেই, আচার্য্য শঙ্কররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

যখন আচার্য্যদেব সমাধি অবস্থায় বিভোর হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, তখন শিষ্যগণের মধ্যে এইরূপ ভাবের আদান প্রদান চলিতেছিল। ইতিমধ্যে বহুদূরে হঠাৎ ক্রন্দন কোলাহল সমুত্থিত হইল। ক্রন্দন ধ্বনি অতি করুণ ভাবাপন্ন হইয়া ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। সে করুণ ক্রন্দন ধ্বনি এমনই নিদারুণ যে তাহা শুনিয়া বৃক্ষ লতা পর্য্যন্ত যেন নীরব নিস্তব্ধ হইয়া রহিল—পশুপক্ষী পর্য্যন্ত যেন নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। এমনই হৃদয় বিদারক সে আর্ত্তনাদ! হিমাদ্রি পর্য্যন্ত সে আর্ত্তনাদে বিচলিত হইল। স্বয়ং আচার্য্যদেব পর্য্যন্ত সে ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শিষ্যগণ সে করুণ ধ্বনি শ্রবণে ব্যথিত ও আকুলিত হইয়া উঠিলেন।

করুণ ক্রন্দন ধ্বনি অতি নিকটবর্ত্তী হইলে, আচার্য্য দেব সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে মৃতপুত্রের জন্য শোকার্ত্ত পিতা মাতা আকুল ভাবে ক্রন্দন করিতেছে। তাহারা অদূরে ক্রন্দন ধ্বনিতে কহিতেছে, —"অহো! সন্তান এ কি করিলে? তুমি আমাদের হৃদয়ের একমাত্র

মহারত্ন। তোমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া আমরা জীবন-ভার পরম সুখে অতিবাহিত করিতেছিলাম। তোমাকে লাভ করিয়া অবধি জীবনে বা সংসারে কোনই অভাব বা দুঃখ দৈন্য অনুভব করি নাই। তোমার স্নেহবন্ধনে নিবদ্ধ হইয়া সংসারকে পরম সুখের আগার বলিয়া মনে করিতাম। তুমি আমাদের আঁধার আচ্ছন্ন জীবনের আলোক স্বরূপ বলিয়া মনে করিতাম। তুমি আমাদের আঁধার আচ্ছন্ন জীবনের একমাত্র সূর্য্য স্বরূপ ছিলে। তোমার অভাবে এ জীবন বিষম ভারবহ ভীষণ আঁধারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। হায় এ কি করিলে? আর তোমারবিচ্ছেদ জনিত যন্ত্রণা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছি না।”

পিতামাতার এইরূপ হৃদয়ভেদী করুণ রোদন শ্রবণ করিয়া উপস্থিত শ্রোত্রা মাত্রেরই হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তাহাদের প্রাণে তৎকালে অতি তীব্র বৈরাগ্যের প্রবল প্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহারা পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন করিতে লাগিল। একজন অপর ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া কহিল “ওঃ! কি আশ্চর্য্য! এ কি দারুণ বিড়ম্বনা—বিধাতার কি অদ্ভুত লীলাকাণ্ড! এ সন্তান উহার পিতামাতার কে? কোথা হইতে এ সন্তান আসিয়াছিল? কোথায়ই বা চলিয়া গেল? এই তো মানবের নিয়তি—ইহাই তো মানুষের পরিণতি? এমন অস্থায়ী অসার জীবণের মূল্য কি?”

কেহ কেহ এইরূপ বৈরাগ্যপূর্ণ বাক্যজাল বিস্তার করিয়া উপস্থিত জনসমুহের প্রাণে বিবেক বিজ্ঞানের ভাব উদ্ভাবিত করিবার

জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। অপরে প্রত্যুত্তরে কহিল,—"সকলই ভগবানের লীলা। তিনি লীলা ছলে জগতের সহিত জীবকুলের সৃজন করিয়াছেন। তিনিই লীলা ছলে তাহাদিগকে পালন করিতেছেন। আবার তিনিই লীলা ছলে তাহাদিগের লয় সাধন করিতেছেন। এ সকল কাণ্ড ক্রিয়া দেখিয়াও মানব কিছুই বুঝিতে পারে না—বুঝিয়াও কেহ প্রকৃত পন্থায় পরিচালিত হইতে পারে না।"

অপরে কহিল,—"কেহ পারে না কেন? যে যেমন ভাবের অধিকারী, তাহার সেইরূপ সৌভাগ্যের উদয় হয়। সেই সুকৃতি সৌভাগ্য অনুসারে সে উপযুক্ত পন্থার অধিকার লাভ করিয়া থাকে। এই জন্যই মানবের পক্ষে প্রকৃতি ও ক্রিয়া কলাপ অনুসারে কর্ম্ম-পন্থার পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট মানব উৎকৃষ্ট কর্ম্ম-ফলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থার অধিকারী হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে অধম মানব অপকৃষ্ট কর্ম্মফলে অধোগতি পাইয়া জন্ম জন্ম কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে।"

অপর ব্যক্তি কহিল, "এ সকল অধম জীবের উদ্ধারের উপায় কি? তাহারাও যে ভগবানেরই অধীন—তাঁহারই সৃষ্ট জীব। কিরূপে তাহাদের সৎগতিলাভ হইবে?"

শঙ্করের জনেক শিষ্য তৎসন্নিধানে থাকিয়া উপস্থিত ব্যক্তি-বর্গের উপরিউক্তরূপ কথোপকথন শুনিতেছিলেন। তিনি আর মৌনাবলম্বন করিয়া রহিতে পারিলেন না। তিনি মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—"ভগবানই জীবের গতি। তাহাদিগের অধোগতির পথ রোধ করিবার জন্য তিনি এবারে স্বয়ংই অবতীর্ণ হইয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্কর, শিব অংশে অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞানালোকে অন্ধ জীবের মোহ অন্ধকার বিদূরিত করিবেন। যে তাঁহাকে চিনিতে পারিবে সুকৃতি সৌভাগ্য বলে তাঁহাকে জানিতে পারিবে, তাহার দুরদৃষ্ট অপগত হইবে। সে তাঁহার উপদেশ—তাঁহারই প্রচারিত পরম তত্ত্বজ্ঞান অধিকার করিয়া বন্ধন অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিবে। আত্মতত্ত্বের অধিকারী হইয়া সে ইহজীবনেই মোক্ষসুখ উপভোগ করিবে।"

মৃত সন্তানের জন্য শোকার্ত্ত জনক জননীর হৃদয়-বিদারক ক্রন্দনধ্বনি আচার্য্যদেবের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, তাঁহার ধ্যান সমাধি ভঙ্গ হইল। করুণ আর্ত্তনাদে, জীবের পাপতাপহারী মহা-প্রাণ শঙ্করের করুণ হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি মৌনভাবে আপন অন্তরে কহিতে লাগিলেন—"অহো কি নিদারুণ যন্ত্রণা! বৃথা মায়া মোহের ভ্রান্তি বশে জীবের কি ভীষণ শোকতাপ! জীবের ভয়ঙ্কর ভব-যন্ত্রণা কতদিনে বিদূরিত হইবে?"

শঙ্কর মৌনভাবে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় গগণ বিদারণ করিয়া আকাশবাণী হইল—"যাহার কোন ক্ষমতা নাই সে বৃথা আক্ষেপ বা বৃথা অনুশোচনা করিয়া কি কোন উপায় করিতে পারে?"

এই দৈব আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া শঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন;—"একি শুনিলাম? এ যে অতি অপূর্ব্ব অদ্ভুত দৈববাণী! ইহার অর্থই বা কি? কেন এমন বাণী আজি হঠাৎ

আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল? তবে কি মৃত জীবের জন্য কোন উপায় বিহিত হইতে পারে?”

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শঙ্কর যোগবল অবলম্বন করিলেন। সমাধিস্থ হইয়া মৃত সন্তানের জীবন সঞ্চরণের প্রক্রিয়া সাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অমানুষিক যোগবলে মৃত সন্তান জীবনলাভ করিয়া সমুত্থিত হইল। অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া তত্রস্থ দর্শকবৃন্দ যেন জ্ঞানহারা হইয়া উঠিল। সকলেই একবাক্যে কহিতে লাগিল,—“একি অদ্ভুত অমানুষিক কাণ্ড! কেন এমন ব্যাপার সংঘটিত হইল? কাহার বলে—কোন ফলে এমন আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিল! মৃত জীব জীবন লাভ করিয়া যেন নিদ্রাভঙ্গে জাগ্রতের ন্যায় সমুত্থিত হইল! নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষের মহৎ কৃপাফলে এই অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে।”

মৃত সন্তানের জীবনলাভ সন্দর্শনে শোকাকুল পিতামাতা যেন পুনর্জ্জীবন লাভ করিল। তাহারা জ্ঞানহারা হইয়া আনন্দভরে আপনা আপনি কহিতে লাগিল, “এ কাহার কৃপা? কোন দৈব-বলে—কোন মহাপুরুষের দয়ায়—আজি আমরা এই ঘোর সঙ্কট সাগর হইতে উদ্ধার লাভ করিলাম? নিশ্চয়ই কোন অমানুষিক ব্যক্তির কৃপায় আমরা মৃত সন্তানের জীবন লাভ করিয়া সংসারে কৃতার্থ হইলাম—তাহারই ফলে আজি আমাদের জীবন ধন্য হইল।”

তখন অনেকেই বুঝিতে পারিল যে আচার্য্য দেবের যোগৈশ্বর্য্যের শক্তিফলে এই অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। মৃত সন্তানের পিতা মাতাও তাহা বুঝিতে পারিয়া শঙ্করপদে প্রণিপাত করিয়া পুন-

জীবিত সন্তান সহ স্বগৃহে গমন করিল। সকলে আচার্যদেবের জয়ধ্বনিতে গগণ নিনাদিত করিতে লাগিল।

অতঃপর শঙ্কর মৌনধারিণী অম্বিকা দেবীর মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবীকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পূজায় ও স্তবে দেবী পরম পরিতুষ্টা হইলেন। দেবী প্রসন্না হইয়া শঙ্করকে দর্শন দান করিলেন ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ শরীরীর ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

শঙ্কর, যথেচ্ছা পরিব্রজন করিতে করিতে শ্রীবলী নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে এক অতি পবিত্র ব্রাহ্মণ পল্লী অবস্থিত। এই স্থানে আসিয়া আচার্য্যদেব পরম প্রীত মনে কিয়ৎ-কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এখানকার ব্রাহ্মণগণ সকলেই অতীব বিশুদ্ধ চরিত্র। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, সর্ব্বদা বেদ অধ্যয়নে ও ব্রত নিয়মাদি পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে নিরত ছিলেন। তাঁহাদের কার্য্য কলাপের প্রভাবে সে স্থান পর্য্যন্ত পরম পবিত্রতা লাভ করিয়াছিল। তথায় তরুলতা কখন ফলপুষ্পহীন বা পত্রহীন বিশীর্ণ অবস্থা পায় নাই। গো ছাগ মহিষাদি গৃহপালিত জন্তুগণ কখন দুগ্ধহীন হয় নাই। গাভী দুগ্ধে প্রচুর হোমসাধক হৈয়ঙ্গবীন উৎপাদন করিয়া ব্রাহ্মণকুলের দৈব হোমের উপাদান সম্ভার সংযোজন করিত। দেশব্যাপী সুভিক্ষ প্রাচুর্য্য সতত অধিবাসীবর্গকে পরিতুষ্ট করিয়া রাখিত। দুর্ভিক্ষ অভাব কাহাকে বলে তাহা যেন তথাকার জনপদবাসীগণ স্বপ্নেও জানিতে পারিত না। আধি ব্যাধি বা অকাল মৃত্যু যেন সে দেশে

পদার্পণ করিতেও সাহসী হইত না। প্রাকৃতিক শোভায় সর্ব্ব স্থান অতি মনোরমভাবে সর্ব্বক্ষণ বিভূষিত হইয়া রহিত। এ সকলই সেই সকল ঋষিকল্প ব্রাহ্মণগণের ব্রত তপস্যাদির ফল স্বরূপে পরিণত হইয়াছিল।

আচার্য্যদেব এই পরম নিষ্ঠাবান দেবস্থান বিশেষ ব্রাহ্মণ-পল্লী সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইলেন, ও আনন্দিত মনে কিছুকাল তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ ও পণ্ডিত-বর্গ আসিয়া আচার্য্যদেবকে পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিবিধ উপহারে তাঁহাকে পরম আপ্যায়িত করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। আচার্য্যদেব মহাত্যাগী মহাপুরুষ। কেবল মাত্র জীবন রক্ষার জন্য সামান্য ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যেই তিনি পরিতুষ্ট রহিতেন। তদ্ব্যতীত অপর কোন গৃহ দ্রব্য বা বিলাস সামগ্রীতে তাঁহার বিন্দু-মাত্রও আস্থা বা আসক্তি ছিল না। তিনি ব্রাহ্মণগণকে সুমধুর বাক্যে পরিতুষ্ট করিয়া সেই সকল সামগ্রী প্রত্যাখ্যান করিতেন ও ঐ সকল দ্রব্য দরিদ্র লোকদিগকে দান করিবার জন্য উপদেশ দিয়া বলিতেন,—"যিনি যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তাঁহার আবার অভাব কি? তিনি যৎকিঞ্চিৎ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহক দ্রব্যেই পরিতুষ্ট রহিবেন। সংসারের সকল বাহ্য উপভোগের সামগ্রী তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ অসার বলিয়া উপেক্ষনীয়। তিনি যে সে স্থানে যাহা কিঞ্চিৎ পাইবেন তাহা লইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। ব্রহ্মানন্দ, মোক্ষলাভই তাঁহার জীবনের একমাত্র চরম উদ্দেশ্য ও পরম উপেয়। তদ্ব্যতীত আর যাহা কিছু ইন্দ্রিয় উপভোগের সামগ্রী,

সে সকলই বিষবৎ বোধ করিয়া তিনি বর্জ্জন করিবেন। সৎ ও উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া দান করাও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের এক পরম ধর্ম্ম। যতদিন গৃহাশ্রমে প্রারব্ধ বশে বাস করিতে হয়, ততদিন 'দানযজ্ঞকে' এক পরম ধর্ম্ম বলিয়া মনে করা ব্রাহ্মণ ও অপর সকল বর্ণেরই কর্ত্তব্য। ত্যাগী সৎ ব্রাহ্মণের ন্যায় অসমর্থ দরিদ্র পীড়িত ব্যক্তিও দীনের উপযুক্ত পাত্র। যাহার দেহের বা বৈষয়িক অবস্থা দেখিয়া হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হয় সেই দানের উপযুক্ত পাত্র। অন্ধ আতুর জন ভিক্ষা প্রার্থী হইয়া দ্বারে উপস্থিত হইলে, যে গৃহস্থ তাহাকে ভিক্ষা প্রদান না করিয়া নিজে অর্থ বা বিষয় সম্পত্তি উপভোগ করে, সে বিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে। তেমন হৃদয়হীন ব্যক্তি নিতান্ত নিষ্ঠুর বলিয়া লোক সমাজে ঘৃণিত ও নিন্দনীয় হইয়া থাকে। তাহার পক্ষে ইহলোক পরলোক উভয় লোকই পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকে। তাহার মানব দেহ ধারণ মানব জীবন লাভ বৃথা ও নিস্ফল হইয়া যায়। যথার্থ দরিদ্র ও অক্ষম পীড়িত জনকে গৃহীগণের সন্তান সম জ্ঞান করিয়া পালন করা কর্ত্তব্য। তেমন দানের পাত্র সম্মুখে উপস্থিত হইলে যদি তাহার দারিদ্র্য-দশা দর্শনে কাহারও কঠিন হৃদয় বিগলিত না হয় তবে সে পাষাণ সম জড় অথবা পশুর তুল্য হৃদয়হীন। পীড়িত ব্যক্তি দানপ্রার্থী হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে মনে করা কর্ত্তব্য যে জীবমাত্রই হতবিধির বশবর্ত্তী। কাহার কোন সময় কোন প্রকার দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়, তাহা কে বলিতে পারে? হয়ত এই মুহূর্ত্তেই মহাভাগ্যবান মহারাজ চক্রবর্ত্তীরও এমন দুর্দ্দশা হঠাৎ সংঘটিত হইতে পারে। এইরূপ মনে করিয়া উপস্থিত

দানের পাত্রকে সৎকার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতে নাই।"

এইরূপ দান সম্বন্ধীয় নানাবিধ সৎ উপদেশ প্রদান করিয়া আচার্য্যদেব পল্লীবাসী ব্রাহ্মণগণকে মিষ্ট সম্ভাষণে পরম আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিতেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার জ্ঞানগর্ভ বচন পরম্পরাও তাঁহার উপাদেয় উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে গুরুজ্ঞানে পূজা করিয়া প্রত্যাগমন করিতেন।

আচার্য্যদেবের প্রভাব ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এতই প্রবল হইয়াছিল যে বিনা বিচারে বিনা তর্কে তাঁহাদের প্রায় সকলেই তাঁহার অদ্বৈত-মত অবলম্বন করিলেন। তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহারা পরিচালিত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে সেই সকল ঋষিকল্প ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শঙ্করের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিম্বদন্তী এইরূপ যে তাঁহারা আচার্য্য শঙ্করের যথার্থ স্বরূপ প্রকটভাবে পরিদর্শন করিয়া মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় তাঁহার পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এই স্থান আজিও শঙ্কর-প্রদর্শিত ধর্ম্ম ও কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের জন্য সুবিখ্যাত ও পরম পবিত্র হইয়া রহিয়াছে। এখানে এখনও অনেকে শঙ্করের প্রভাব মাহাত্ম্য স্বায় জীবনে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে শঙ্কর শিব মন্দিরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "অদ্বৈত মত সত্য কি না?" তাহাতে আকাশবাণীতে তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন—"হঁা অদ্বৈত মতই যথার্থ সত্য।" একবার নহে, দুইবার নহে, তিন তিনবার এইরূপ আকাশবাণীতে আচার্য্যদেব ঐ একই বাণী শুনিতে পাইয়াছিলেন। যেন মহাদেব স্বয়ং আকাশ পাতাল প্রকম্পিত করিয়া

ভীষণ গর্জ্জনে ঘোষণা করিয়াছিলেন—সেই মহাসত্য মহতীবাণী—একমাত্র অদ্বৈতবাদই সার সত্যতত্ত্ব। শুনিতে পাওয়া যায় এখনও পর্য্যন্ত এখানকার বহু সাধক সিদ্ধ ব্রাহ্মণ মহাপুরুষ এইরূপ ধ্বনি স্বয়ং শ্রবণ করিয়াছেন। কেবলমাত্র তাঁহারা কর্ণেই যে এমন ধ্বনি শ্রবণ করেন তাহা নহে; তাঁহারা ব্রহ্মের সহিত স্বীয় একত্ব পূর্ণভাবে অনুভব করিয়া ইহ জীবনে যেমন ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছেন, এমনি বহুস্থানের বহু শিষ্য ও অনুবর্ত্তী জনগণকে কৃপা করিয়া শঙ্কর প্রত্যক্ষভাবে সেই পরম পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ ভূমির বহু সিদ্ধ ব্যক্তি ভারতের বহু স্থানের ধর্ম্মনেতা গুরুরূপে এখনও পর্য্যন্ত পূজিত ও সমাদৃত হইয়া থাকেন। তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন আচার্য্যদেবের কৃপাই তাঁহাদের এই ঐশ্বর্য্য মাহাত্ম্যের মূলীভূত হেতু। বাস্তবিক পক্ষে দৈব কৃপা ব্যতীত কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ সম্প্রদায় কোন বিশেষ গৌরব বা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে না। এই সাধু সিদ্ধ ব্রাহ্মণকুল তাহার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। ইহাঁদের সদাচার ও শুভ অনুষ্ঠানাদিতে আচার্য্যদেব এতই প্রীত হইয়াছিলেন, যে কৃপা করিয়া ইহাঁদের অনেকেই দুস্তর সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার লাভের শুভ-পন্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই বলে—শঙ্করের কৃপা ফলে যথার্থ আত্মতত্ত্ব আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া,—ইহ জীবনে ধন্য কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এখনও তাঁহাদের বংশ সম্ভূত ব্যক্তিগণ এদেশে মহাগুরুরূপে অনেক স্থলে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া সমাদৃত ও পরিপূজিত হইয়া থাকেন।

এখানে একটি অদ্ভুত কিম্বদন্তী এখনও পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। তাহাতে আচার্য্যদেবের অদ্ভুত মহিমা বিঘোষিত হইয়া থাকে। এখানকার এক ব্রাহ্মণ-পত্নী, স্বীয় ভর্ত্তার অনুষ্ঠিত পন্থায় পরি-চালিত না হইয়া কাপালিক প্রদর্শিত কদাচারের পথে অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তখন ভারতের নানাস্থানে দুষ্ট কাপালিকগণ নানা ছলে নানাবেশে বহু পল্লীতে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য ভ্রমণ করিত। যেখানে আপনাদের অভিপ্রায় ও দুষ্ট অভিসন্ধি সাধনের সুযোগ সম্ভাবনা দেখিত, সেই স্থানেই তাহারা আপন আপন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিত। কোনরূপ সুবিধা পাইলেই গৃহস্থগণের গৃহ হইতে কুলকামিনীগণকে ভুলাইয়া আনিয়া আপনাদের দুরভিসন্ধি সাধনের চেষ্টা করিত। এখন যেমন বঙ্গের নানাস্থানে নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণবগণের মধ্যে 'নেড়ানেড়ী' নামক একদল বৈষ্ণব গৃহ-রমণীদিগকে ভুলাইয়া কুপথে আনয়ন করে, তদ্রূপ ভারতে সেই সময় তন্ত্র-ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কাপালিকগণ কুলবতীগণকে গৃহ হইতে ভুলাইয়া আপনাদের আশ্রমে আনয়ন করিত। তাহারা সাধারণত পল্লীসমাজ বা লোকালয় হইতে দূরবর্ত্তী কোন গুপ্ত স্থানে আপনাদিগের আড্ডা স্থাপন করিত। বেশী লোকে যেরূপ স্থলে সচরাচর যাতায়াত করিতে পারে না বা যেস্থানে গমনাগমন করিতে কুণ্ঠিত বা শঙ্কা বোধ করে এইরূপ স্থানে তাহারা 'আখড়া' সংস্থাপন করিত। প্রায় সাধারণতঃ শ্মশানক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে অথবা নিবিড় অরণ্য মধ্যে কিম্বা পাহাড়ের সানুদেশে তাহারা আপনাদিগের আড্ডা সংস্থাপন করিয়া রাখিত। তাহারা কোন

রাজদণ্ড বা সামাজিক শাসনের ভয় করিত না। কারণ তখন রাজাগণও তাহাদিগের অভিচারাদি কুক্রিয়ার ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন এবং সমাজেরও সকল লোকেই তাহাদিগকে বিশেষ ভয়ের চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। অনেকে তাহাদিগকে বিশেষ দৈব-বলে বলীয়ান মনে করিয়া এবং তাহাদিগের দ্বারা অনায়াসে বিশেষ দৈহিক মানসিক বা বৈষয়িক অনিষ্ট সংসাধিত হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহাদিগকে কিছুই বলিতে সাহস করিত না। বরং যাহাতে তাহাদিগের সংস্রবে বা সংস্পর্শে না আসিতে হয়, তৎপক্ষে সর্ব্বদা বিশেষ সাবধানে অবস্থিতি করিত। অনেকে কাপালিক দিগকে ভীষণ দৈত্য বা রাক্ষসের ন্যায় মনে করিয়া তাহাদের দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিতি করিতে সচেষ্ট থাকিত। বাস্তবিক তাহাদের ক্রিয়াকলাপ গতিবিধি নিতান্ত অমানুষিক পৈশাচিক ভাবাপন্ন ছিল।

এইরূপ এক ভীষণ কাপালিক আসিয়া উক্ত ব্রাহ্মণ-পল্লী হইতে কিছু দূরবর্ত্তী স্থানে অরণ্য মধ্যে এক নিভৃত ক্ষেত্রে স্বীয় আশ্রম স্থাপন করিয়াছিল। ঐ দুষ্ট কাপালিক নানাভাবে নানাছলে ব্রাহ্মণ পল্লীতে গমন করিত। একদা সে সাধু বেশে এক ব্রাহ্মণের গৃহে গমন করিয়াছিল। তথায় বশীকরণাদি প্রক্রিয়ার ফলে এক কুল কামিনীর উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তারিত করিয়াছিল। ঐ কুলকামিনী পল্লীস্থ সদাচার-সম্পন্ন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ গণের আচার অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া কদাচার কাপালিক পন্থায় প্রবর্ত্তিত হইবার উপক্রম করিলে, আচার্য্য দেব তথায়

উপস্থিত হইয়াছিলেন। যে গৃহে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই গৃহের কর্ত্তা, গৃহ-কামিনীর আচার ব্যবহার দেখিয়া অতীব মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু তদীয় গৃহের রমণী কেন যে এমন কুপন্থায় পরিচালিত হইতেছে, তাহা তিনি যথার্থরূপে বুঝিতে পারিলেন না। তাই তাঁহার উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা নিতান্তই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তিনি গৃহের এই অভাবনীয় কথা বিশেষত অন্তপুর চারিণীর ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধীয় কথা কাহার নিকট হঠাৎ প্রকাশ করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে উদ্বেগ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তিনি নানা ভাবে রমণীকে বুঝাইতে লাগিলেন। যাহাতে তাহার মতি গতি পরিবর্ত্তিত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুষ্ট কাপালিকের প্রভাব রমণীর উপর এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, যে ব্রাহ্মণের সকল চেষ্টাই বিফল হইল। অবশেষে ব্রাহ্মণ রমণীকে নানা ভাবে নানা কথায় তাড়না করিতে ও ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রমণী কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ করিল না। সে কাপালিক পরিচালিত কুপন্থায় পূর্ব্বের ন্যায় সমান ভাবেই চলিতে লাগিল। রমণীর গতিবিধি দেখিয়া ব্রাহ্মণ হৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা অনুভব করিলেন। সে ব্যথায় তিনি নিতান্ত অধীর হইয়া নিকটস্থ এক আত্মীয়কে আহ্বান করিয়া সকল কথা অকপটে কহিতে মনস্থ করিলেন। আত্মীয় নিকটে উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"ভাই আমি বড়ই বিপদগ্রস্ত। দেখ আমরা চিরদিনই সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের নিতান্ত অনুগত। সনাতন ধর্ম্ম ও তাহারই বিধান

অনুযায়ী পথে থাকিয়া আমরা পুরুষ পরম্পরায় ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছি। তদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপ বিপরীত পন্থা বা বিরুদ্ধ মতের অনুবর্ত্তন করিয়া কুলধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হই নাই। বেদ-বিধির অনুযায়ী যে কর্ম্ম মার্গ তাহাই আমাদের পক্ষে একমাত্র কুলধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন ও তদনুসারে ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠানই আমাদের একমাত্র প্রেয় এবং শ্রেয় কর্ম্ম। আমাদের এই ব্রাহ্মণ পল্লীর সমুদয় ব্রাহ্মণকুল এই সৎ প্রথা অনুসারে পরিচালিত হইয়া আসিতেছেন। তাই এই পল্লী সর্ব্বক্ষণ পরম পবিত্র যজ্ঞ ধূমে সমাচ্ছন্ন—তাই এই স্থানে সর্ব্বকর্ম্ম সাম ঋক আদির দাত্ত অনুদাত্ত স্বরে মুখরিত। এই স্থানের ব্রাহ্মণবর্গ সেই জন্য সর্ব্বত্র ঋষিরূপে সংপূজিত হইয়া আসিতেছেন। আমাদের মত পুরচারিণী মহিলাগণও ঋষি-পত্নীগণের ন্যায় সদাচার সম্পন্ন পুরুষবর্গের অনুবর্ত্তিনী হইয়া সনাতন বৈদিক ক্রিয়া কলাপাদির আচার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন।

মনের আবেগ ভরে ব্রাহ্মণের কণ্ঠরুদ্ধ হইবার উপক্রম করিল। গদ গদ ভাবে বাষ্পাকুল লোচনে ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"ভাই, আজি সেই পরম পবিত্র দুর্লভ ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমার কেন এমন দুর্গতি সংঘটিত হইল?"

আত্মীয় ব্রাহ্মণ অতি সদাশয় ও মহৎ প্রকৃতি-সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তিনি প্রবোধ প্রদানের ছলে কহিতে লাগিলেন,—"ভ্রাত, তুমি যথার্থই বলিয়াছ আমাদের ব্রাহ্মণ

পল্লী ঋষিপল্লী। আমাদের মধ্যে যে সকল সৎ শুভ অনুষ্ঠান কারী ব্রাহ্মণগণ বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদের প্রভাব মূর্ত্তিমান প্রভাকরের ন্যায় সমুজ্জল। তাঁহাদের জাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান কালে মনে হয় যেন দেবগণ স্বর্গ হইতে মর্ত্তে আগমন করিয়া স্বহস্তে তাঁহাদের প্রদত্ত আহুতি গ্রহণ করিতেছেন ও পরম পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাদিগকে ভোগশ্রী প্রদান করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু মহাত্যাগী ব্রাহ্মণগণ দিব্য জ্ঞান ব্যতীত আর কোন সম্পদ ভোগেরই উপাসক বা জাগতিক অপর কোন দ্রব্য লাভে ইচ্ছুক বা উৎসুক নহেন। কেবল দেবগণের মানসিক আশীর্ব্বাদ ও শুভ ইচ্ছা লাভ করিয়া তাঁহারা পরিতুষ্ট। এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন ও জগৎ সত্যই তাঁহাদের নিকট অতি অসার ও তুচ্ছ বোধে সর্ব্বদাই পরিত্যজ্য। তাঁহারা সংসারের কোন ভোগ্য বস্তুই কিছুমাত্র গ্রাহ্য করেন না। কেবল আত্ম-ধ্যান, আত্ম-চিন্তা দ্বারা আত্ম-সম্প্রসারণ ও আত্মার সংগতি ও উদ্ধার সাধনই, তাঁহাদের একমাত্র অনুষ্ঠেয় মহাধর্ম্ম ও পরম পবিত্র ব্রত। তাই আমাদের ব্রাহ্মণকুল এত শ্রেষ্ঠ ও সংসারে সর্ব্বত্র সংপূজিত।" এই বলিয়া সেই আত্মীয় ব্রাহ্মণ কহিতে লাগিলেন,—"আমাদের এই ব্রাহ্মণকুল এত উচ্চ এত পবিত্র কেন? যখনই এই জিজ্ঞাসা আমার প্রাণে উদিত হয়, তখনই শ্রীভগবানের মুখ-নিঃসৃত মহতী বাণী আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলে। ভগবান স্বয়ং শ্রীমুখে যোগ-ভ্রষ্ট জনের গতি তত্ত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন;—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতী সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোভিজায়তে॥

যিনি যোগপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হন, ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও তিনি বিনষ্ট হন না। কেননা কেহই শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া কখন দুর্গতি ভোগ করে না। যোগভ্রষ্ট জন পুণ্য লোক উপভোগ করিয়া, তথায় বহুকাল বাস করিয়া তৎপরে পবিত্র শ্রীমানগণের গৃহে জন্ম লাভ করিয়া থাকেন।

"অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥
তত্র তং বুদ্ধি সংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততেশ্চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥

*　　*　　*　　*

প্রযত্নাদ হতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধ কিল্বিষঃ।
অনেক জন্ম সংসিদ্ধ স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥

কিম্বা যোগভ্রষ্টজন জ্ঞানবান যোগী কুলে জন্মলাভ করেন। এমন জন্ম সংসারে নিশ্চয়ই অতি দুর্ল্লভ। চেষ্টার সহিত ক্রমে ক্রমে যোগে অধিক যত্নবান যোগী নিষ্পাপ হইয়া অনেক জন্মে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া পরম গতি পাইয়া থাকেন।"

ভগবানের এই কথা যখনই ভাবি ও বিচার করিয়া আমাদের এই ব্রাহ্মণকুলের আচার পদ্ধতির সহিত তুলনা করিয়া

আলোচনা করি, তখনই মনে হয়, পূর্ব্ব জন্মের বহু ভাগ্যফলে, আমরা এই ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ করিয়াছি। আর মনে হয়, আমাদের এই বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই যোগ-ভ্রষ্ট। নতুবা এই পরম পবিত্র যোগী কুলে কেন তাঁহাদের জন্ম হইবে? একমাত্র যোগবলে ও যোগ সাধনার ফলে মানব মহামুক্তি ও মহানির্ব্বাণের অধিকারী হইয়া থাকে। তাই ভগবান যোগের মহিমা ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন ;—

"তপস্বিভ্যোধিকো যোগী জ্ঞানীভ্যোপিমতোধিকো।
কর্ম্মীভ্যোশ্চাধিকো যোগী তস্মাদযোগী ভবার্জ্জুন॥

অর্থাৎ যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী হইতে শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মী হইতেও শ্রেষ্ঠ, অতএব হে অর্জ্জুন তুমি যোগী হও।

বাস্তবিক যোগেই মোক্ষ—যোগেই নির্ব্বাণ। যোগ-পন্থা অবলম্বনে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে, মানব-জন্মের সার্থকতা সংসাধিত হইয়া থাকে। যোগ সাধনার সঙ্গে সঙ্গে দেহ, ইন্দ্রিয় ও উচ্চ মানসিক বৃত্তির অনুশীলনে তাহাদের স্ফুরণ, সংযম ও অবশেষে নিরোধ সাধিত হইয়া পরমানন্দপ্রদ সমাধিলাভ হইয়া থাকে। একমাত্র এই অবস্থায় জীবের ব্রহ্ম-সংস্পর্শ উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার অবস্থা পরম সুখের অবস্থা; এই অবস্থাই মহামোক্ষ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আমাদের এই ব্রাহ্মণকুল সেই মহামোক্ষ পন্থায় পরিচালিত। তাই মহাভাগ্যের ফলে আমাদের এই পরম পবিত্র কুলে জন্মলাভ ঘটিয়াছে। বংশপরম্পরাগত কুলধর্ম্মের অনুষ্ঠানেই আমাদের

মানব জন্মের সার্থকতা সাধিত হইতে পারে। এমন কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, এমন শ্রেষ্ঠ পন্থা লাভের সুযোগ পাইয়াও, আমরা যদি মূঢ় অন্ধ হইয়া, সে সকল কুলগত কর্ম্ম অনুষ্ঠানে অবহেলা করি, তাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই দুর্ভাগ্যের কথা তাহাতে আর সন্দেহ কি ?"

এই বলিয়া সেই আত্মীয় ব্রাহ্মণ আগ্রহান্বিত হইয়া কহিলেন ;—"ভাই আমি বুঝিতেছি তোমার গৃহ বা পরিবারের মধ্যে নিশ্চয়ই ধর্ম্মপন্থার তীব্র কণ্টক স্বরূপ কোন প্রকার বিড়ম্বনা সংঘটিত হইয়াছে। তাই তোমার প্রাণ আজ এমন ব্যাকুল ও বিষাদ-কালিমায় বিজড়িত হইয়াছে। নতুবা তুমি কখনই তুচ্ছ বৈষয়িক ব্যাপারে এরূপ বিচলিত বা বিধ্বস্ত হইতে না। কারণ আমি জানি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি, চিরদিন বৈষয়িক ব্যাপারে ও সাংসারিক ঘটনায় বিরাগী এবং উদাসীন; একমাত্র ধর্ম্ম ও শুভ পবিত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠানই তোমার জীবনের অবলম্বন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যেমন কর্ম্ম-যোগের ও জ্ঞান যোগের পন্থায় পরিচালিত হইয়া এই শ্রেষ্ঠ পরম পবিত্র ব্রাহ্মণ কুলকে সমুজ্জল করিয়া গিয়াছেন, তুমিও সেই পদবীতেই জন্মাবধি পরিচালিত হইয়া আসিতেছ। তবে আজি হঠাৎ এমন কি বিড়ম্বনা উপস্থিত হইল, যাহাতে তোমার ধীর প্রশান্ত চিত্ত এরূপ ক্ষুব্ধ ও মলিন হইয়াছে ?"

ব্রাহ্মণ, জ্ঞানী পণ্ডিত আত্মীয় ব্যক্তির উপদেশপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ বচন সমূহ শ্রবণ করিয়া কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া কহিলেন,

"তুমি জান আমার গৃহকামিনী চিরদিন কুলধর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরত রহিয়া স্বামীর অনুষ্ঠেয় আচরণ ও ক্রিয়াকলাপাদির অনুবর্ত্তন করিয়া আসিতেছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক অতিথি আসিয়া আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। আমি ও গৃহকামিনী উভয়ে অতিথিকে পাইয়া পরম আনন্দিত হইলাম। যাহাতে সুচারু ও প্রকৃষ্টরূপে অতিথি সৎকার হইতে পারে তজ্জন্য আমরা উভয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিলাম। ভোজ্য উপকরণ সমুদয় সংগৃহীত হইলে, অতিথিকে কহিলাম,—"মহাশয়, আমরা আপনার ন্যায় অতিথি পাইয়া অদ্য আমাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতেছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া স্বেচ্ছায় আমাদের দীন দরিদ্রের কুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন এবং স্বেচ্ছায় আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। আপনার পদার্পণে আমাদের দেহ ও ভবন পবিত্র হইল।" এই বলিয়া অতিথিকে পাদ্য অর্ঘ প্রদান করিলাম। তিনিও সাধুজনোচিত গৃহীর কুশল প্রার্থনান্তর আমাদের প্রদত্ত পাদ্য অর্ঘ্যাদি গ্রহণান্তর আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার মূর্ত্তিতে সাধুভাব ও সন্ন্যাস-চিহ্ন অতি সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। তাঁহার দৈহিক লক্ষণ দেখিয়া আমরা যথার্থই আমাদিগকে বিশেষ ভাগ্যবান বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। কারণ তাঁহার বাহ্যমূর্ত্তিতে ত্যাগধর্ম্মের লক্ষণই বিশেষরূপে প্রকাশিত হইতেছিল। তাঁহার আকার ও আচরণ দেখিয়া তাঁহাকে শিব-ভক্ত মহাপুরুষ বলিয়াই আমরা অনুমান করিয়াছিলাম। যাহাহউক অতিথি

নারায়ণ স্বরূপ। তাঁহাকে সেইরূপে অর্চ্চনা করাই শাস্ত্রের বিধান। আমরা সেইভাবে যথাসাধ্য তাঁহার সৎকার করিলাম। অতিথি দিবস ও রজনী আমাদেরই গৃহে অবস্থান করিলেন। তিনি যতক্ষণ আমাদের ভবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রায় অধিকাংশ সময় মৌন অবলম্বন করিয়া স্বীয় সাধনায় নিরত ছিলেন। তাঁহার সাধনার কতকগুলি প্রক্রিয়া দেখিয়া তাঁহাকে বিশুদ্ধ সনাতন বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া আমার মনে হইল না। তিনি সাধারণ ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় কতকগুলি ক্রিয়া-কলাপ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। নরকপাল ও অস্থিমালা লইয়া জপ তপাদি ক্রিয়া সাধন করিলেন।

আমরা আহারাদির জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি বলিলেন, —"আমাকে পাকের দ্রব্যাদি প্রদান কর। আমি নিজেই স্বহস্তে পাকক্রিয়া সমাধা করিব।"

অতিথির আজ্ঞা অনুসারে আমরা যথাসাধ্য গোধূমচূর্ণ ও—অপর দ্রব্যাদি তাঁহার নিকট অর্পণ করিলাম। তিনি পাক-ক্রিয়া সমাধা করিয়া ভোজন করিলেন। আহারের সময় তাঁহার অনুষ্ঠিত কতিপয় কার্য্য দর্শন করিয়া আমাদের মনে অতি বিসদৃশ ভাবের উদয় হইল। অতিথি আহারান্তে রাত্রিকালে এক প্রকার হোম-ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হোমান্তে আমাদিগকে এক প্রকার লোহিতবর্ণের দ্রব্য প্রদান করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ সকলকে কপালে, তাহার ফোটা লইবার আদেশ করিলেন ও কহিলেন তাহাতে গ্রহের বিশেষ লাভ হইবে। অতিথিকে

দেবতা বোধে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিলাম। আমরা স্ত্রী পুরুষ সকলেই ফোটা ধারণ করিলাম"।

"পরদিন অতি প্রত্যুষে অতিথি প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় আমাদিগকে কিছুই বলেন নাই। যাহা হউক তদবধি আমাদের গৃহ কামিনী নিতান্ত উদ্ভ্রান্তার ন্যায় এক অদ্ভুত বিপরীত পন্থায় পরিচালিত হইতেছে। তাহার সমুদয় আচার অনুষ্ঠান আমাদের চির আচরিত বিধানের বিপরীত। সবই যেন পৈশাচিক ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আত্মীয়ের হস্ত ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

আত্মীয় কহিলেন,—"হাঁ বুঝিয়াছি। সম্প্রতি আমাদের পল্লীর নিকটবর্ত্তী এই অরণ্যে একটি কাপালিক আশ্রম স্থাপন করিয়াছে। আমার মনে হয় ইহা তাহারই কার্য্য। তাহারই কোন গুপ্ত আভিচারিক ফলে তোমার গৃহে এরূপ বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে।" ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"সে যাহা হউক, এক্ষণে উপায় কি? ভাই আমি যে নিতান্ত সঙ্কটজালে বিজড়িত হইয়াছি।"

আত্মীয় চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"আর তোমার চিন্তা করিতে হইবে না। আমাদের এই পল্লী হইতে অদূরে যে মহাপুরুষ আগমন করিয়াছেন, তিনি সাক্ষাৎ দেব দেব মহাদেব স্বরূপ। তাঁহার মূর্ত্তি একবার চক্ষে নিরীক্ষণ করিলে, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ শঙ্কর ব্যতীত সাধারণ মানব বলিয়া কখনই কাহার মনে হয় না। তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেই মনে হয় যেন সমুদয়

পাপ তাপ চিরতরে বিলুপ্ত হইল। তিনি সত্যই অসাধারণ মহাপুরুষ। তুমি তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনি তোমায় এ ঘোর সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবেন।

ব্রাহ্মণ বিষণ্নবদনে কহিলেন,—"আমি পতিত পরিতপ্ত অধম ব্যক্তি। কিরূপে সেই মহাপুরুষের সন্নিধানে গমন করিব ?"

আত্মীয় কহিলেন,—"মহাপুরুষের নিকট যাইতে চিন্তা কি ? তাঁহার মূর্ত্তি দেখিলেই সকলে মহা শান্তিলাভ করিয়া থাকে আইস, আমি তোমায় সঙ্গে লইয়া যাইব।"

এই বলিয়া উভয়ে আচার্য্যদেবের নিকট গমন করিলেন আচার্য্য তখন শিষ্যগণকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন।

ব্রাহ্মণদ্বয় যাইয়া আচার্য্যদেবের পদতলে নিপাতিত হইয় সমস্ত ব্যাপার কহিলেন। আচার্য্য প্রসন্ন বদনে সুমধুর ভাবে কহিলেন,—"কোন চিন্তা নাই। যিনি সকল সঙ্কট-সন্তাপ হইতে উদ্ধার করেন, এক মনে তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর। সকল বিপদ বিদূরিত হইবে। তোমরা গৃহে গমন কর। তোমরা পরমাত্মার শরণাপন্ন হও।"

আচার্য্য দেবের কথায় ব্রাহ্মণদ্বয় আশ্বস্ত হইয়া গৃহে প্রত্যা গমন করিলেন। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন আচার্য্যদেবের আশী-র্ব্বাদের ফল ফলিয়াছে। সত্যই শঙ্করের যোগ-ঐশ্বর্য্য প্রভাবে ব্রাহ্মণ রমণীর মতি গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া পূর্ব্ব প্রথা অনুসারে

কুলধর্ম্মের পথে পরিচালিত হইতে লাগিল। তাঁহারই প্রভাবে কাপালিক সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে প্রস্থান করিল। এই ভীষণ কাপালিক অবশেষে প্রতিশোধ লইবার মানসে শঙ্করের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল। সে বনে বনে কৌশলে আচার্য্যদেবের হত্যাসাধন জন্য প্রাণপণে ব্যগ্রভাবে যত্ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলেন এই কাপালিক সেই সুবিখ্যাত উগ্র ভৈরব নামে প্রসিদ্ধ।

শঙ্কর শ্রীবলীর সুবিখ্যাত পরম পবিত্র ব্রাহ্মণ পল্লী পরিত্যাগ করিয়া শিষ্যগণ সহ যথেচ্ছা বিচরণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে নানাস্থানে নানাদেশ দেখিতে দেখিতে কোথাও অতি অল্প কাল, কোথাও বা বহু কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যে স্থানের যেরূপ প্রভাব তাঁহার চিত্ত আকর্ষণে সমর্থ হইত তথায় সেই ভাবে অবস্থান করিতেন। যদিও আচার্য্যের মনোবৃত্তি সমুদয় সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হইয়াছিল, যদিও তাঁহার চিত্ত উপরতি লাভ করিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হইয়াছিল, তথাপি যে যে স্থান নৈসর্গিক শোভায় পরিশোভিত হইয়া ধর্ম্মভাব উদ্বোধনের পক্ষে মুগ্ধ প্রাণকে প্রবুদ্ধ করিবার পক্ষে অনুকূল বলিয়া মনে হইত, তথায় শিষ্যগণের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য আচার্য্যদেব অধিক কাল অতিবাহিত করিতেন।

একদা আচার্য্যদেব শিষ্যগণ সহ মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত একটি স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়।

অদূরে ছোট ছোট পর্ব্বত শ্রেণী শরৎকালীন নির্ম্মল গগণে মেঘমালার ন্যায় পরম রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছিল। পর্ব্বত সমুহের উপরিভাগ নানাজাতীয় সুন্দর বৃক্ষ লতায় পরিশোভিত। দূর হইতে বোধ হয় যেন বিধাতা স্বীয় হস্তে বিশাল আকাশের চিত্র-পটে অপূর্ব্ব দৃশ্য চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। বৃক্ষ শাখায় বিবিধ বিহঙ্গকুল সুমধুর স্বরে আলাপন করিতেছে। পর্ব্বতের অদূরে এক অতি মনোহর সরোবর। সরোবরে অসংখ্য কমল প্রস্ফুটিত হইয়া সে প্রদেশের নৈসর্গিক শোভা শতগুণ সংবর্দ্ধিত করিয়াছে। প্রস্ফুটিত কমলে অলিকুল উড্ডীয়মান হইয়া গুন্ গুন্ রবে মধুর গুঞ্জন করিতেছে। মারুত হিল্লোল মন্দ মন্দ বহিয়া মধুর মকরন্দ বিতরণ করিতেছে। এমন স্থানে উপস্থিত হইলে সাধারণ জনেরও মনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়—জ্ঞানী ভক্ত জনের তো কথাই নাই।

আচার্য্যদেব শিষ্যগণ সহ এই স্থানে উপস্থিত হইলেন। শিষ্যগণ এখানকার মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করিয়া বিমোহিত হইলেন। এখানে কিছুকাল অবস্থান করিবার জন্য তাঁহাদের প্রাণে আগ্রহের উদয় হইল। আচার্য্য তাহা বুঝিতে পারিয়া এক পরিষ্কৃত সুন্দর প্রস্তরখণ্ডে উপবেশন করিলেন। তেমন স্থলে সেই প্রস্তর খণ্ড দেখিলে সকলকেই বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। উহা এমন ভাবে পরিষ্কৃত হইয়াছে যে দেখিলে মনে হয় যেন নিশ্চয়ই কোন অদ্ভুত শিল্পী নিজ শিল্প সামর্থ্যের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদানের জন্য নিজ হস্ত ও মস্তিষ্কাদি পূর্ণভাবে পরিচালিত

করিয়াছে। কিন্তু সেখানে লোকালয়ের বা লোক সমাগমের কিছুমাত্র চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। শিষ্যগণ বিস্মিত হইয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ও একজন অপরকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—'একি! এমন নির্জ্জন নিভৃত স্থানে উৎকৃষ্ট বেদীর ন্যায় এ প্রস্তরাসন কিরূপে কোথা হইতে আসিল?"

কেহই এ প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানে সমর্থ হইলেন না। সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎপরে একজন কহিলেন, "এ স্থানের অতি মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া বোধ হয় ইহা সাধারণ মানব-সমাগম-ক্ষেত্র নহে। প্রাকৃতিক মানবকূল এস্থানে গমনাগমন করিলে কখনই এমন অনুপম স্বর্গীয় সুষমায় এ স্থান মণ্ডিত হইত না। এ অপূর্ব্ব স্থলের কি অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় শোভা! সে শোভায় পার্থিব জড়-ভাব বা স্থূলভাব পরিলক্ষিত হয় না। সবই যেন স্বর্গীয় পবিত্রতায় পরিপূর্ণ! কি উদ্ভিদ সমূহ—তরুলতাদি—কি স্থূল জড়জাতি প্রস্তর শৈল খণ্ডাদি—কি নিম্নজাতীয় প্রাণীকুল—পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি সকলই যেন সম্পূর্ণ অপার্থিব সৌন্দর্য্যে বিভূষিত! সকলই যেন জড়মূঢ় ভাব পরিত্যাগ করিয়াছে—সবই যেন সুনির্ম্মল প্রকাশশীল। এমন কোন অন্ধ মূঢ় মানব জগতে আছে যে জন এমন স্থানে আসিয়া স্থূল প্রকৃতির অতীত এ অপূর্ব্ব ভাবে অভিভূত বা বিমোহিত না হয়? এতদিন ধরিয়া সংসারের কত স্থান পরিভ্রমণ করিলাম—কত পুণ্য ভূমি—কত তীর্থক্ষেত্র সন্দর্শন

করিলাম—কিন্তু এমন অদ্ভুত অপূর্ব্ব স্থান তো কখন নয়ন পথে পতিত হয় নাই। এ স্থান দেখিলে স্বতঃই মনে হয় ইহা যেন নরলোকের অতীত কোন দেবভূমি।”

আর একজন কহিলেন,—আমার মনে হয় এ অপূর্ব্ব স্থান সত্যই অপার্থিব। বহু পার্ব্বত্য প্রদেশ—বহু বনভূমি—বহু কুসুম কুঞ্জ পরিদর্শন করিয়াছি। তাহাদের মনোহর শোভায় প্রাণ মন আকৃষ্ট হইয়াছে। সে শোভা দেখিয়া হৃদয় স্বতঃই উল্লসিত হইয়াছে। কিন্তু কোথাও অন্তরাত্মা এমন অপার্থিব ভাবে বিভোর বা আত্মহারা হয় নাই। আমার মনে হয়—মনে হয় কি নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে—এই স্থান নিশ্চয়ই দেবগণের মর্ত্তে বিচরণের লীলা-ক্ষেত্র। নতুবা এস্থানে আসিবামাত্র মনের ভাব এমন পরিবর্ত্তিত কেন হইল? সংসারের সকল স্থূলভাব, সর্ব্ববিধ শোক তাপ পরিতপ্ত ভাব কেন নিমিষে বিদূরিত হইয়া গেল? এখানে আসিবা মাত্র মনে হইল যেন জীব-লোকের অতীত অতি অনির্ব্বচনীয় মহল্লোকে আগমন করিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ববিধ দৈহিক অবসাদ ও মানসিক সন্তাপ যেন চিরতরে বিলুপ্ত হইল। সমুদয় শ্রেষ্ঠ পবিত্র মনোবৃত্তি সমূহ জাগ্রত ও মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উচ্চ তত্ত্ব অধিগত করিবার জন্য উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ভারতের শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতরাজির সন্নিধানে, শ্রেষ্ঠ সরোবর সমূহের নিকটে আসিয়া মনে অমানুষিক ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে সত্য; সে সকল স্থান গন্ধর্ব্ব অপ্সরা আদি জীবকুলের বিহার-ভূমি বলিয়া প্রাণে উপলব্ধি হইয়াছে।

কিন্তু এমন দৈবী-ভাবের উদ্রেক তো কোথাও হয় নাই। আমার মনে হয় এস্থান নিশ্চয়ই পরম জ্ঞানদাতা দেবপতির লীলা-নিকেতন বিহার ভূমি। মনে হয় যেন দেবাদিদেব স্বয়ং সময়ে সময়ে মর্ত্তভূমিতে এইস্থানে অবতীর্ণ হইয়া ভূলোকে নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞানের ও পবিত্র বিবেক বৈরাগ্যের বীজ বিতরণ করিয়া থাকেন।"

শিষ্যগণের মধ্যে স্থানের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ও পবিত্রতা সম্বন্ধে এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল। আচার্য্যদেব স্বয়ং সেই প্রস্তর বেদীতে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া আত্মচিন্তা ও আত্মানুভবানন্দে নিমগ্ন হইলে শিষ্যগণকে নিকটে আহ্বান করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞানের যোগ সম্বন্ধে বহু তত্ত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। প্রথমে ধ্যান ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক গুঢ় তত্ত্ব কহিয়া পরে কহিলেন—'ত্যাগই মনুষ্যকে শ্রেষ্টস্তরে উন্নত করিবার আদি ও সূক্ষ্ম উপায়। জীব-জীবনের দুই পন্থা এক ভোগ অপর ত্যাগ। ভোগ মনুষ্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে না। স্থূল জড় দ্রব্যের উপভোগে মনের মলিণত্ব ও অপকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। ভোগসুখে নিরত মানব পশুত্ব ও মূঢ়ত্বের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ক্রমে এইরূপ স্থূল সংসার ভোগ করে। তখন সে দেহাত্ম-বুদ্ধি হইয়া, দেহের ভোগ ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থের সুখ ব্যতীত সুখের অন্য কোন শ্রেষ্ঠ স্বরূপ ও উন্নত তত্ত্ব কল্পনা করিতেও সমর্থ হয় না। এমন কি দেহ ইন্দ্রিয় ব্যতীত তাহার ভোগের যে অপর কোন আয়তন আছে বা থাকিতে পারে তাহা

বুদ্ধিতে চিন্তা করিতেও পারে না। এমন হততাগ্যের দশা কি শোচনীয়! এমন মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া, এমন মানব জন্ম লাভ করিয়া কোন পন্থায় মনুষ্যত্বের বিকাশ উৎকর্ষ সংসাধিত হয়, তাহার উপায় যে অন্বেষণ না করে বৃথাই তাহার মানবদেহ ধারণ—বিফল তাহার মনুষ্যজন্ম লাভ। কেবলমাত্র জড়সম্ভোগে জড় দেহের ও জড় ইন্দ্রিয়ের ভোগে উৎকর্ষ সাধিত হয় না। তাহাতে মানবের উচ্চ বৃত্তির অনুশীলন হয় না। সুতরাং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পন্থায় বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে।

অধ্যাত্ম ভাব লইয়াই মানবের মানবত্ব। দেহাত্ম-বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া আত্মবুদ্ধি লাভ দ্বারা মনুষ্য প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিযা থাকে। তাহাতেই মানব প্রকৃত মঙ্গলের পথ দেখিতে পায়। যথার্থ কল্যাণ মানবের পক্ষে আত্মবুদ্ধি দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে।

আত্মবুদ্ধির পক্ষে—প্রথম সূত্র ত্যাগ। ভোগ—জড়দেহের ও জড়ইন্দ্রিয়ের উপভোগ—মানবকে এমনই মন্দ ও মূঢ় করিয়া তুলে যে সে ত্যাগের পরম তত্ত্ব একেবারেই ভুলিয়া যায় এবং সেই ভ্রম মোহ হইতে পরিণামে তাহার পশুত্বে পরিণতি ঘটিয়া থাকে। তখন সে একমাত্র ইন্দ্রিয়ভোগ জনিত সুখ ব্যতীত, মোক্ষানন্দ তো দূরের কথা, জ্ঞান চিন্তাদি জনিত যে সুখ সে সুখের তত্ত্বও একেবারে ভুলিয়া যায়।

ত্যাগই সাধন পন্থার প্রথম পর্য্যা। ত্যাগ-ধর্ম্ম অনুশীলন দ্বারা মানবের নীচ দৈহিক ও ইন্দ্রিয় বৃত্তির দমন ঘটিয়া থাকে।

তাহাতেই মানসিক শক্তিরও পথ প্রস্তুত হইয়া থাকে। সংসারে চতুর্দ্দিক কেবল স্থূল দেহ ও ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য সামগ্রীতে সংপূরিত। তাহাদের সঙ্গ হইতে বিকট বাসনার উদ্ভব হইয়া থাকে। এই বাসনা হইতে জীবের সকল দুঃখ ও বন্ধন ঘটে। তত্ত্বদর্শীগণ যথার্থরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে বাসনা হইতেই জগৎ—বাসনা হইতেই জীবের উদ্ভব—বাসনা হইতেই জীবের দেহ ধারণ। বাসনাকে পূর্ণ ধ্বংশ করিলেই মহামুক্তি অধিগত হইয়া থাকে। উৎকট-পিপাসার ন্যায় বাসনা উদ্ভব কালে জীবকে বিচালিত করিয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার পরিতৃপ্তি না হয়, ততক্ষণ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই বাসনা জীবকে পীড়ন করিয়া থাকে। আবার তৃপ্তি সাধনেও সম্পূর্ণরূপে ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ ঘটে না। কারণ আবার অন্য এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, নূতন সাজে সজ্জিত হইয়া বাসনা পুনরায় আবির্ভূত হইয়া থাকে। সেই নব সাজে নব মূর্ত্তিতে আবার জীবকে পরিচালিত ও বিতাড়িত করিতে থাকে। সে বাসনা যদি চরিতার্থ না হয়, তবে বিষম নিরাশাবিষম বিষাদ অবসাদ আসিয়া প্রবল জীবনকেও ভাঙ্গিয়া চূর্ণীকৃত করিয়া ফেলে। পক্ষান্তরে যদি পরিতৃপ্ত হয়, তবে আবার নূতন মূর্ত্তিতে নূতন বেশে সে আবির্ভূত হয়। এইরূপে অনাদি অনন্তকাল এই বাসনাই জীবকে জর্জ্জরিত করিতে থাকে। তবুও হতভাগ্য জীবের চৈতন্য জন্মে না। সে ক্রমাগত বাসনার চক্রতলে নিষ্পেষিত হইয়া জন্ম জন্ম একই ভাবে দুঃখ দুর্দ্দশাগ্রস্ত

জীবন অতিবাহিত করিতে থাকে। বাসনা সর্ব্ববিধ উপভোগের মূল কারণ। উপভোগ হইতে উপভোগের চিন্তা মানবের চিত্তে কাম-রাজ্যের আবির্ভাব করে। তাহা হইতেই ক্রমে স্থূল সংসার ভোগ বিষয়-বাসনা, জীবজীবনে এমনই বদ্ধমূল হইয়া যায় যে অবশেষে কিছুতেই তাহাকে উৎপাটন করিতে পারা যায় না।

বাসনা বিকট হইয়া, মানবের জীবনে সর্ব্ববিধ অসুখ ও অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কারণ বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে কামনা জন্মিলে ও কামনা উপভোগ করিতে করিতে তাহাতে কোনরূপ বাধা বিঘ্ন ঘটিলে ক্রোধের উদয় হইয়া থাকে। ক্রোধ উপস্থিত হইলে মোহ জনিত ভ্রমের উদ্ভব হয়। মোহ জন্মিলে জ্ঞান বিজ্ঞানের পবিত্র শুভ্রপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। সে বড় তমসাচ্ছন্ন গতি। সেই ভীষণ গতিতে একবার আবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিলে তাহা হইতে উদ্ধার লাভ নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। সাধনার আদিম অবস্থায় সংযম ও চিত্ত শুদ্ধি নিতান্ত প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় ও মনকে দৃঢ় সংযম, রজ্জুতে বন্ধন করিয়া, তাহাদিগকে নিরোধের পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা, প্রত্যেক সাধকের প্রথম অবস্থায় অতীব প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য। যাহার ইন্দ্রিয় মন সংযত না হয় সে কখন সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারে না। দেহী জীব সর্ব্বকর্ম্মে সর্ব্ব অবস্থায় দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিবিধ মানসিক বৃত্তির ক্রীতদাস। একমাত্র বাসনাই দেহ মন ও ইন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠান করিয়া জীবনকে চঞ্চল করিয়া থাকে। তাহাতে শান্তি

ও মহামুক্তির পথ হইতে সে পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকে। শান্তি না জন্মিলে, তত্ত্ব জ্ঞানের অধিকার ঘটে না। চঞ্চল মানব তত্ত্বভাব অবলম্বন করিতে বা তাহাকে মনের মধ্যে দৃঢ়রূপে কখনই ধারণা করিয়া রাখিতে পারে না। ক্ষুদ্র তুচ্ছ সীমাবদ্ধ মানব প্রশান্ত হইয়া বহু আয়াসে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। আর যদি সে শান্ত সংযত না হয়, চাঞ্চল্যের অধীন দাস হইয়া পড়ে, তবে অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব যে আত্মতত্ত্ব তাহা লাভ করিবার বা উপলব্ধি করিবার উপায় কি ?

যে সকল মূঢ়জন বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া জীবন অতিবাহিত করে, তাহারা কখন মোক্ষানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারে না। তাহারা যদি ধর্ম্ম পথে পরিচালিত হয়, তথাপি পরম ধর্ম্ম যে অদ্বৈত তত্ত্ব তাহা কিছুতেই লাভ করিতে পারে না। যখন তাহারা ধর্ম্মপথে গমন করিতে থাকে, তখন কি উপায়ে ভোগ-ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে সমর্থ, যাগযজ্ঞাদি বহু ক্রিয়াকলাপ-বিশিষ্ট বিষয়-ধর্ম্মের প্রতি প্রধাবিত হইয়া থাকে। এইরূপে যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে হয় তো স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়। তৎপরে পুণ্যক্ষয় হইলে আবার স্বর্গ ভূমি হইতে এই মর্ত্তলোকে নিপতিত হইয়া থাকে। তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি কখন পরম তত্ত্বে—আত্মতত্ত্বে বা অদ্বৈত তত্ত্বের পথে পরিচালিত হইতে পারে না।

অদ্বৈত তত্ত্বই একমাত্র শ্রেষ্ঠ পন্থা। অদ্বৈত তত্ত্বই একমাত্র সারতত্ত্ব। মানবজীবন একমাত্র এই তত্ত্ব অবলম্বনেই ধন্য

কৃতার্থ হইয়া থাকে। 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম ভবতি' যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হইয়া থাকেন। যিনি একমাত্র সৎ স্বরূপ, যিনি সকল অসৎ পদার্থের উপরি সংস্থিত, একমাত্র তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলেই মানবের জীবন সার্থক হইয়া থাকে। ব্রহ্ম লাভের উপায় প্রধানতঃ আত্মচিন্তা—আত্ম-ধ্যান। আত্মাকে ধ্যান করিতে করিতে তাহার প্রকৃত স্বরূপ যে ভূমা ভাব বা ব্রহ্মভাব তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সাধন কার্য্যে সম্পন্ন হইয়া, আত্মার তুচ্ছ ক্ষুদ্র ভাবসমূহকে দৃঢ়রূপে বশীভূত করিয়া মন প্রাণাদি সমুদয় সংযত করিতে হয়। শীত উষ্ণাদি দন্দ্ব সহিষ্ণুতা, অভ্যাস দ্বারা দেহ মনের দৃঢ়তা সম্পাদন সাধনার পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজন। যে শীত উষ্ণ সহ্য করিবার সামর্থ্য লাভ করিতে না পারে সে সাধন-মার্গে কখনই কৃতিত্ব লাভ করিতে পারে না। এই সাধনা দ্বারা অন্নময় ও প্রাণময়াদি, জীবের নিম্নস্তরের কোষ বিজিত হইয়া থাকে। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি নিরোধ, তত্ত্ব জ্ঞান লাভের পক্ষে প্রধান প্রয়োজন। দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু ব্যক্তি কেবল তন্নিরোধে অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। জীবের দেহ ও মন সর্ব্বদাই চঞ্চল। তাহাদিগকে বশীভূত না করিলে মনকে সংযত বা প্রশান্ত করিতে পারা যায় না। মন সংযত ও প্রশান্ত না হইলে ধ্যান ধারণাদি ক্রিয়াকাণ্ড নিতান্তই অসম্ভব হইয়া উঠে।

তত্ত্বজ্ঞান-সাধকের পক্ষে ধ্যান ধারণাদির পরিপক্কতা প্রকৃষ্ট উপাদান। এই জন্য তাঁহার পক্ষে প্রথম অবস্থায় আহার বিহার

আদি ব্যাপারে নিতান্ত সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়; অপরিমিত আহারে দেহ মন অধিক মাত্রায় উত্তেজিত হইয়া থাকে। উত্তেজনার অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী ফল অবসাদ। উত্তেজনা যেমন জ্ঞান পন্থার বিষম বৈরী, অবসাদও তদ্রূপ অপকারী। উত্তেজিত দেহে কোনরূপে মন ও প্রাণকে সংযত বা শান্ত করিতে পারা যায় না। উত্তেজনার অবস্থা চাঞ্চল্যের অপর নাম বা অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আবার অবসাদের অবস্থা ঘোর তামসিক দশা। রজঃ ও তমোগুণের আবির্ভাবে মন প্রাণ একদিকে উত্তেজিত, অপর পক্ষে মোহময় ও ভ্রান্ত হইয়া থাকে। এই দুই অবস্থাই তত্ত্ব জ্ঞানের বিশেষ প্রতিকূল। একান্ত প্রকাশশীল সুগভীর প্রশান্ত চিত্ত তত্ত্ব জ্ঞানের বীজ গ্রহণে উপযুক্ত ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত। অত্যধিক আহার বিহারের ন্যায় অত্যধিক তন্দ্রা নিদ্রা বা আলস্য জ্ঞান-পন্থার মহা বিরোধী। নিদ্রার অবস্থা অতীব মোহময় অবস্থা। এই অবস্থায় জীবের তমোগুণ নিতান্ত প্রবল হইয়া উঠে। তমোভাবের প্রাধান্য ঘটিলে প্রকৃষ্ট বুদ্ধি বিনাশ পাইয়া থাকে। প্রকৃষ্ট বুদ্ধি বিনষ্ট হইলে জ্ঞান লাভের সামর্থ্য একেবারেই তিরোহিত হয়।

বাস্তবিক একমাত্র পরম জ্ঞানেই মানব-জীবন ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া থাকে। পরম জ্ঞান আত্মজ্ঞানেরই নামান্তর। আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হইতে পরম জ্ঞানের উদ্ভব ঘটে। দেহ ইন্দ্রিয়াদিতে বদ্ধ হইয়াই জীবাত্মা সংসারের মায়া প্রপঞ্চে নিবদ্ধ

হইয়া থাকে। অসীম অনন্ত আত্মা আপনার মহত্ত্ব ভুলিয়া ক্ষুদ্র দেহাবদ্ধ অবস্থায় কালাতিপাত করে। যখন সে আত্ম তত্ত্বের আভাস পায় তখনই সে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। তখনই সে আপনাকে চিনিতে জানিতে ও বুঝিতে বিশেষ সচেষ্ট ও জাগ্রত হইয়া উঠে। তখনই সে কেবল জীবন ও জগতের অসারত্ব ও ভ্রম ভাব জানিয়া প্রকৃত সার তত্ত্ব লাভ করিবার জন্য পীপাসী ও ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখনই তাহার প্রাণকে মনকে আলোড়িত করিয়া সেই মহৎ জিজ্ঞাসার উদয় হয়—আমি কে ? কি করিয়া কোন উপায়ে আমি আপনাকে জানিতে পারিব ? তখন সে সেই পরম জ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল প্রাণে সৎগুরুর অন্বেষণ করিতে থাকে। ব্যাকুলতা ভরে খুজিতে খুঁজিতে ভাগ্যবান যে সে জ্ঞানদাতা পরমগুরু লাভ করিয়া থাকে সে পরম গুরুর পদাশ্রয় লাভ করিয়া অবশেষে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হয়।

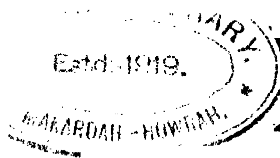
পরম গুরু জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় তাহার অন্ধ রুদ্ধ চক্ষু উন্মিলীত করিয়া দেন। তখন সে আপনার স্বরূপতত্ত্ব অধিগত করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। তখন তাহার মায়া মোহ জনিত ভ্রম চিরতরে ঘুচিয়া যায়। তখন সে যথার্থরূপে বুঝিতে পারে যে রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইলে, দড়িকে সাপ বলিয়াই বুঝিয়া থাকে, পরে সেই ভ্রম ঘুচিয়া গেলে যেমন ভ্রান্ত ব্যক্তি বুঝিয়া বলে 'ওঃ ! কি ভ্রম ! এটা যে রজ্জু ! ইহা তো কখনই সর্প নহে' সেইরূপ সৎগুরুর কৃপায় যে ভাগ্যবান ব্যক্তি জ্ঞান ধন লাভ

করিতে পারে, সে বুঝিতে পারে এজগৎসংসার একটা স্বপ্নের ধাঁধাঁ ছাড়া আর তো কিছুই নয়।' তখন সে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে থাকে—'অহো! কি হতভাগ্য আমি! আমার কি মোহ ভ্রমই ঘটিয়াছিল! আমি মিথ্যা কুহকী কল্পনার বশে একি স্বপ্নের ভ্রম-দৃশ্য সকল দেখিতেছিলাম! এতদিনে পরম গুরুর কৃপায় মহা সৌভাগ্য বলে সে মোহভ্রম বিদূরিত হইল। এতদিনে বুঝিলাম সকলই মিথ্যা! সকলই ছলনা! কেবল একমাত্র আমিই সত্য! এই সকল মিথ্যা প্রপঞ্চের মধ্যে অখণ্ড দণ্ডবৎ কেবল আমি বিদ্যমান একমাত্র সার সত্য। আমি কে তাহা বুঝিলাম। সৎগুরুর কৃপায় তাঁহারই তত্ত্ব উপদেশে জানিলাম আজি আত্মস্বরূপ। স্বপ্ন অবস্থায় যেমন কেহ দেখে যে তাহাকে কাল সর্পে দংশন করিয়াছে। তখন সে কাঁদিয়া চীৎকার করিতে থাকে! পার্শ্বস্থ ব্যক্তি তখন জাগ্রত হইয়া তাহাকে প্রবুদ্ধ করিতে থাকে। কিন্তু তখন সে ভ্রান্ত হতভাগ্য স্বপ্নের ঘোরে সর্প দংশনের ভয়ে ভীত হইয়া রোদন করিতে ক্ষান্ত হয় না। পার্শ্বস্থ ব্যক্তি তাহাকে তখন সজোরে ধাক্কা দিতে থাকে। তখন সেই ভ্রান্ত ব্যক্তি জাগ্রত হইয়া আপনার ভ্রম বুঝিতে পারে! তখন সে বলে—"ওঃ! কি ভ্রম! আমি মিছা স্বপ্নের ঘোরে কেন এমন কষ্ট এতো যন্ত্রণা বৃথা ভোগ করিলাম! এতো সকলই মিছা ভ্রমের কুহক ছাড়া আর কিছুই নয়!" তেমনই সৎগুরুর কৃপায় যে ভাগ্যবান তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে সে জানিতে পারে এ সংসার প্রপঞ্চ মিথ্যা মায়া-

পরিকল্পিত। এই মায়া ভ্রমের মধ্যে কেবল একমাত্র সার সত্য —আমি—আমারই এই আত্মা।” এই আত্মাই অখণ্ড পূর্ণরূপে সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থলে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়াই ভাগ্যবান শিষ্য কৃতকৃতার্থ হইয়া যায়।

আচার্য্য এইরূপে বহুবিধ উপদেশ রত্নাবলী শিষ্যগণকে প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের দেহ পবিত্র, জন্ম ধন্য ও জীবন কৃতার্থ করিলেন। উপদেশ প্রদানান্তর তিনি তুষ্টীম্ভাব অবলম্বন করিয়া মৌন হইলেন। অদূরে পর্ব্বত প্রান্ত হইতে অহিরাজ বিনির্গত হইয়া আচার্য্য দেবের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হইয়া করযোড়ে বিনীতকণ্ঠে কহিতে লাগিল :— "দেব! আজি আপনাকে চক্ষে দর্শন করিয়া পরম ধন্য হইলাম। প্রভো, আমায় কৃপা করিয়া উদ্ধার করুণ। আমি আপনার পরম তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ অপূর্ব্ব উপদেশ সমূহ শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। যে ভাগ্যবান আপনার শ্রীমুখে তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ মহাবাক্য শ্রবণ করে, সে তৎক্ষণাৎ সর্ব্ববিধ ভবরোগ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া থাকে। আমার বহু জন্মের সুকৃতি সৌভাগ্য ফলে আপনি আমার এই স্থানে পদার্পণ করিয়াছেন। প্রভো, কৃপা করিয়া আমায় পদতরণীতে আশ্রয়দান করুণ। আমি আপনার কৃপায় দুস্তর ভবসমুদ্র হইতে উদ্ধার লাভ করি। এই ভবসাগরে নিপতিত হইয়া কোটী কোটি জীবকুল কখন নিমর্জ্জিত হইতেছে, কখন উঠিতেছে, কখন ভাসিতেছে। অহো! তাহারা কি দুর্ভাগ্য! তাহারা প্রকৃত দুঃখকে সুখ বলিয়া আর প্রকৃত

সুখকে দুঃখ বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে। তাহারা প্রকৃত সত্যকে মিথ্যা আর যথার্থ মিথ্যাকে যথার্থ সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়া থাকে। কেন তাহাদের এ ভ্রম—এ দুর্ম্মতি ? কে এ ভ্রম দুর্ম্মতির কঠিন ডোরে বন্ধন করিয়া হতভাগ্য জীবকুলকে ভীষণ সংসার সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল ? ইহা কি তাহাদের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ফল ? কিন্তু ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক এসকল দুচ্ছেদ্য বন্ধনের হেতুই বা কে—আর মূল কারণই বা কি ? লোকে প্রসিদ্ধ বাক্য এই যে কর্ম্মজনিত পাপ পুণ্য হইতে জীবের সুখ দুঃখাদি ভোগাভোগ ও স্বর্গ নরকাদি গতি সংঘটিত হইয়া থাকে। আমরা দেখি কেহ ইহ জীবনে বিনা শ্রমে বিনা কর্ম্মে রূপ গুণ সম্পন্ন হইয়া শ্রীমান রাজার গৃহে জন্মগ্রহণ করে। আবার কেহ ইহকালে কোন কর্ম্ম না করিয়াই অতি দরিদ্র ইতরের গৃহে অন্ধ খঞ্জ বা মূক হইয়া জন্মলাভ করিয়া থাকে। ইহা অতি গুহ্য রহস্য। এসকল রহস্য জ্ঞানান্ধ জীব কিছুতেই উদ্ভেদ করিতে পারে না। মোহ অজ্ঞান হইতেই প্রকৃত পক্ষে এই প্রহেলিকাময় রহস্যের উদ্ভব হইয়া থাকে। আপনার উপদেশ বাক্য যে ভাগ্যবানের হৃদয়ে প্রবেশ করে, কেবল সেই বুঝিতে পারে যে বাহ্য সুখ দুঃখ বাহ্য ভোগাভোগ, জন্ম কর্ম্মাদি সবই অলীক মায়া-বিজৃম্ভিত। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সেই মায়ার বিধ্বংশ হইলে মানব দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া থাকে। তখন সে আপনার স্বরূপ বুঝিতে পারে। ভ্রম দৃষ্টি বশত শুক্তিতে মুক্তা ভ্রম হইয়া থাকে। ভ্রান্তজন মনে করে দৃষ্ট পদার্থ সামান্য শুক্তি নহে—উহা মহা মূল্যবান সমুজ্জল



মুক্তা। কিন্তু যখন ভ্রান্ত দৃষ্টি ঘুচিয়া যায়, তখন ভ্রমান্ধ জন জানিতে পারে যে সে শুক্তিকেই যথার্থ মুক্তা বলিয়া মনে করিয়াছিল। উহা কিন্তু প্রকৃত মুক্তা নহে, সামান্য শুক্তি মাত্র। সেই মায়াবদ্ধ জীব ভ্রম-কল্পনা বশে এই মিথ্যা বিশ্ব সংসারকে প্রকৃত সার সত্য বলিয়া মনে করে। সেই ভ্রমেরচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া জীব অনাদি অনন্ত কাল ভোগের দাসত্ব করিয়া জীবন অতিবাহিত করে। অবশেষে কোন জন্মে—কোন জীবনে যদি সুকৃতি সৌভাগ্যের ফলে সংগুরু লাভ করিতে সমর্থ হয়, তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয়, তবে সংগুরু সেই ভাগ্যবান শিষ্যকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া তাহাকে ধন্য করেন। তাহারই ফলে সে আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া, আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মবিৎ হয়। 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম ভবতি' এই মহাবাক্যের সাধনায় সে সিদ্ধি লাভ করিয়া মনুষ্য জন্মের—মানব দেহ ধারণের—মানবজন্ম লাভের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকে। এই অবস্থায় মানবের জীবন জন্ম সফল হইয়া থাকে। দেব আপনি জগৎগুরু। জগতের উদ্ধারের জন্য—পতিত পরিতপ্ত সংসারের পাপ তাপ, অজ্ঞান-আঁধার দূরীকরণের জন্য—আপনি ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মহা ভাগ্যবান যে সেই আপনাকে চিনিতে পারে—সেই আপনার নিগূঢ় স্বরূপ জানিতে পারে। যথার্থই আজি আমার পরম সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে। সেই পরম সৌভাগ্যের ফলেই আপনার পরম পূজ্য মহা আরাধ্য পাদপদ্ম দর্শনে সমর্থ হইলাম—তাহারই ফলে

আপনার প্রদত্ত মহা সত্যের আধার স্বরূপ গুহ্যাদপি গুহ্য পরম জ্ঞান পূর্ণ তত্ত্ব উপদেশ সমূহ স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া ইহ জীবনে ইহ কালেই কৃত কৃতার্থ হইলাম। প্রভো, আমায় যখন দয়া করিয়া দর্শন দান করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই বুঝিতেছি যে আমার দুর্দ্দশা বিমোচনের জন্য, আমাকে বিষম পাপ-যোনি হইতে উদ্ধার করিবার জন্য এস্থলে আবির্ভূত হইয়াছেন। নতুবা এস্থান অতি মনোহর হইলেও লোকালয় বা জনপদাদি হইতে বহুদূরে সংস্থিত। এস্থলে কখন যে কোন মানব ভ্রমেও আগমন করে ইহাও যেন স্বপ্নাতীত ব্যাপার। যাহা হউক আমারই কোন অজ্ঞাত জন্মের সুকৃতি ফলে অধমের উদ্ধার সাধন উদ্দেশেই এখানে আপনি আবির্ভূত হইয়াছেন। এক্ষণে কৃপা করিয়া আমার পরিত্রাণের পথ প্রদর্শন করুন। অথবা তাহাই বা আর কেন প্রার্থনা করিব? যখন স্বর্গের দেবগণও আপনার দর্শনে কৃতার্থ হন—মহা মুক্তির পথ সহজে লাভ করিতে পারেন এবং আপনার দর্শনে যখন স্থাবর জঙ্গম হইতে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত পরম নির্ব্বাণ মুক্তির অধিকারী হইয়া থাকে, তখন আমি সচক্ষে আপনাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া কেননা সকল বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইব?

এই বলিয়া অহিরাজ আচার্য্যদেবের চরণ তলে নিপতিত হইয়া অনুতাপ অশ্রুতে ধরাতল পরিসিক্ত করিতে লাগিল। পরম কারুনিক ভগবান মধুর বাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—"উঠ, তোমার কোন চিন্তা নাই। যখন তোমার

হৃদয়ে বিবেক বুদ্ধির সঞ্চার হইয়াছে, তখন অবশ্যই তুমি পরম জ্ঞানের পন্থা পরিদর্শন করিতে পারিবে। এক্ষণে বল তুমি কে? কি কারণে তোমার এ অধোপতন ও দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে?"

আচার্য্যদেবের করুণ-বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া অহিরাজ উত্থিত হইল ও আনুপূর্ব্বিক আপন কাহিনী কহিতে লাগিল,—"প্রভো, আমি জানিনা কি সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বশত পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছি। সেই শক্তিবলে সকল কথা স্মরণে আনিয়া আপনাকে কহিতেছি। আপনি পরম করুণা নিধান। কৃপা করিয়া আমার পতনের কারণ আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া এ অধমকে উদ্ধার করুন।

আমি পূর্ব্ব জন্মে পরম ঐশ্বর্য্যবান মহাশক্তি সম্পন্ন এক রাজ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। ঐ কুল, সন্নিষ্ঠা ও সদাচার এবং সৎ ও শুভ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান জন্য লোক-সমাজে সুবিখ্যাত হইয়াছিল। সাধু ও সত্যদর্শী ব্রহ্মজ্ঞগণ ঐ কুলের নরপতিগণের রাজসভা সর্ব্বদা অলঙ্কৃত করিয়া রাখিতেন। শিষ্ট প্রজাগণের পরিপালন ও রঞ্জন এবং দুষ্ট ব্যক্তিবর্গকে দমন করা ঐ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজনীতি ছিল। রাজকীয় সকল কার্য্যকলাপ উপযুক্ত জ্ঞানবান কর্ম্মচারী দ্বারা সম্পাদিত হইত। প্রকৃত সূক্ষ্মদর্শী মন্ত্রণা কুশল মন্ত্রীগণ রাজগণের শাসন-যন্ত্র পরিচালনা করিতেন। বিচার-অভিজ্ঞ ন্যায়বান সত্যনিষ্ঠ প্রাড়বিবাকগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মাধিকরণের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণভাবে সংরক্ষিত হইত। এ হত ভাগ্য সেই পরম পবিত্র রাজকুলে, কোন পুণ্য-ফলে জন্মগ্রহণ করিয়া

পরম ঐশ্বর্য্যশালী রাজপদ লাভ করিয়াছিল এবং অভাবনীয় রাজভোগ উপভোগ করিতেছিল। এ'হতভাগ্য কিছুকাল রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত রহিয়া কুলক্রমাগত ও আচরিত ক্রিয়াকলাপ ও কৌলিক বিধান অনুসারে ন্যায় ও সত্য পন্থায় শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিল। প্রজাকুল, কর্ম্মচারীবৃন্দ সকলেই প্রথম অবস্থায় আমার কার্য্যকলাপ ও মতিগতি পরিদর্শন করিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছিল। এইরূপ পরম সুখের অবস্থায় কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, একদা কতিপয় দুর্ম্মতি নাস্তিক শূন্যবাদী বৌদ্ধ আসিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইল। আমি চিরদিন এমন কি বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মসম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিতে বিশেষ উৎসুক ও অভ্যস্ত ছিলাম। কোন ধর্ম্মের কোন আচার্য্য বা উপযুক্ত ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইলেই, আমি তাঁহার সহিত ধর্ম্মবিচারে প্রবৃত্ত হইতাম। অনেক 'সময় অনেককে ধর্ম্মবিচারে পরাজিত করিয়া, পরম আনন্দ উপভোগ করিতাম। এইরূপ বহু ব্যাপারে বহুবার জয়লাভ করিয়া আমার তর্ক-সংগ্রামে বিশেষ উৎসাহ ও অভ্যাস ক্রমে বিলক্ষণরূপে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। বৌদ্ধ নাস্তিকগণ রাজসভায় উপস্থিত হইলে আমি তাঁহাদিগের সহিত তর্কসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতাম। বিচার-ব্যাপারে কোন সত্য নির্দ্ধারণ বা সত্য মিমাংসা কিছুই হইত না। তজ্জন্য কোন পক্ষই জয়লাভ করিতে সমর্থ হইত না।

যাহা হউক এই সময় হইতে আমি ধর্ম্মসম্বন্ধে কেমন সন্দিহান হইয়া উঠিলাম। ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ও তাঁহার বিধান

কার্য্য সম্বন্ধে,—নানাপ্রকার বিপরীত ভাব আমার মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম বাস্তবিক এ জগৎই বা কেন—এ জীবকুলই বা কেন? কে ইহাদের সৃজন করিল—আর কেনই বা করিল? এই যে জীবকুল জ্বলন্ত সংসার কটাহে নিয়ত নিপতিত হইয়া—পরিদহ্যমান হইতেছে, ইহার কারণ কি? কে ইহাদিগকে এইভাবে সৃজন করিয়া এমন স্থানে পাঠাইল? জগতে কত লোক অন্নহীন বস্ত্রহীন হইয়া অনশনে জীবনযাপন করিতেছে। শাস্ত্রদর্শীগণ বলেন, পূর্ব্বজন্মের বা ইহজন্মের উৎকট পাপের জন্য তাহাদের এই দুঃখ দুর্দ্দশা। কিন্তু তাহারাই বা পাপ করে কেন? আর ভাগ্যবান যাহারা তাহারাই বা পূণ্য করে কেন? আর এ সংসারে পাপতাপ আনিল কে? এ সকল প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? এইরূপ নানা ভাবের নানা চিন্তা নানা কথা আমার মনে উদয় হইত। সে সকল প্রশ্নের কোন সৎ উত্তর বা সুন্দর মীমাংসা নিজ বুদ্ধি বা যুক্তি দ্বারা কিছুই স্থির করিতে পারিতাম না। উপযুক্ত আচার্য্যগণের নিকট অনুসন্ধিৎসু হইয়া জিজ্ঞাসা করিতাম। তাঁহারা বলিতেন মানব জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র। মানব, বুদ্ধি বা যুক্তি বা চিন্তা দ্বারা এ সকল কথার কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারে না। কেবল সাধনা বলে যাহারা ভগবানের কৃপাপাত্র হন তাঁহারাই এ সকল অতি কঠিন তত্ত্বের মীমাংসা করিতে পারেন। সাধনা ভিন্ন ধ্যান ব্যতীত উচ্চ চিন্তা উচ্চ ধারণার অধিকার জন্মে না। সে অধিকার না জন্মিলে, সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধির অতীত অমানুষিক

ব্যাপারের সন্ধান, মানব কখনই লাভ করিতে পারে না। সে সকল ব্যাপার, সাধারণ জড়জগতের অতীত। কোন ক্রিয়ার মূল কারণ কি? এ প্রশ্নের মীমাংসা স্থূল জড় ব্যাপারেও মানব যখন করিতে পারে না, তখন বুদ্ধি চিন্তার অতীত প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সে কি বুঝিতে পারে—কি সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে? সাধারণ মানবের সাধারণ বুদ্ধি নিতান্তই স্থূল, অতীব সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ। তাহার পক্ষে এ সকল প্রশ্নের জিজ্ঞাসাই বাতুলতা—মীমাংসা নির্দ্ধারণ তো বহুদূরের কথা। আচার্য্যগণ এইরূপ নানা কথায় আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন। শাস্ত্রে ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস সম্বন্ধে ও আস্তিক্য বুদ্ধির প্রচুর প্রশংসা করিয়া তাহার সফলতা ও সারবত্তা সম্বন্ধে বহুপ্রকার বহু উপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু বল্গাবিহীন অশ্বের ন্যায়, সারথীবিহীন রথের ন্যায় ও কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় আমার অসংযত চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া, কুচিন্তাস্রোতে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সিদ্ধ আচার্য্যগণের অমৃতোপম উপদেশসমূহ আমার পাপতাপ পরিতপ্ত প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারিল না। আমি যতই কুচিন্তার প্রবল স্রোতে ভাসিতে লাগিলাম, ততই আমার পরিদুষ্ট নাস্তিক্য বুদ্ধি বিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আমি অবশেষে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মবুদ্ধি-বিবর্জ্জিত ঘোর নাস্তিক হইয়া উঠিলাম। আমি বংশগত পরম পবিত্র সনাতন বৈদিক ধর্ম্মানুগত কুলধর্ম্ম, কুলপ্রথা পরিত্যাগ করিলাম। তৎপরিবর্ত্তে বিকট নাস্তিক চার্ব্বাক পন্থার পন্থী হইয়া উঠিলাম। অধ্যাত্ম-তত্ব যে ঘোর তমসাচ্ছন্ন

বা নিতান্তই অসার কাল্পনিক ব্যাপার ইহাই আমার হৃদয়ে দৃঢ়-রূপে বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইল। তখন বুঝিলাম এ জীবনটা কিছুই নয়। ইহার ধর্ম্ম কর্ম্মাদি সাধনা ক্রিয়াকলাপ সকলই বৃথা সকলই অসার মিথ্যা। এ জীবনের একমাত্র সার সামগ্রী কেবল ভোগ—ইন্দ্রিয়-ভোগ—সুখ সম্পদ উপভোগ। এই জ্ঞান এই ভাব, এই ধারণার উদয় হইলে দুর্ম্মতি মানবের যে অধোপতন ও শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটে—যাহা তাহার অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য পরিণতি—আমারও সেই অধোপতন—সেই পরিণতি সংঘটিত হইল। আমি ইন্দ্রিয়ের দাস—রমণীর ক্রীড়া-পুত্তলি হইয়া উঠিলাম। কেবল বিলাস-সম্ভোগ আমার জীবনের চরম উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। সর্ব্ববিধ সদাচার ও শুভক্রিয়াদির অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলাম। প্রজাপালন, প্রজারঞ্জনাদি যে শ্রেষ্ঠ রাজধর্ম্ম তাহা একেবারেই বিস্মৃত হইলাম। রমণীগণের ক্রীড়া পুত্তলি হইয়া পরমানন্দে প্রমোদ উদ্যানে, কখন বা প্রমোদ সরোবরে তরণী বিহারে, আবার কখন বা সুসজ্জিত কৃত্রিম শোভায় পরিশোভিত কুঞ্জবনে অলঙ্কার-ভূষিতা সুন্দরীগণকে লইয়া বিহার-ব্যপদেশে দিবা রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। কলা-বিদ্যার মধ্যে অশ্লীল গীতবাদ্যাদির আলোচনায় পরম উল্লাস উপভোগ করিতে অভ্যস্ত হইলাম। পূর্ব্বে যেমন শ্রেষ্ঠ বিদ্যার অনুশীলনে বা গভীর গবেষণার অনুসরণে মহা আনন্দলাভ করিতাম এখন তাহার পরিবর্ত্তে কেবল কুসঙ্গ ও অশ্লীল গীত ও কথোপকথন শ্রবণে বড়ই সুখ অনুভব করিতে

লাগিলাম। যে সকল কার্য্যকলাপ বা সঙ্গ প্রসঙ্গ অতি অপবিত্র ও হেয় বলিয়া ঘৃণা করিতাম—এমন কি যাহা নিম্ন শ্রেণীর প্রজাগণের মধ্যেও আলোচনা করিবার জন্য কোনরূপ প্রশ্রয় বা উৎসাহ দান করিতাম না, বরং দণ্ডনীয় বলিয়া ঘোষণা করিতাম সেই সকল কদাচার কুনীতি নিজেই অনুষ্ঠান করিতে লাগিলাম। বিচক্ষণ সচিবগণ আমাকে সুপথে আনিবার জন্য, যাহাতে আমার পূর্ব্বভাব পূর্ব্ব আচার নিষ্ঠা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তৎপক্ষে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই সুপণ্ডিত ও সদাশয় ছিলেন। আমার নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি ও দুর্ভাগ্য বশত তাঁহাদের সৎপরামর্শ ও শুভ চেষ্টা তৎকালে আমার পক্ষে বিকট বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। আমি তাঁহাদিগকে বৈরীর ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলাম। তাঁহারা সকলেই আমার পরম হিতৈষী কল্যাণ-আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। আমি যখন তাঁহাদিগকে অত্যন্ত অবহেলা করিলাম-ও তাঁহাদের উপদেশ ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করিতে লাগিলাম, তখন তাঁহারা হতাশ হইলেন। তথাপি তাঁহারা আমাকে পরিত্যাগ করিলেন না। পরম আত্মীয় সুহৃদের ন্যায় আমার মঙ্গল কামনায় নানাবিধ কৌশল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অবলম্বন করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদের এবম্বিধ হিত চেষ্টায় ও শুভজনক কার্য্যকলাপে অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম। অবশেষে একদিন ক্রোধ পরবশ হইয়া তাঁহাদের সকলকে রাজ-সংসার হইতে বিতাড়িত করিলাম। তাঁহারা প্রস্থান করিলে কতকগুলি নীচমনা চাটুকর

আসিয়া তাঁহাদের দায়ীত্বপূর্ণ গুরুভারাক্রান্ত পদসমূহ অধিকার করিল। আমার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। আমার দেহ কলুষিত ও মতি গতি অতীব নিন্দনীয় হইয়া উঠিল। সদাশয় সাধু সজ্জনগণ আমার সঙ্গ ও সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন। অসচ্চরিত্র হীনমতি নীচ ব্যক্তিগণ আমার নিত্যসঙ্গী ও অনুচর হইয়া দাঁড়াইল। আমার শোচনীয় অধোপতন চরমসীমায় উপনীত হইল।

এমন অবস্থায় একদা এক মহা তেজস্বী সাধুপুরুষ কৃপা করিয়া আমার পাপ-ভবনে পদার্পণ করিলেন। পূর্ব্বে এমন সাধু মহাপুরুষ আমার আলয়ে আগমন করিলে আমি আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতাম। নিজে অভ্যুত্থান করিয়া পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতাম। স্বহস্তে তাঁহাদিগকে সেবা সুশ্রুষা করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতাম। কিন্তু কি অভাবনীয় আশ্চয্য পরিবর্ত্তন! কুসঙ্গ ও কদাচারের এমনই বিষম বিকট ফল! আমি সেই তেজস্বী মহাপুরুষকে এখন আর তেমন সমাদরে অভ্যর্থনা করিলাম না। বরং তৎ-পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতি অবহেলার ভাব প্রদর্শন করিলাম। আমার অনুচরবর্গ নানাভাবে তাঁহাকে ব্যঙ্গভাবে উপহাস করিতে লাগিল। হতভাগ্য আমিও সেই সকল দুষ্টমতি অনুচরবর্গের সাহিত যোগদান করিয়া সেই মহাপুরুষকে 'ভণ্ড' 'ধর্ম্মধ্বজী' প্রভৃতি নানা প্রকার কুৎসিত ব্যঙ্গবাক্যে অপমান করিলাম। অবশেষে তিনি কুপিত হইলেন। তাঁহার দেহ

কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার আরক্তিম চক্ষুদ্বয় হইতে যেন ক্রোধাগ্নি ধক ধক প্রজ্জলিত হইয়া পাপ সংসারকে বিদগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইল। তিনি বজ্র নির্ঘোষে আমাকে অভিসম্পাত করিয়া কহিলেন,—"রে অন্ধ অধম মূঢ়, তুই আমায় চিনিতে পারিলি না? আমি তোর পিতার ও তোর বংশের পরম হিতৈষী ছিলাম। তোর অধোপতনের সংবাদ শ্রবণ করিয়া সন্তপ্ত হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম তোর গৃহে পদার্পণ করিয়া তোকে সৎ উপদেশ প্রদান করিব। যাহাতে কুপথ হইতে তোর মতিগতি পরিবর্ত্তিত হয়, তার উপায় বিধানের চেষ্টা করিব। কিন্তু বুঝিলাম তুই নিতান্তই হতভাগ্য; তোর উদ্ধারের উপায় সুদূরপরাহত। তুই এমনই তমসাচ্ছন্ন পাপকূপে নিপতিত হইয়াছিস যে পাপ পুণ্য হিতাহিত বোধ হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিভ্রষ্ট হইয়াছিস। তোর মতি গতি যেরূপ পাপাসক্ত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিলাম তুই আর এখন পবিত্র রাজকুলে বা রাজপদে অবস্থান করিবার উপযুক্ত কখনই হইতে পারিস না। এমন কি তুই আর নরজীবন বা নরদেহ ধারণেরও উপযুক্ত পাত্র নহিস। তুই অতি দুষ্ট যোনিতে জন্মিবার পাত্র হইয়াছিস। অতএব তুই সত্বর এই স্থান এইরূপ ও বংশ মর্য্যাদা হইতে বিচ্যুত হইয়া নীচ মহিকুলে জন্মগ্রহণ কর। সেই কুলই তোর উপযুক্ত স্থান।"

মহাপুরুষের বাক্যে আমার অন্তরাত্মা ভয়ে থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। আমি তাঁহার চক্ষুপানে চাহিতে পারিলাম

না। কিছুক্ষণের জন্য আমার বদন হইতে বাক্য স্ফুরণের শক্তি তিরোহিত হইল। আমি নির্ব্বাক স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। কি করিব বা কি কহিব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কিয়ৎকাল পরে কথঞ্চিত শান্ত ও প্রকৃতিস্থ হইয়া সেই মহা পুরুষের পদতলে নিপতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম। ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলাম—প্রভো আমায় কৃপা করিয়া ক্ষমা করুন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার বিষম মতিভ্রম ঘটিয়াছিল। তাহারই ফলে আমার শোচনীয় অধঃপতন। যাহাহউক আমার প্রতি আপনার ক্রোধ আমার দুর্ভাগ্য নহে। আপনার ক্রোধ আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য ও মহা মঙ্গলের নিদান স্বরূপ। আপনার ক্রোধাগ্নিতে আমার সমুদয় পাপ তাপ আজি ভস্মীভূত হইল। মহাজন গণের অভিশাপ পাপীগণের উদ্ধার-দণ্ড স্বরূপ। পাপ-প্রবাহের ঘোর সঙ্কট অবস্থায় সেই মহা দণ্ড অবলম্বন করিয়া তাহারা উদ্ধার লাভ করে। এই সংসার প্রজ্বলিত অনলের উপরিস্থিত কটাহ স্বরূপ। জীবকুল বহুকাল ধরিয়া সেই উত্তপ্ত কটাহে দগ্ধীভূত হইতে থাকে। সে দহনের উদ্দেশ্য কি? পাপ তাপকে ভস্মীভূত করিয়া, বিশুদ্ধি লাভই সে দহনের উদ্দেশ্য। নতুবা এ জগতে বা কেন---এই জীবকুলের অস্তিত্বই বা কি জন্য? আর তাহাদের বারম্বার এই জন্ম জরাদি দুঃখ যন্ত্রণার ভোগাভোগই বা কি হেতু? এই সকল কার্য্য পরম্পরার কারণ সংশোধন। আর সেই সংশোধন দ্বারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎকর্ষ ও উন্নতি

সাধন ব্যতীত আর তো কিছুই হইতে পারে না। যদি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কেহ সৃষ্টি কর্ত্তা থাকেন এবং সেই সৃষ্টিকর্ত্তা যদি পরম মঙ্গলময়, জগতের জীবের হিতৈষী সুহৃদ হন, তবে অবশ্যই বলিতে হইবে পরিণামে মঙ্গল ও উন্নতি সাধনই সকল কার্য্য, সকল ঘটনার চরম উদ্দেশ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেননা জগতের ও জীবকুলের যদি কেহ কর্ত্তা না থাকিত, তবে ইহাদের ধ্বংস বা বিশৃঙ্খলা নিতান্তই অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য হইয়া উঠিত। মঙ্গল উন্নতি সকল ব্যাপারের—সকল কার্য্যের —সকল ঘটনার চরম ফল। আপনাদের ন্যায় সাধু মহাজন গণের ক্রোধও—সেই উৎকর্ষণ-যজ্ঞাগ্নিতে ইন্ধন প্রদান ব্যতীত আর কিছুই নহে।”

সাধু মহাজন, অতি ধীর ভাবে আমার কথা গুলি শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তিনি হৃষ্ট মনে প্রশান্ত বচনে কহিলেন,—“অহিরাজ, আমি তোমার পিতৃ বন্ধু। তোমার পিতাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতাম। সর্ব্বদা তাহার কুশল ইচ্ছা করিয়া ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতাম। আমি যখন তোমাদের রাজপ্রসাদে যাতায়াত করিতাম তখন তুমি ক্ষুদ্র বালক ছিলে। আমি বহুকাল হইল তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। তজ্জন্য তোমাদিগের আলয়ে আগমন করিতে পারি নাই। বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া যখন আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলাম তখন শুনিলাম তোমার পিতা আর ইহ লোকে নাই। তাঁহার মৃত্যু সংবাদে আমার শোক সিন্ধু

উথলিয়া উঠিল। তিনি যথার্থই আমার পরম প্রণয়-আস্পদ ছিলেন। আমি আরও শুনিলাম তাঁহার মৃত্যুর পর তুমি কিছুকাল সুশীল সচ্চরিত্র-অবস্থায় থাকিয়া সুন্দররূপে প্রজাশাসন করিয়াছিলে। তৎপরে নাস্তিক বৌদ্ধগণের কুহক-চক্রে নিপতিত হইয়া তোমার ভাবগতি সকলই পরিবর্ত্তিত হয় ও তুমি কুল-ধর্ম্মত্যাগ করিয়া নিতান্ত অসৎ-পথ অবলম্বন করিয়াছ। তাই তোমার হিত কামনায়—যাহাতে তোমার মতিগতি পরিবর্ত্তিত হয়—যাহাতে তুমি আবার ধর্ম্মপথে পরিচালিত হইতে পার—সেই জন্য তোমার আলয়ে আগমন করিয়াছি। তোমার দুর্ম্মতি ও দুর্গতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সত্যই আমি নিতান্ত বিষাদগ্রস্ত ও হতাশ হইয়াছিলাম। তোমার আচার ব্যবহারে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছি। যাহা হউক সে অভিশাপ তোমার পক্ষে মঙ্গলজনকই হইয়াছে। তবে আপাতত কিছুকাল তোমার নীচ যোনিতে অবস্থিতি করিতে হইবে। আমার প্রসাদে তুমি যতকাল নীচ যোনিতে অবস্থিতি করিবে, ততকাল আর সুপন্থা হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে না অথবা সৎ চিন্তা, সদাশয়তা আর কখনই পরিত্যাগ করিবে না।"

তাঁহার কথায় আমার অনুতাপ-অনল আরও বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলাম—"প্রভো! আমি তো অধোপতিত হইয়া অতি শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হইলাম। এ অবস্থায় তো কিছুতেই বহুকাল কাটাইতে পারিব

না। কারণ সকল দুঃখ, সকল কষ্ট সহিতে পারা যায়; কিন্তু নীচ জনের সংসর্গ সহ্য করা বড়ই কষ্টকর। সংসারে যত প্রকার পাপ আছে তন্মধ্যে নীচ জনের সংসর্গ অপেক্ষা পাপ আর কিছুই নাই, আর মহৎ জনের সংসঙ্গ অপেক্ষা পুণ্যও আর কিছুই হইতে পারে না। তাই বলি, দেব আমায় কৃপা করিয়া অন্য যে কোন দণ্ড প্রদান করুন; কিন্তু নীচ সংসর্গ হইতে সত্বর উদ্ধার লাভের উপায় বিধান করুন। আপনারা সদাই সত্যভাষী। আপনার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে। আপনার অভিশাপ-বাক্য অনুসারে আমাকে নীচ সংসর্গে কিছুকাল অবশ্যই অবস্থিতি করিতে হইবে। কিন্তু দেব, দয়া করুন; যাহাতে সত্বর উদ্ধার লাভ করিতে সমর্থ হই, তাহার উপায় বিধান করুন। বলুন কতদিনে এ হতভাগ্য অধম, নীচ সংসর্গ হইতে উদ্ধার লাভ করিবে।"

সাধু মহাত্মা আমার অবস্থায় নিতান্ত বিষণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার বাক্য ব্রহ্মবাক্য—অলঙ্ঘনীয়। তোমাকে অবশ্যই কিছুকালের জন্য নীচকুলে অবস্থিতি করিতেই হইবে। তৎপরে মহাপুরুষ শিব-অবতার যখন তোমার সন্নিধানে উপস্থিত হইবেন, তখনই তুমি মুক্তি লাভ করিবে।" এই বলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মহাপুরুষ প্রস্থান করিলেন। কিছুদিনেই আমার অন্তিম দশা উপস্থিত হইল। মৃত্যুর পর এই দশায় নিপতিত হইয়াছি। এক্ষণে আমার বহুজন্মের বহু ভাগ্যফলে আপনি এখানে উপস্থিত

হইয়াছেন। ইহা কেবল আমার প্রতি করুণা প্রদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমাকে দয়া করিয়া উদ্ধার করিবার জন্যই আপনার এস্থলে আগমন। নতুবা এমন স্থানে অতি নিকৃষ্ট মানব ভ্রমেও আগমন করে না। যাহা হউক যখন এ অধম হতভাগ্যের সৌভাগ্য ফলে, এস্থলে আপনার আবির্ভাব হইয়াছে এবং এ হতভাগ্য আপনার দর্শন লাভে সমর্থ হইয়াছে, তখন আমার উদ্ধারের উপায় বিধান করুন।"

এই বলিয়া প্রভূত অনুতাপ-অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে অহিরাজ আচার্য্য শঙ্করের পদতলে নিপতিত হইল। আচার্য্য দেব দিব্য নেত্রে তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিলেন। অহিরাজ উদ্ধার লাভ করিল। দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া অহিরাজ শঙ্করের স্তব করিতে আরম্ভ করিল। করযোড়ে, কাতরকণ্ঠে অহিরাজ কহিতে লাগিল—"প্রভো, বহু সৌভাগ্যে বহু জন্মের পুণ্য ফলে জীবের অদৃষ্টে আপনার দর্শন লাভ ঘটিয়া থাকে। আপনি যাহাকে দর্শন দান করেন—আপনি কৃপা করিয়া যাহাকে তত্ত্ব উপদেশ প্রদান করেন—সে ভাগ্যবান মহামুক্তি লাভ করিয়া জন্ম জরা ও মরণের হস্ত হইতে চিরতরে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া ধন্য কৃতার্থ হয়। তত্ত্বমসি শব্দের যথার্থ জ্ঞান ও তাহার স্বরূপবোধ কেবল আপনারই কৃপা ফলে লাভ করিয়া জীব ইহ জীবনেই, মহামুক্তির অধিকারী হইয়া থাকে। এক্ষণে ঘোর কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে। এই যুগে সনাতন ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া বহুবিধ তামসিক ও পৈশাচিক ভ্রান্ত ধর্ম্মের আড়ম্বর ও ভাব

সংঘটিত হইয়াছে। যাহারা প্রকৃত তত্ত্ব ধর্ম্মের উপাসনা করে, তাহারাও ধর্ম্মধ্বজী হইয়া সৎ ও সাধু সমাজকে উৎসাদিত করিতেছে। প্রকৃত জ্ঞান হীন ভক্তি হীন ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া পাষণ্ডগণ উন্মার্গগামী হইয়া উঠিতেছে। একদিকে নিরীশ্বরবাদের প্রচণ্ড প্রতাপে সমাজ ধর্ম্মহীন নীতিহীন হইয়া কদাচারের আলয় হইয়াছে। অপরদিকে কুতন্ত্রের দণ্ড ধারণ করিয়া ভণ্ড কাপালিক আদি সম্প্রদায়, বিশুদ্ধ সমাজকে অতি বিকট ভাবে কলুষিত করিয়া তুলিতেছে। বড় বিষম সঙ্কটের কাল উপস্থিত হইয়াছে। ধর্ম্মের যে কি ভীষণ গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে তাহা আপনি স্বয়ং ভগবান নিশ্চয়ই জানিতেছেন এবং বুঝিতেছেন। ধর্ম্মই সমাজকে উন্নত করে—ধর্ম্মই জীব কুলের উৎকর্ষ সাধন করে। ধর্ম্ম স্থাপন—ধর্ম্মের বিকাশ বিবর্দ্ধনই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার হেতু। সেই সৎ ও শুভ ধর্ম্মের মালিন্য গ্লানি সংঘটিত হইলে, ভগবানের আসন কখনই স্থির থাকিতে পারে না। ভগবান তখনই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া অসৎ অপবিত্র ধর্ম্মের মূলোৎপাটন করিয়া কল্যাণময় সত্য ধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠা করেন। আপনি ভগবানের অবতার। অধর্ম্মের বিনাশ ও ধর্ম্মের সংস্থাপন জন্যই আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

আচার্য্য দেবের অপর জনৈক শিষ্য কহিলেন—অহিরাজ পূর্ব্ব জন্মে তুমি অতি মহৎ ও পরম পবিত্র সৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। জন্মান্তরীন সুকর্ম্মফলে তুমি সৎ পিতা ও দেবী জননীর অংশে সমুদ্ভূত হইয়াছিলে। তুমি নিশ্চয়ই ধর্ম্মের গুঢ়তত্ত্ব কিছু

কিছু অবশ্যই বুঝিতে সমর্থ। সেই সামর্থ্য সৌভাগ্যের ফলে তুমি মহাপুরুষের দর্শনলাভ করিলে। এক্ষণে ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি এবং সে সম্বন্ধে আরও জানিবার ও বুঝিবার কি আছে তাহা অকপটে পরিব্যক্ত কর।"

অহিরাজ কহিল,—"মহাত্মন, আমি অতি অন্ধ মূঢ়। আমি ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব জানিবই বা কি বুঝিবই বা কি? আমি নিজ জীবনে বহুকাল নাস্তিকশূন্যবাদীগণের সঙ্গলাভ করিয়া অসৎ ধর্ম্মের তত্ত্ব কিছু কিছু অধিগত করিয়াছি। তজ্জন্য আমার সৎচিন্তা ও সৎভাব তিরোহিত হইয়াছে। আমি সৎ ও শুভ ধর্ম্মের কথা কি কহিব?"

শিষ্য কহিলেন—অসৎসঙ্গ ও অসৎশিক্ষা নিবন্ধন তোমার হৃদয়ে যে সকল কুসংস্কার ও কুভাব বদ্ধমূল হইয়াছে অগ্রে তাহাদিগের মূলোৎপাটন নিতান্ত প্রয়োজন। তৎপরে তাহাদের স্থানে সৎ ও শুভভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যেমন কোন ক্ষেত্রে সুমিষ্ট সুস্বাদু ফলের বৃক্ষ রোপণ করিয়া ফললাভ করিতে হইলে, অগ্রে সেই ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে হয়। উৎকৃষ্ট রূপে কর্ষণ করিয়া সেই ক্ষেত্র হইতে কণ্টকাদি জঞ্জাল দূরীভূত করা প্রয়োজন। তৎপরে যখন সেই ক্ষেত্র সুন্দরভাবে কর্ষিত হয়, তখন তাহাতে উৎকৃষ্ট বৃক্ষের বীজ বপন করিতে হয়। সেইরূপ সৎ-ধর্ম্মের শিক্ষা বা অনুশীলন করিতে হইলে, অগ্রে হৃদয় হইতে বদ্ধমূল কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণাদি দূরীভূত করা নিতান্ত আবশ্যক। যেমন অনুর্ব্বর বা মরুময় ক্ষেত্রে অতি উৎকৃষ্ট

উপাদেয় ফলের বীজ বপন করিলে, তাহাতে কোন ফলই ফলে না, সেইরূপ তমসাচ্ছন্ন বা নীরস শুষ্ক হৃদয়ে উচ্চ মহৎ ধর্ম্মের বীজ বপন করিলে ধর্ম্মবৃক্ষ ফলবান হইতে পারে না। অতএব তোমার হৃদয়ে কুসঙ্গ ও কুশিক্ষা জনিত কিরূপ ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ কর। যদি তুমি প্রকৃত সত্য ধর্ম্মের তত্ত্বলাভ করিতে অভিলাষী হইয়া থাক, তবে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে যে ধারণা তোমার প্রাণে সঞ্চিত রহিয়াছে তাহা অকপটে পরিব্যক্ত কর।'

অহিরাজ কহিল,—"ঠাকুর, আমি নাস্তিক নিরীশ্বরধর্ম্মী ও শূন্য বাদীগণের সংস্রবে আসিবার পূর্ব্বে সত্য সনাতন ধর্ম্মে পরম অনুরাগী ও বিশ্বাসবান ছিলাম। তৎপরে যখন নাস্তিক শূন্য-বাদীগণের কুসঙ্গ লাভ করিলাম, তখন তাহারা নানাভাবে আমাকে শূন্যবাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও সারবত্তা বুঝাইতে লাগিল। তাহাদের কথিত উপদেশ অনুসারে আমি বুঝিলাম সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের ও ঈশ্বরবাদের বিশেষ কোন গুরুত্ব গৌরব নাই। একদা নাস্তিক সম্প্রদায়ের এক প্রতিভাশালী ধর্ম্ম-প্রচারককে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—মহাশয়, ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব কি? উত্তরে সেই নাস্তিক প্রচারক কহিলেন—ধর্ম্ম কথাটাই অলীক। আকাশ কুসুমের ন্যায় উহা কেবল মিথ্যা মৌখিক শব্দ মাত্র। যে ঈশ্বরকে ধরিয়া সকল ধর্ম্মের ভিত্তি সংগ্রথিত, সেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব কেহই প্রমাণ করিতে পারে না। কারণ যদি ঈশ্বর অর্থে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বুঝি, তবে তাহার মূল কিছুই ধরিতে বা বুঝিতে পারি

না। কেননা যদি বলা যায় যে এই সৃষ্টির একজন কর্ত্তা ও রক্ষক আছেন, তবে জিজ্ঞাসা জন্মে সেই সৃষ্টিকর্ত্তা কোথা হইতে কিরূপে আসিলেন? তাহাতে যদি বলা যায় যে তিনি অনাদি অনন্ত অসীম পুরুষ বিশেষ কেননা সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর বলিলেই তাঁহাকে বিশেষ পুরুষভাবে ভিন্ন অন্য কোন ভাবেই ভাবিতে পারি না। যিনি পুরুষ বিশেষ তিনি অনাদি অসীমভাবে কখনই চিন্তিত বা উপলব্ধ হইতে পারেন না। যিনি অসীম নহেন, তিনি অবশ্যই সীমাবদ্ধ। তাঁহার সীমার অতীত অপর শক্তি বিদ্যমান থাকিতে পারে। সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপক। অপর শক্তির বিদ্যমানতা কল্পনা করিলে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বব্যাপকত্ব অস্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। তাহাতে ভগবানের ভগবানত্ব ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বিলুপ্ত হয়। পক্ষান্তরে অন্য দিক দিয়া আরও এক বিচার নাস্তিকতা সম্বন্ধে চলিতে পারে। সৃষ্টি করিতে হইলে, বাসনার প্রয়োজন। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কামনার বশবর্ত্তী হইয়াই বিশ্ব সংসার সৃজন করিয়াছেন। যদি এ বিশ্ব কোন বুদ্ধিমান পুরুষ বিশেষ কর্তৃক বিরচিত বলিয়া বিবেচনা করা যায়, তবে সে পুরুষ অবশ্য ইচ্ছা করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। ইচ্ছা অভাব-পরিজ্ঞাপক। অর্থাৎ একটা কোন অভাব হইতেই ইচ্ছার উদ্ভব হইয়া থাকে। যেমন আমি ইচ্ছা করিলাম আমার এই বিষয়টী বা আমার পক্ষে এই ব্যাপারটি সংঘটিত হউক। এমন কোন ইচ্ছা আমার মনে সমুদ্ভূত হইলে বলিতে হইবে, যে সে বিষয়টি বা ব্যাপারটি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আমার

অভাব বোধ জন্মিয়াছে। তদ্রূপ সৃষ্টি সম্বন্ধে যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা হইয়াছে, তখন তৎপূর্ব্বে তাঁহার প্রাণে অভাব বোধও জন্মিয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরকে ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাদি-বিবর্জ্জিত বলিয়া ধারণা করা হয় এবং সেই রূপই তাঁহার সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি বাসনার বশবর্ত্তী সুতরাং অভাবের অধীন, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমানত্ব পূর্ণত্ব ঈশ্বরত্ব খণ্ডিত হইয়া পড়ে।' এইরূপ অনেক কথা বুঝাইয়া সেই নাস্তিক প্রমাণ দ্বারা আমার ভগবানের ধারণা বা তাঁহার পূজা অর্চ্চনাদি ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিল। তাহার যুক্তিতে আমার আস্থা জন্মিল। আমি নাস্তিকভাবাপন্ন হইয়া উঠিলাম। তাহার সম্প্রদায় আমার উপর বিশেষ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিল। আমি সনাতন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান,সদাচার ও সন্নিষ্ঠা পরিত্যাগ করিলাম। তাহাদিগেরই সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিলাম। এই চার্ব্বাক সম্প্রদায় বিলাস সম্ভোগকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য এবং সম্ভোগ-সাধনাই পরম পুরুষার্থ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল। তাহাদের কথায় উপদেশে আমার মতি গতি যেমন পরিবর্ত্তিত হইল, তাহাদের সঙ্গ ও সংস্রবে তেমনি আমার আচার ব্যবহারও অতীব মন্দ হইয়া উঠিল। এইরূপ শূন্যবাদের নাস্তিক অবস্থায় প্রাণে বিষম অশান্তি উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ এমনই অশান্তি ও অনুতাপ জ্বালায় বিদগ্ধ হইতে লাগিলাম যে সংসারের কিছুই আর আমার ভাল লাগিত না। জীবন জগৎ যেন অতি অসার শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল। সকলই যেন সত্ত্বাহীন সারত্ববিহীন বলিয়া

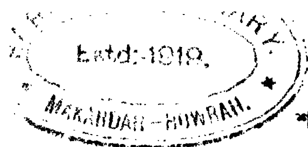
মনে করিতে লাগিলাম। কেন এ জগৎ? কেন এ জীবন,? এই ভাবনা প্রবল আগুনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া আমাকে দিবানিশি দগ্ধ করিতে লাগিল। স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয় স্বজন, বিষয় ঐশ্বর্য্য বিলাস সম্ভোগাদি সকলই বিকট বিষময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

শিষ্যপ্রবর অহিরাজের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। মৃদু হাস্যে কহিলেন,—"অহিরাজ, এইরূপই নাস্তিকতার আদিম অবস্থার বিষময় ফল। ইহা মানব আত্মার পক্ষে বড় বিষম শোচনীয় অবস্থা। এই অবস্থায় মানব নিতান্ত অসুখ ও অশান্তির দহনে বিদগ্ধ হইতে থাকে। এই অবস্থায় মানব অন্ধ পতঙ্গের গতি প্রাপ্ত হয়। অন্ধ পতঙ্গ যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিয়া তাহার প্রদীপ্ত প্রভায় বিমুগ্ধ হয় ও তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়ে অবশেষে ছটফট করিয়া পুড়িয়া মরে, মানবও সেইরূপ নাস্তিক চার্ব্বাকগণের আপাতমধুর পরিণামে বিষবৎ উপদেশ কথা শুনিয়া বিমুগ্ধ হইয়া তাহাদের মতাবলম্বী হয়। অবশেষে প্রবল স্রোতে নিপতিত অবলম্বনহীন জীবের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকে। তাহারা এই কুল এবং অপর কুল উভয় কুল হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া বড় বিকট অবস্থায় নিপতিত হয়।"

অহিরাজ কহিল,—"মহাত্মন্, আমারও ঠিক সেই অবস্থায়ই প্রথমত হইল। আমি নিতান্ত নিরাশ সাগরে ভাসিতে লাগিলাম। তখন বাস্তবিকই বড় চিন্তা হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম এ কি হইল? এ কি করিলাম? কি ভ্রান্ত ভাব বুঝিলাম—

কি ভ্রমাত্মক ধারণা অবলম্বন করিলাম? এই চিন্তায় নিতান্ত অধীর হইয়া একদা এক চার্ব্বাক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সবই যদি মিথ্যা অসার হইল, তবে মানবের অবলম্বন কি? মানবের কর্ম্ম কি—মানবজন্ম লাভ করিয়া মনুষ্য করিবে কি? কেবল আহার বিহারই যদি মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য হয় সম্ভোগই যদি নরজন্মের ফল বা পরিণতি হয়, তবে মনুষ্যে ও পশুতে পার্থক্য কি? একটা শৃগাল বা শকুনির জীবনলাভ করিলেই বা ক্ষতি কি? বরং তাহারা বিনা যত্নে বিনা শ্রমে অভীপ্সিত ভোগ্য সামগ্রী ভোগ করিয়া থাকে। শৃগাল যদৃচ্ছালব্ধ পূতিগন্ধময় গলিত মাংসখণ্ড পাইয়া যেমন পরম পরিতৃপ্ত হয়, মনুষ্য পিষ্টক পুরোড্রাশাদি পাইয়া তদপেক্ষা অধিক তৃপ্তিলাভ করে কি? শৃগাল শৃগালীকে পাইয়া যে সন্তোষ উপভোগ করে, মানব সুন্দরী যোষিৎ সঙ্গে তদপেক্ষা অধিক আনন্দলাভ করিতে পারে না। ফলতঃ স্থূলভাব ধরিয়া বিচার করিলে মানব সাধারণ ইতর প্রাণী অপেক্ষা কোনরূপেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।"

আমার এই কথায় চার্ব্বাক-সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিত উত্তরে কহিলেন—"সুখলাভ অথবা সর্ব্ব প্রকার সম্ভোগই প্রকৃত পুরুষার্থ। যেমন জলভ্রমে তৃষ্ণাতুর মৃগ মরুভূমে মরিচিকার পশ্চাৎ অনুসরণ করে, সেইরূপ মানব মিথ্যা আনন্দের ছলনায় সংসারে বৃথা ঘুরিয়া মরে। ভ্রান্ত মানব সংসারের সম্ভোগ সুখ পরিত্যাগ করিয়া বকাণ্ড প্রত্যাশার ন্যায় কল্পিত পরমানন্দের পশ্চাৎ



প্রধাবিত হয়। কিছুকাল পরে সে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারে। ভণ্ড ধর্ম্মধ্বজীগণ ভোগীদিগকে শিশ্নোদর পরায়ণ বলিয়া নিন্দাবাদ করে। কিন্তু বলিয়াছি ইন্দ্রিয়-গ্রামের পরিতৃপ্তিতে যে সুখ তাহা কি তাহারা অনুভব করিতে পারে না? ভোগের সামগ্রী অর্জ্জনে যে দুঃখ বা শ্রম তাহা সেই অলস দীর্ঘসূত্রীগণ সহ্য করিতে অসমর্থ। তাই তাহারা ভোগ সুখের অলীকত্ব ও অসারত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়া বেড়ায়। তাহারা জানে না, অথবা জানিয়াও অজ্ঞতার ভাণ করে যে ইহকালের ইহজীবনের সুখ সম্ভোগ অসার মিথ্যা। পরকালের যে সুখ তাহাই প্রকৃত সুখ। যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও পূজোপহার দ্রব্যাদি দ্বারা দেবলোক ও পিতৃলোকের অর্চ্চনা উপাসনাতে যে স্বর্গাদি উচ্চলোক লব্ধ হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত সুখের আধার। ধর্ম্মধ্বজী ভণ্ডগণের এ সকল কথার কোনই অর্থ নাই। এ সকল মৌখিক কথা কেবল অজ্ঞ মূর্খ লোকসমাজকে প্রতারিত করিয়া আপনাদিগের অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভাবিয়া দেখ পূজোপহার কোন অশরীর জীব তোমার জন্য বহন করিয়া স্বর্গলোকে পঁহুছাইয়া দিবে? কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যুক্তি বিচার দ্বারা চিন্তা করিলে অনায়াসেই ভণ্ডগণের ঐ সকল কথার অসারত্ব বুঝিতে পারে। তুমি নিম্ন-তলে মিষ্টান্ন বিতরণ বা বর্ষণ করিলে উপরিতলের লোকের কি তাহাতে ভোজন-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়? উপরিতলের লোক কি তাহাতে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে? ধর্ম্মব্যবসায়ী প্রতারক ব্রাহ্মণ-

গণের সকল ধর্ম্ম উপদেশই এইরূপ অসার অর্থহীন উন্মত্তের প্রলাপ বিশেষ অথবা প্রবঞ্চকের মিথ্যা স্তোক বাক্য মাত্র।

আমি কহিলাম—'তবে বুদ্ধিমান মানব যে বিবেকবুদ্ধি আদি উচ্চ মানসিক বৃত্তি সমুদয় লাভ করিয়াছে, তাহাতে ফল কি? উচ্চভাব শ্রেষ্ঠ চিন্তার তো কোনই প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না।"

পণ্ডিত কহিলেন—"কোন দ্রব্য কেন হইল—বা কোন পদার্থের প্রয়োজনই বা কি, তাহার মৌলিক হেতু কেহই বুঝিতে পারে না। এ পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান সমাজে বহু আন্দোলন ও আলোচনা হইয়াছে। বিদ্বান-সমাজ সেই তত্ত্ব লইয়াই বহুকাল হইতে আলোড়িত হইয়া আসিতেছে। সেই মতে সংসারের কল্যাণের জন্য মঙ্গলময় বিধাতার বিধান অনুসারে সংসারের সকল পদার্থ পরিকল্পিত ও উদ্ভাবিত হইয়াছে। সংসারে কোন দ্রব্যই বিনা উদ্দেশ্যে বা জীবজগতের অপকারের জন্য বিরচিত হয় নাই। যাহা কিছু স্থূল দৃষ্টিতে অনর্থক বা অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হয়, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বা বিচার করিয়া বুঝিলে, বেশ জানিতে পারা যায় যে সকল পদার্থের সকল ঘটনার মূলে মাঙ্গলিক বিধান কল্যাণকর হেতু বিদ্যমান রহিয়াছে। জগতে এমন কোন পদার্থ, এমন কোন কার্য্য বা এরূপ কোন ঘটনার উদ্ভব নাই, যাহার আদি স্তরে কোন শুভ উদ্দেশ্য নাই। পুষ্পের সৌন্দর্য্য, বিহঙ্গকুলের সুমধুর রব, মানবের মস্তিষ্ক প্রসূত সঙ্গীত চিত্রাদি

শিল্পকলার যেমন শুভ সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়, তেমনি কাল ভুজঙ্গের ভয়ঙ্কর হলাহল হইতে সিংহ ব্যাঘ্রাদির হিংসা বৃত্তির প্রয়োজনীতার বিধান অবশ্যই স্বীকার্য্য। পক্ষান্তরে অপর পক্ষ প্রত্যুত্তরে বলে, এসকল কথা ধর্ম্মধ্বজীগণের ভগবৎ সত্বার অবলম্বন সূত্র। উহার মূলে কোন সংযুক্তি বা সত্য তত্ত্ব পরিদৃষ্ট হয় না। সংসারে কত বিড়ম্বনা, কত অনর্থ কত দুঃখ প্রতিনিয়ত সংঘটিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত দেশে কত দুর্ভিক্ষে কত মহামারীতে কত জীব বিনষ্ট হইতেছে; জীবের জীবন যেন কেবল দুঃখ যন্ত্রণা ভোগের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। জগৎ যেন কেবল কষ্টেরই আগার। বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে জীবনের অধিকাংশ কাল কেবল দুঃখ ভোগ করিতে করিতে অতিবাহিত হয়। সূতিকা গৃহে জন্ম হইতে মৃত্যু মূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত জীবনের যে পরমায়ু কাল তাহাতে সুখ অপেক্ষা দুঃখের ভাগ সহস্র গুণ অধিক। জীবনের প্রায় অর্দ্ধেক ভাগ নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। নিদ্রায় যে তৃপ্তি তাহাতে অনুভূতির ভাব কিছুই উপলব্ধ হয় না। সে ভাব সুখের ভাব নয়, দুঃখের ভাবও নয়। কেহ কেহ বলে সুষুপ্তির অবস্থা মহা শান্তির অবস্থা। সেই শান্তির আবস্থাই জীবনে সুখের অবস্থা। কিন্তু যে অবস্থায় কিছুই উপলব্ধি হয় না সে দশাকে সুখের দশা বা শান্তির দশা কিরূপে বলিব? আর সুষুপ্তিহীন যে নিদ্রা সে নিদ্রার অবস্থায় স্বপ্ন ভোগ হইয়া থাকে। সুনিদ্রায় কখন স্বপ্ন হয় না। স্বপ্ন কুনিদ্রায় ঘটিয়া থাকে।

সুনিদ্রা দুঃখের ভিন্ন নামান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। আর স্বপ্নে প্রায় দুঃখ বিভীষিকাই উপভোগ হইয়া থাকে। নিদ্রার সময় ব্যতীত জাগ্রত অবস্থায় যে ভোগ তাহা প্রায় দুঃখ-বিজড়িত। রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র সকলের জীবনই প্রায় একই রূপ। দরিদ্র মনে করে ধনী ব্যক্তি তাহার অপেক্ষা সুখের অবস্থা উপভোগ করে। ইহা কিন্তু মহাভ্রম। কেন না ধনী, দরিদ্র অপেক্ষা জীবনের অধিক সময় দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত করে। কে তাহার ধন হরণ করিবে—দস্যু তস্কর কখন সুযোগ বুঝিয়া তাহার প্রাণনাশ করিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবে, এই ভীষণ চিন্তায় সেই হতভাগ্যের জীবনের সমুদয় সুখশান্তি বিনষ্ট করে। রাজাও রাজ্যসুখ বড় দুঃখে লাভ করে ও বড়ই দুঃখে তাহা উপভোগ করিয়া থাকে। এই কুটীর বাসী অতি দীন দরিদ্র হইতে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ পর্য্যন্ত সকলেই দুঃখের দাস। ভাবিয়া দেখ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে সৃষ্টির জন্য বা তাহা রক্ষার জন্য কত ভাবনা ভাবিতে হয়, কত ভার বহন করিতে হয়। অতি ক্ষুদ্র জীব ভূমিলতা মৃত্তিকা হইতে বাহির হইয়া প্রথমত একটি পীপিলিকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। সেই অবস্থায় যন্ত্রণায় সে ছটফট করিতে থাকে। ক্রমে একটি একটি করিয়া শত শত পীপিলিকা তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া দংশন করিতে থাকে। সে নিরূপায়; পীপিলিকা দলের আক্রমণ হইতে কিছুতেই আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। ভাবিয়া দেখ কি ভীষণ তাহার যন্ত্রণা! কেমন শোচনীয় তাহার দশা! এইরূপ জগতের সর্ব্বত্র কেবল

দুঃখের অবস্থা—অসুখ অশান্তির দারুণ ক্রন্দন! এই দুঃখ অশান্তি নিবারণের কোন উপায় অন্বেষণ করিতে না পারিয়া, ভয়ে বিহ্বলতায় ব্যাকুল হইয়া অন্ধ মানব একটা অন্ধ শক্তিকে উত্থাপিত করিয়া তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয় ও নিজ উদ্ভ্রান্ত চিত্ত বিক্ষিপ্ত প্রাণকে প্রবোধ ও শান্তি প্রদানের বিফল চেষ্টা করিয়া থাকে।' এইরূপ উভয় পক্ষ চিরদিন তর্ক-বিতণ্ডা করিয়া আসিতেছে এবং এইরূপই করিতে থাকিবে; এ তর্কের যথার্থ মীমাংসা, সত্য নির্দ্ধারণ কে করিবে? কবেই বা হইবে কে কহিতে পারে? এ সকল মৌখিক তর্ক-চ্ছলের মধ্যে নিপতিত হইয়া মূঢ় মানব আত্মহারা হয়। যথার্থ যে সুখ —যাহাতে কল্পনার তর্ক বা বৃথা বাক্যজালের যুক্তি আড়ম্বর পরিচালিত হইতে পারে না—সেই প্রকৃত সুখসম্ভোগের কথা সে ভুলিয়া যায়! ধর্ম্মধ্বজী ভণ্ডগণ নিজেরা মনে প্রাণে না বুঝিলেও অপরকে কাল্পনিক ধর্ম্মের ছলনায় ভুলাইয়া প্রতারিত করে ও আপনাদের স্বার্থসাধনের চেষ্টায় ব্যগ্র হইয়া ভ্রমণ করে। ফলতঃ ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তি নিচয়ের উপভোগ দ্বারা যে সুখ উপভোগ ঘটে তাহাতে কোন সন্দেহ বা তর্কের সম্ভাব একান্ত অসম্ভব ব্যাপার।'

আমি কহিলাম—'তবে ভাবিবার বা বুঝিবার ব্যাপার তো মনুষ্যের পক্ষে কিছুই নাই। স্মৃতি কল্পনা চিন্তা আদি বুদ্ধির ক্রিয়া কলাপাদি সকলই তো তবে নিতান্তই নিষ্ফল—ভাব ভাবনা বা চিন্তাদি ক্রিয়া কলাপ বিহীন হইলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত

হইয়া যায়। মানুষ তাহা হইলে পশুত্বে পরিণত হয়। মানুষ *এই সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য কেন?* বুদ্ধি-শক্তি লইয়াই মানব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব। ভাবনা ও চিন্তার ফলে বুদ্ধি বিকাশ লাভ করে। ভাবনা চিন্তা পরিত্যাগ করিলে, মানব ও সামান্য তুচ্ছ পতঙ্গে কোনই প্রভেদ থাকে না। জ্ঞানের বৃদ্ধির ফলে মানব নির্ব্বাণ-মুক্তির অধিকারী হইয়া থাকে; তত্ত্ব জ্ঞান সৎ ও শ্রেষ্ঠ চিন্তা বিকাশের ফল। চিন্তা, বুদ্ধির প্রধান অঙ্গ। আবার সাধারণ সাংসারিক ক্রিয়াকলাপেও বুদ্ধি বলেই মানব অন্য জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। বুদ্ধির বলেই মানব হস্তী অশ্ব আদি বড় জন্তুকে বশীভূত করিয়া তাহাদিগের দ্বারা কার্য্য সাধন করিতেছে। অতএব বুদ্ধির মাহাত্ম্য সর্ব্বথাই স্বীকার্য্য। বুদ্ধির অনুশীলন পরিত্যজ্য নহে।”

চার্ব্বাক আচার্য্য কহিল—“বুদ্ধির অনুশীলন অনাবশ্যক বলি না। যে বুদ্ধির পরিচালনা সুখ সংগ্রহে অসমর্থ, সে বুদ্ধি নিষ্ফল। সে ব্যর্থ বুদ্ধি অন্ধ বা পঙ্গুর ন্যায় অক্ষম। যে বুদ্ধি কেবল ভণ্ডগণের ধ্যান ধারণাদি আকারে শূন্য অবস্থায় পর্য্যবসিত, সে অর্থ সামর্থ্য হীন বুদ্ধির নির্ব্বাণ দশাই প্রার্থনীয়।”

নাস্তিক আচার্য্য এইরূপ নানাভাবের নানা কথায় আমার বুদ্ধি ভ্রংশ ঘটাইয়াছিল। তাহাদের উপদেশে, তাহাদের কুসঙ্গে আমার মতি গতি যেরূপে পাপপথে পরিচালিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখনও পর্য্যন্ত তাহাদের শূন্য বাদের উপরি যেন প্রাণ অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির দেহ হইতে

প্রেত অপসারিত হইলেও সে কতক্ষণ পর্য্যন্ত যেমন পূর্ণ ভাবে প্রকৃতিস্থ হইতে পারে না, আমারও ঠিক সেই দশাই ঘটিয়াছে আমার যে বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহা হইতে যেন এখনও সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি নাই। শূন্য-বাদীগণের শিক্ষা দীক্ষায় অভ্যস্ত হইয়া, আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে জীবনকে জগৎকে মহাশূন্যে পরিণত করাই পরম পুরুষার্থ—তাহাই একমাত্র সার ধর্ম্ম—মোক্ষধর্ম্ম। জীবন জগৎ যদি সুখের জন্য হয়, তবে সে জীবন জগৎ লইয়া বাসনা ও প্রার্থনার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় না। বসনা প্রার্থনা থাকিতে অভাব দুঃখ কখন একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারে না। অতএব জীবন জগৎকে মহাশূন্যে লয় সাধন করাই মোক্ষধর্ম্ম।"

অহিরাজের এই সকল কথা শুনিয়া, শিষ্যপ্রবর কহিলেন —"চার্ব্বাকগণ, জীবনকে জগৎকে একদিকে মহাশূন্যে পরিণত করাকেই মোক্ষধর্ম্ম কহে, আবার ভোগকেও পরমপুরুষার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করে। উভয়ই নিশ্চয় বিরুদ্ধ-ভাব। ভোগে শূন্যত্বের দিকে অগ্রসর হওয়া একান্ত অসম্ভব। শূন্যে পরিণতি ত্যাগকেই দ্যোতনা করিয়া থাকে। চার্ব্বাক শাস্ত্রের সকল তত্ত্ব—সকল সিদ্ধান্ত—এইরূপ অর্থশূন্য বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। ফলতঃ নাস্তিকতা সর্ব্ববিধ ধর্ম্মহীনতার আদিমভিত্তি। নাস্তিকতা মানব-জীবনকে, নীচ কীট পতঙ্গের জীবন অপেক্ষাও হেয় তুচ্ছ করিয়া ফেলে। নাস্তিকতা এক পক্ষে জীবনকে নীরস শুষ্ক অবস্থায় আনয়ন করে, অন্যপক্ষে শ্রেষ্ঠজ্ঞান উচ্চচিন্তার পন্থা

হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়া মানব-আত্মাকে তমোগুণে কলুষিত করিয়া রাখে। জগতে বহুজাতীয় বহুজীব পরিদৃষ্ট হয়। তাহাদের এক জাতি চিৎবিভূতির বিকাশ ও তারতম্য অনুসারে অন্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এইরূপ জাতির মধ্যে যে এই উন্নতির স্তর পরিদৃষ্ট হয়, তাহার কারণ চিদাভাবের আধিক্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। চিৎ ভাবের বিকাশ উন্নতি অনুসারে জীবাত্মার উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। যে জীব—যে জীব-শ্রেণী—যত উন্নত স্তরে অবস্থিত তাহার চৈতন্য শক্তি তত পরিমাণে সমুন্নত বা সংবর্দ্ধিত। এই কারণে—চৈতন্যের বিশেষ বিকাশ বশতই মানব মহীমণ্ডলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবরূপে পরিগণিত। চৈতন্যের অপকর্ষতা ও অভাব বশতঃ অণ্ডজ স্বেদজ কৃমি কীটাদি নিকৃষ্ট জীবস্তরে গণ্য হইয়া থাকে। চৈতন্যের বিশেষ পরিস্ফুরণ হইতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব শ্রেষ্ঠরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সেই অভিব্যঞ্জনার চরম ও উৎকৃষ্ট ফল বুদ্ধি। এই বুদ্ধির অনুশীলন বিকাশ ধ্যান ধারণাদি অধ্যাত্ম-প্রক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল বৌদ্ধিক বা আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়াদির পবিত্র অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া, নাস্তিক চার্ব্বাক সম্প্রদায় আপনারা পশুভাবে নিপতিত হয় ও অপরকেও শিক্ষা দীক্ষাদি দ্বারা অজ্ঞ অন্ধ ভাবাপন্ন করে। এই ঘোর মূঢ় নাস্তিক গণকে সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করা সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে পাপ তাপময় কলিযুগে চার্ব্বাক সম্প্রদায়ের প্রভাব নিতান্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে।

তাই ধর্ম্মক্ষেত্র হইতে বেদ-অনুযায়ী ক্রিয়া কলাপাদি বিলুপ্ত হইবার উপক্রম করিয়াছে। তজ্জন্যই আত্মজ্ঞান আত্মধ্যানাদি ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ দিন দিন পতিত সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মহীন কর্ম্মহীন সম্ভোগবাদী নাস্তিক কুল বিধ্বস্ত ও বিদূরিত না হয়, ততদিন ধর্ম্মের গ্লানি ঘটিবে। তাহা বিদূরিত করিয়া সৎও সনাতন ধর্ম্মের সংস্থাপন জন্যই মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। অদ্য তুমি পরম সৌভাগ্যের ফলে তাঁহার দর্শন লাভ করিলে।

তুমি সৌভাগ্য ফলে অদ্য পাপ-জন্ম হইতে মুক্তি লাভ করিলে। এক্ষণে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্ব অবস্থায় এই কথা কয়টি মনে রাখিও। মনুষ্য-জন্মই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জন্ম। কেবল এই জন্মেই জীব সর্ব্ব বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরমানন্দ ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হইতে পারে। অপর সকল জন্মই কেবল ভোগের জন্য নির্দ্ধারিত। ভোগ দুই জাতীয়। জীবাত্মা সর্ব্বত্র চিত্তানুভূতির অধীন। চিত্তানুভূতির দুই ভাব বা দুই প্রকার বেদনা—এক অনুকূল বেদনা অপর প্রতিকূল বেদনা। অনুকূল বেদনার নাম সুখ—প্রতিকূল বেদনার নাম দুঃখ। এই দুই জাতীয় ভোগ—অনুকূল বেদনা বা সুখের ভোগ আর প্রতিকূল বেদনা বা দুঃখের ভোগ হইতে কোন জীব একেবারে বিমুক্ত হইতে পারে না। স্বর্গে দেবগণও এই দুই জাতীয় বেদনাজনিত দুই জাতীয় ভোগ হইতে মুক্ত নহেন। তাঁহাদিগকেও উভয় ভোগের মধ্যে এক প্রকার ভোগ অবশ্যই ভোগ করিতে হয়।

কেবল মানব-জন্ম লাভ করিয়া এই উভয় জাতীয় ভোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। কেবল মানব সাধনা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। দুঃখ ত্রিবিধ যথা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। এই ত্রিবিধ দুঃখের যে আত্যান্তিক নিবৃত্তি তাহাই নির্ব্বাণমুক্তি নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সেই নির্ব্বাণ-মুক্তির অধিকার কেবল মানব-জন্মেই লাভ হইয়া থাকে। এই জন্য সকল জীব মানবজন্ম লাভ করিতে ইচ্ছা করে।

নির্ব্বাণমুক্তির পন্থা তত্ত্বজ্ঞান। আত্মদর্শন ও আত্মানুভূতি তত্ত্বজ্ঞানের যথার্থ স্বরূপ। আত্মাকে ধ্যান ও চিন্তা করিতে করিতে মানব তাহার স্বরূপ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। আত্মা ভ্রমরূপ-মায়ার অধীন হইয়া, আপনাকে দুঃখী সুখী বা বদ্ধ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। সে কল্পনা প্রকৃত পক্ষে স্বপ্ন অবস্থায় ভীষণ দৃশ্য দর্শন বা ভয়ঙ্কর রিপুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া যন্ত্রণা ভোগের ন্যায় সর্ব্বই মিথ্যা। এই মায়ার জালকে ছিন্ন করিয়া—সর্ব্ববন্ধনকে ছেদন করিয়া, আত্মাকে ভূমাভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারার নামই মহানির্ব্বাণ বা মহামুক্তি। অহিরাজ, তুমি মহাপুরুষের কৃপাপাত্র হইয়াছ। সেই কৃপার মহাফল জীবন্মুক্তি। জীবন্মুক্তির উপায়, উপদেশ ছলে নানাভাবে বারম্বার তোমায় কথিত হইল। এসব কথা তুমি আর কখনই বিস্মৃত হইও না। সর্ব্বত্র-সর্ব্বঅবস্থায় যাহাতে এই তত্ত্ব উপদেশের সাধন সমাধান করিতে পার, তৎপক্ষে সচেষ্ট রহিবে।”

অহিরাজ আচার্য্য পদে প্রণিপাত হইয়া তৎক্ষণাৎ নীচ যোনি হইতে উদ্ধার লাভ করিল। অহিরাজ দিব্যদেহ লাভ করিয়া দেবযোনির ন্যায় অন্তর্ধান করিল।

ব্রহ্মচর্য্য-অবস্থায় আচার্য্য একদা ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্রামটি বহু জাতি ও বিবিধ শ্রেণীর লোকের বাসস্থান। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র আদি চারিবর্ণের লোক এবং ব্যবসায়ী ধনী কৃষক ও কর্ম্মজীবী আদি সকল শ্রেণীর মনুষ্য বাস করিয়া গ্রামের বিভব শ্রী সম্যক রূপে সংবর্দ্ধিত করিয়াছিল। ভিক্ষা সংগ্রহ ব্রহ্মচারী অবস্থায় কর্ত্তব্য বিধান ও তদ্দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ উচিত বলিয়া আচার্য্যদেব ভিক্ষা সংগ্রহে লোকালয়ে গমন করিতেন। তিনি প্রায় ধনী গৃহীর গৃহ ভিক্ষালাভের জন্য যাইতেন না। দরিদ্র • সাধু সজ্জনের গৃহে তাঁহার ভিক্ষাসংগ্রহের নির্দ্ধারিত ও অভীপ্সিত ক্ষেত্র ছিল। গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া অচার্য্য দেব এক নিতান্ত দরিদ্র সাধুর গৃহে উপস্থিত হইলেন। গৃহস্থও ভিক্ষালাভ দ্বারা স্বীয় সংসার প্রতিপালন করিতেন। গৃহী তখন ভিক্ষার্থ স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। বাটীর গৃহিনী শঙ্করকে দেখিয়া তাঁহার দেবোপম প্রতিভায় বিমুগ্ধ হইলেন। ভক্তিভরে আচার্য্যকে সমাদর ও অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে উপবেশন জন্য আসন-প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। শঙ্কর বিনীত কণ্ঠে কহিলেন—'মাত, আমি ব্রহ্মচারী ভিক্ষার্থী। আচার্য্য-আশ্রমের জন্য ভিক্ষার্থ আপনাদের গৃহে উপস্থিত হইয়াছি। আপনার গৃহে উপবেশন

করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে নিতান্তই অসমর্থ। দয়া করিয়া আমায় ভিক্ষা প্রদান করুন।' 'শঙ্করের সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া গৃহিণীর হৃদয় বিগলিত হইল। একে তাঁহার সেই রূপ-প্রতিভা, তদুপরি তাঁহার সুন্দর বদন বিনিসৃত মধুর বাক্য সমূহ শ্রবণ করিয়া গৃহকর্ত্রী প্রাণ মধ্যে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। যতই তিনি নবাগত ব্রহ্মচারীকে সন্দর্শণ করিতে লাগিলেন যতই তিনি তাঁহার মিষ্ট কথা কর্ণে শুনিতে লাগিলেন ততই তাঁহার প্রাণের মধ্যে এক অদ্ভুত অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হইতে লাগিলে। একে গৃহিণী দরিদ্র গৃহস্থের পত্নী; তাহাতে আবার তাঁহার স্বামী ও গৃহে উপস্থিত নাই. এমন অবস্থায় তিনি কি করিবেন কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়া হইয়া বিষন্ন বদনে নীরবে রহিলেন। শঙ্কর কহিলেন—'মাত, আমি বুঝিয়াছি আপনাদের অবস্থা তত ভাল নহে। আজি বোধ হয় তজ্জন্য আমাকে ভিক্ষাপ্রদানে অসমর্থটা। সেই কারণে আপনি বিষন্ন বদনে নীরব হইয়া রহিয়াছেন। যাহাহউক আপনি মনে কোনরূপ দুঃখ করিবেন না। আপনার ক্ষুব্ধ হইবার কারণ নাই। আমি জানি সামান্য বিষয় বিভব ধনে না হইলেও পরম ধনে ধনী আপনারা।''

রমণীকহিলেন—'বৎস! আমি আর কি বলিব? বাস্তবিকই আমরা নিতান্ত দরিদ্র। আমার স্বামীও ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া অতিকষ্টে সংসার প্রতিপালন করেন। ধর্ম্ম-অনুশীলন ধর্ম্মঅর্জ্জনই

তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই ভিক্ষান্নে সামান্য মাত্র সামগ্রীতেই তিনি পরিতুষ্ট। ভিক্ষাদ্বারা যাহা অর্জ্জিত হয়, তাহাতেই কোনরূপে অতি কষ্টে আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থায়ক। এমন অনেক ভিক্ষুক আছে ভিক্ষা বৃত্তি যাহাদের জীবনের অবলম্বন-ব্যবসা। তাহারা ভিক্ষা হইতে বিষয় বিভব সংগ্রহের জন্য যত্নবান হইয়া সংসারে তৃষ্ণার্ত্ত কাকের ন্যায় ঘুরিতে থাকে। আমার পতি সেরূপ ভিক্ষা-বৃত্তিকে অতি হেয় বৃত্তি বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। ভিক্ষা দ্বারা ধন সংগ্রহ করা কখনই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য নহে; যে দিন যাহা লব্ধ হইয়া থাকে, তিনি তাহাতেই পরিতুষ্ট থাকিয়া ভগবৎচিন্তায় কাল অতিবাহিত করিতে অভিলাষী। বিষয় বা ধনের প্রতি তাঁহার কখনই বাসনা বা লোভ নাই। তিনি স্বভাবতই সংসার-বিরাগী ধর্ম্মপরায়ণ।”

শঙ্কর কহিলেন—‘মাত, আমি পূর্ব্বেই তাহা জানিয়াছি। তাই আপনাদের ন্যায় গৃহীগণের পবিত্র গৃহ হইতে ভিক্ষা সংগ্রহে অভিলাষী হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি। আমি জানি আপনারাই যথার্থ সাধু গৃহী। আপনাদের গৃহ আশ্রমই ধন্য ও পরম পবিত্র। অর্থ শ্রম দ্বারা অর্জ্জিত হইয়া, যদি তাহা সদ্ব্যয়ে নিয়োজিত হয়, তবেই তাহার সার্থকতা। নতুবা কেবল ধন-সংগ্রহের জন্য এবং আপনার শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপনের জন্য যে অর্থের সমৃদ্ধি তাহা ঘৃণিত পুরীষের ন্যায় অতি অপবিত্র। সেরূপ ধনে গৃহীকে গৃহীর গৃহকে কলুষিত করিয়া থাকে। সৎশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে

গৃহাশ্রম স্থাপন ও রক্ষণ জন্য অর্থ উপার্জ্জনের প্রয়োজন। অর্থ ভিন্ন গৃহস্থাশ্রম সংরক্ষিত পরিপালিত হইতে পারে না। লোকস্থিতি সমাজস্থিতি রক্ষণের জন্য গৃহাশ্রম প্রধান প্রয়োজনীয় উপাদান। শাস্ত্র সকল আশ্রমের মধ্যে গৃহাশ্রমকেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। কেননা অপর সকল আশ্রমের জীব গৃহাশ্রমে আশ্রয় ও সাহায্যলাভ করিয়া আপনাদিগকে রক্ষণ ও পালন করিয়া থাকে। অর্থ, এই মহৎ আশ্রমকে রক্ষা করিয়া থাকে। সুতরাং গৃহাশ্রমের অধিষ্ঠাতার প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য অর্থ উপার্জ্জন। অর্থ উপার্জ্জনেরও শাস্ত্র-সম্মত বিধান ব্যবস্থা আছে। সাধু পন্থায় ন্যায় ও সত্যভাবে অবস্থিতি করিয়া শারিরিক বা মানসিক পরিশ্রম পরিচালনা দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করাই গৃহীজনের কর্ত্তব্য। সেই অর্থ সমাজের জন্য দেবসেবায় শ্রাদ্ধাদি পিতৃলোকের পরিতৃপ্তি সাধনায় ও অতিথি অভ্যাগত জনের পরিচর্য্যায় ব্যয় করার নাম সংব্যয়। যে অর্থব্যয় দ্বারা কোন শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান না হইয়া, লোকসমাজের অনর্থ বা অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকে সে অর্থ-ব্যয়ের নাম অসৎ ব্যয়। অসৎ ব্যক্তিবর্গ অসৎভাবে অর্থ উপার্জ্জন করে, অসৎভাবে ব্যয় করিয়া অর্থের যে অপব্যবহার করে, তাহাতে লোক-সমাজের বিশেষ অকল্যাণ অনিষ্ট সংসাধিত হইয়া থাকে। সাধুভাবে থাকিয়া সদুপায়ে অর্থ অর্জ্জন করা অর্থনীতির শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। গৃহী ব্যক্তি ধন উপার্জ্জন করিয়া, সৎ ও শুভ দানাদি কার্য্যে তাহা ব্যয় করিয়া অর্থার্জ্জনের সার্থকতা করিবে। দানের উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া

দান করা কর্ত্তব্য। সাধু ধার্ম্মিক ব্যক্তি দানের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। কারণ তাঁহারা সৎউপদেশ ও সৎ শিক্ষা প্রদান করিয়া সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন। সাধু পণ্ডিত ব্যক্তি সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জকে ও সমাজকে যে সুশিক্ষা দান করেন তাহা অতি অমূল্য। সে সংশিক্ষার উপযুক্ত মূল্য সমাজ কিছুতেই পরিশোধ করিতে পারে না। সাধু শিক্ষকের নিকট হইতে মানব-সমাজ যে ধর্ম্মবুদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, তাহাতে ইহলোকে ও পরলোকে যে মঙ্গল সামাজিক ব্যক্তিলাভ করে, সামান্য অর্থ বিনিময়ে কি সে উপকারের পরিশোধ হইতে পারে? সাধু শিক্ষকগণই সমাজের সুপন্থা প্রদর্শনের আদি-গুরু। তাঁহারাই অন্ধ সমাজকে জ্ঞানচক্ষু দান করিয়া তাহাকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। সে ঋণের পরিশোধ নাই। ভাবিয়া দেখ সমাজে সর্ব্ববিধ লোক-সর্ব্ববিধ উপায় বিধান বর্ত্তমান থাকিয়াও,—যদি সংগুরু সংশিক্ষক না থাকেন তবে সে সমাজ পশু-সমাজ বা প্রেতলোকের ন্যায় অতি হেয় অধম। চক্ষুহীন দেহ যেমন কোন সৎকার্য্যের উপযোগী হইতে পারে না, তেমনি সৎগুরু ও সৎ শিক্ষাদাতার অভাব হইলে, সমাজ মৃতকল্প হইয়া থাকে। ধন সম্পদে বা বাহ্য ঐশ্বর্য্যে সে সমাজ যতই উন্নতি লাভ করুক না কেন, তাহাতে প্রকৃত মঙ্গল লাভের কোনই উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে না। কেবল মৌখিক বা লিখিত উপদেশে নহে, জীবনের জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াও তাঁহারা অধম পতিত মানবগণকে উন্নতি কল্যাণের

পথে পরিচালিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কার্য্য কলাপাদির শুভ দৃষ্টান্ত রাজবিধান রাজদণ্ড হইতেও গুরুতর। কারণ রাজদণ্ডে বা রাজবিধানে দুষ্ট লোক সকল ভয়ে ভীত হইয়াই সৎপথে পরিচালিত হয়; কিন্তু সাধু সজ্জনের প্রদর্শিত কর্ম্ম পন্থা ভক্তি ভাবে অবলম্বন করিয়া, মানবগণ প্রকৃত মঙ্গল ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে সাধু শিক্ষকগণই সমাজের সংরক্ষক চক্ষু স্বরূপ। তাঁহারা যেমন সমাজকে রক্ষা করিয়া উৎকর্ষের পথ দেখাইয়া দেন, তেমনি তাহাদিগের রক্ষণ ও পরিপোষণও সমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং তাঁহাদিগকে দানই দানের যথার্থ সংব্যবহার। তৎপরে আর একশ্রেণীর লোক সমাজের পোষ্য ও প্রতিপাল্য। যাহারা অন্ধ খঞ্জ ও দুষ্ট পীড়ায় পীড়িত হইয়া কর্ম্মে অক্ষম, তাহাদিগের ন্যায় দরিদ্র ব্যক্তি ভিক্ষার্থী হইয়া দ্বারে বা সমীপে সমুপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে ভিক্ষা দান গৃহীগণের পক্ষে পরম পবিত্র কর্ত্তব্য। অনেকে তাহাদিগকে পাপী মনে করিয়া ঘৃণা করে। পাপ তাপে তাহারা জর্জ্জরিত হইয়া বিধি-নির্দ্ধারিত দৈহিক বা মানসিক দণ্ড উপভোগ করে বলিয়া মানব-সমাজ কখনই তাহাদিগকে অবহেলা বা অশ্রদ্ধা করিবে না। কারণ অক্ষম দরিদ্র ভিক্ষুককে অবহেলা বা উপেক্ষায় যে পাপ সঞ্চিত হয়, সে পাপ কালভুজঙ্গের ন্যায় গৃহস্থকে দংশন করিয়া থাকে। দান যজ্ঞ এক শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। দান যজ্ঞের অনুষ্ঠান জন্য গৃহীর গৃহাশ্রমের প্রধান প্রয়োজন। যে

গৃহে দান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান নাই—যে গৃহাশ্রম গৃহীর আপন সুখের ও সমৃদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠিত সে গৃহ প্রকৃত নরকের দ্বার-স্বরূপ। দান যে কেবল মনুষ্যলোকে পর্য্যবসিত এমন নহে। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গআদি নিম্ন জাতীয় জীবকুল পর্য্যন্ত মানবের দয়া ও দান পাত্র। গৃহীকে এ দান-ধর্ম্মের কথা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে জাগরুক রাখিয়া পবিত্র বিধান অনুষ্ঠান প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বকালে দাতাগণ দান-ধর্ম্ম রক্ষার জন্য আপনার দেহ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন। দান দ্বারা আত্মার পরম উৎকর্ষ কল্যাণ সংসাধিত হইয়া থাকে। উপযুক্ত পাত্রে দান করিয়া গৃহী ধনী ও কৃতার্থ হইয়া থাকে। আবার ধনী সমাজের শিক্ষাদাতা গুরুবর্গকে দান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠদান, এই মহৎবাণী গৃহস্থের সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া, রাখা কর্ত্তব্য। তাঁহারা স্বয়ং বা তাঁহাদের শিষ্য সেবকগণ ভিক্ষার্থী হইয়া গৃহে সমাগত হইলে, পরম সমাদর ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ভিক্ষাদানে তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ করা গৃহীর অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধু সজ্জনগণই জগতের উদ্ধারকর্ত্তা। তাঁহারা যে গৃহীর গৃহে পদার্পণ করেন সে গৃহ পবিত্র হয় এবং সে গৃহী তাঁহাদের পদধূলিতে ধন্য কৃতার্থ হইয়া থাকে। এইরূপ বহুবিধ সৎ উপদেশ প্রদান করিয়া শঙ্কর প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। গৃহিনী তখন কহিলেন—"আপনাকে কি ভিক্ষা প্রদান করিব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি আমাদের গৃহে ভিক্ষার্থী ব্রহ্মচারী উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি

সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বরূপ আমাদের পূজ্য পরিত্রাতা। কিন্তু আমরা অতি দরিদ্র। পূর্ব্বেই আপনাকে কহিয়াছি—আমার স্বামী স্বয়ং ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া পরিবার প্রতিপালন করেন। তিনি ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য গ্রামান্তরে একটু দূরে গমন করিয়াছেন। তজ্জন্যই বোধ হয় তাঁহার আসিতে একটু বিলম্ব হইতেছে। তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আপনি একটু কৃপা করিয়া অপেক্ষা করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। আমাদের গৃহে এক্ষণে কিছুমাত্র নাই যাহা দ্বারা ভিক্ষা প্রদান করিয়া আপনার সন্তোষ বিধান করি। যাহা হউক তিনি ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা অবশ্যই কিছু না কিছু সংগ্রহ করিতে বোধ হয় সমর্থ হইবেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে কিছু ভাগ আপনাকে প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইব।” গৃহকর্ত্রীর সানুনয় নিবেদন শুনিয়া শঙ্কর কহিলেন,—“মা, আপনি তজ্জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত বা ক্ষুব্ধ হইবেন না। আমাকে সামান্য যৎকিঞ্চিৎ কণিকা মাত্র প্রদান করুন। আমি তাহাই সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিব। ভিক্ষুক কিছুমাত্র গ্রহণ না করিয়া গৃহীর গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, গৃহীর তাহাতে পাপ ও অকল্যাণ ঘটে। আমাকে একটি ফল বা কিঞ্চিৎ জলমাত্র প্রদান করিয়া আপনি গৃহাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিপালন করুন। আপনি আমার মাতৃস্থানীয়া। আপনার হস্ত হইতে আমি যাহা কিছু দান প্রাপ্ত হইব, তাহাই প্রচুর বলিয়া মনে করিব।”

শঙ্করের সুমধুর বাক্যে গৃহিণী পরম পরিতুষ্ট হইয়া, গৃহ হইতে

একটি হরিতকী ফল আনয়ন করিয়া শঙ্করের হস্তে প্রদান করিলেন। শঙ্কর গৃহস্থের মঙ্গল ইচ্ছা করিয়া প্রস্থান করিলেন। গমনকালে কহিলেন কমলা তোমাদের দারিদ্র্য দুঃখ দূর করিবেন।

যে দরিদ্র গৃহ হইতে শঙ্কর বহির্গত হইলেন তাহার নিকটে এক বৃহৎ ভবনে এক অতি সম্ভ্রান্তা ধনবতী গৃহিণী বাস করিতেন। ধনবতী রমণী মণিমাণিক্যাদি সংযুক্তা বহুমূল্য অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া গৃহদ্বারে দরিদ্রকে অর্থ বিতরণের জন্য উপবিষ্টা ছিলেন। শঙ্করের অলৌকিক সমুজ্জ্বল রূপপ্রভা সন্দর্শন করিয়া তিনি যুগপৎ স্তম্ভিত ও বিমুগ্ধ হইলেন। তিনি দ্রুতপদে শঙ্করের সম্মুখে আসিয়া ষাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক বিনীত কণ্ঠে কহিলেন—"দেব, আপনার অপূর্ব্ব দেব-মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হইতেছে আপনি কখনই সামান্য বা সাধারণ মনুষ্য নহেন। আপনার অপার্থিব তেজ প্রভায় যেন দিক সমূহ আলোকিত হইয়াছে। আমি নিশ্চয়ই বুঝিতেছি আপনি অসাধারণ কার্য্য সাধনের জন্য মানব দেহ ধারণ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মহাপুরুষদিগের শারীরিক প্রভা তাঁহাদিগের মহত্ব খ্যাপন করিয়া থাকে। যাঁহারা অসাধারণ দেবকার্য্য সাধনের জন্য মহীতলে অবতরণ করেন, তাঁহাদের দৈহিক রূপ প্রভা ও বাহ্য লক্ষণাদি তাহা প্রকটিত করিয়া থাকে। অধর্ম্ম-অন্ধকার দূরীভূত করিয়া ধর্ম্মালোকে তমোময় সংসার আলোকিত করাই মহাপুরুষদিগের শ্রেষ্ঠ দৈব কার্য্য। আপনিও সেই মহৎ কার্য্য সম্পাদনের জন্যই

সংসারে আবির্ভূত হইয়াছেন। আমি অতি মূঢ়মতি। সর্ব্বদাই সংসার সম্পদের সম্ভোগে ব্যাপৃত রহিয়া প্রকৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিলাম না। যে সৎপন্থা অবলম্বন করিলে, মানবের সকল অশুভ দূরীভূত হয়, যাহাতে পরম শুভ সৌভাগ্যের উদয় ঘটে, তাহার গূঢ়তত্ত্ব কিছুই জানিতে বা বুঝিতে পারিলাম না। কি উপায়ে তুচ্ছ অলীক সুখ সম্ভোগ ঘটিবে কেবল তাহাই অন্বেষণ করিবার জন্য জীবন অতিবাহিত করিলাম। জীবনের সারতত্ত্ব কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সুখ ও সম্ভোগের জন্য পরমায়ুর অধিকাংশ কাল কাটাইলাম। কিন্তু কৈ—সুখ কৈ? সুখ বলিয়া লোকে যাহা ধারণা করে, তাহা একটা মোহের বিভ্রম মাত্র। এক্ষণে সার বুঝিয়াছি যে সংসারে সুখের আশা আর মরুভূমে জলের আশা একই জাতীয় মোহের ছলনা মাত্র। প্রভো! আমার অর্থের অভাব নাই, বিষয় বিভবেরও অভাব নাই। জীবনে ভোগের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক সে সকলই আমার আয়ত্তাধীন; কিন্তু প্রকৃত ভোগ, যথার্থ সুখ যে কি তাহা জানিতে পারিলাম না। এতদিনে আমার ঠিক বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে সংসারের সুখ- ভোগে কিছুমাত্র সুখের লেশ নাই। আজি যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করিলাম, কালি তাহাই বিশেষ দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। কেহ মনে করে অর্থেই সুখ—কেহ মনে করে স্ত্রী পুত্র কন্যাদির স্নেহে সুখ—কাহারও বিশ্বাস যশ ও কীর্ত্তিই সুখের নিদান। এ সকল বিশ্বাস ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। কেন না যে অর্থ সুখের কারণ সেই অর্থ হইতেই মহাভয় উপস্থিত

হইয়া থাকে। কখন কোন দস্যু আসিয়া লুণ্ঠন করিয়া বা তস্করে চুরি করিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবে এই ভয়ে ধনীকে সর্ব্বক্ষণ ভীত হইয়া কালযাপন করিতে হয়। আবার যাহারা আত্মীয় স্বজন পরিণামে ধনের অধিকারী, তাহারা সর্ব্বদা মৃত্যু কামনা করে, এমন কি সুযোগ পাইলে বিষ প্রয়োগে বা অন্য কোন অসৎ উপায়ে হত্যা করিয়া ধনীর ধনাধিকারী হইতে কল্পনা কামনা করিয়া থাকে। এইরূপ দস্যু তস্কর হইতে ধনীর যেমন ভয় ভাবনা, আত্মীয় উত্তরাধিকারীগণ হইতেও সেইরূপ ভীতি উৎকণ্ঠা হইয়া থাকে। যে হতভাগ্য সর্ব্বক্ষণ ভয় ভাবনার ক্রীত দাস তাহার আবার সুখ কোথা? স্ত্রী-পুত্রগণের স্নেহ জনিত যে সুখ তাহাও ভ্রম ছায়ার ন্যায় অতি অলীক। যে স্ত্রী-পুত্রাদি স্নেহ আদরের সামগ্রী হইয়া সংসারে পরম আনন্দ প্রদান করে, তাহারা কালের বশে হঠাৎ মৃত্যুকবলে নিপতিত হইতে পারে; এবং অনেক স্থলে সচরাচর এমন ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এরূপ আত্মীয় স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যুতে হৃদয়ে যে শেল বিদ্ধ হয় তাহার যন্ত্রণা নিতান্তই অসহ্য। যদি দৈববশে তাহাদের মৃত্যু না ঘটে, তবে সহজেই তাহাদের ব্যবহার ও আচরণ এরূপ অনিষ্টকর বা গ্লানি জনক হইয়া উঠে যে তাহাতে জীবনকে অত্যুৎকট তীব্র দহনে সদাই বিদগ্ধ করিতে থাকে। তখন যে স্ত্রী-পুত্র এক সময়ে বড় আদরের বড় আনন্দের পাত্র ছিল, তাহারাই বিষম বৈরীবৎ হইয়া উঠে। যে পুত্রকে সদা বক্ষে ধারণ করিয়া স্বীয় প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় বোধে পিতামাতা লালন পালন করে ও

পরম যত্নে বিবর্দ্ধিত করে, সেই পুত্রই হয়ত এককালে সেই পিতামাতার বক্ষে বিষাস্ত্র প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। আবার যশ কীর্ত্তির চিরস্থায়িত্ব নিতান্ত অসম্ভব। যে ধনবান শ্রীবান আজ ধন বিতরণ বা অর্থ ব্যয় করিয়া মহতী কীর্ত্তি অর্জ্জন করিল, কালি দুর্ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সে দরিদ্র হইয়া পড়িলে তাহার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-কীর্ত্তি অনায়াসে বিলুপ্ত হইতে পারে। যদি সংসারে পুত্রাদি কামনায় মন্দির জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠায় কোন ব্যক্তি স্থায়ী কীর্ত্তি অর্জ্জনের চেষ্টা করে, তবে উক্ত কীর্ত্তিও কালের বশে বিলুপ্ত হইয়া যায়—কর্ম্মকর্ত্তার জীবদ্দশাতেই তেমন ঘটনা ঘটিয়া থাকে। না ঘটিলেও কর্ম্মী যদি ভাগ্যবশে দরিদ্র হয়, তবে হতভাগ্য দরিদ্রের কীর্ত্তি কে ঘোষণা করে? ঘোষণা করিলেও তাহা তীব্র বিদ্রুপের ন্যায় অসহ্যই হইয়া উঠে। সংসারের সকল ব্যাপারই এইরূপ তুচ্ছ অসার। এই অসারের মধ্য হইতে যিনি প্রকৃত সারতত্ত্ব উদ্ধার করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ চতুর মহাজন। সেই চতুর ব্যক্তি জগতের জীবনের যাহা একমাত্র উপেয় উদ্দেশ্য তাহা অবলম্বন করিতে সমর্থ, হইয়া ইহজীবনেই সর্ব্ব বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

শঙ্কর ও ধনবতী রমণীর মধ্যে সংসারের সম্পদের এইরূপ অসারত্ব সম্বন্ধে কিছুকাল কথোপকথন হইল। রমণী শঙ্করের তত্ত্ব কথা শ্রবণ করিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তিনি নীরবে সংসারের ও সম্পদের অসারত্ব ও অস্থায়ীত্ব সম্বন্ধে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্কর ধনবতীর

তদবস্থা সন্দর্শন করিয়া আবার কহিতে লাগিলেন—'মানব একটটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারে এই জগৎ এবং এই জীবন নিতান্তই অসার ও অলীক। আমরা অহরহ চারি দিকে আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু ঘটনা দেখিতেছি। যখন সে ঘটনা দেখি তখনই ক্ষণকালের জন্য হৃদয় মধ্যে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হয়। তৎপরে নিমিষে সে ভাব তিরোহিত হইয়া মানবকে ঘোর বিষয়-মোহের আঁধার কূপে নিমগ্ন করে। তাই পুনঃ পুনঃ তত্ত্ব কথা কহিয়া পুনঃ পুনঃ সেই কথা স্মরণ করিতে বলি বাস্তবিক পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় এই জীবন সর্ব্বক্ষণই অস্থির ও অস্থায়ী। ধন জন বা যৌবনের গর্ব্ব নিতান্তই বৃথা। সে সকলের স্থায়ীত্বে নিতান্ত নির্ব্বোধ ভিন্ন কে নিভর করিতে পারে? যে হতভাগ্য ধনের বা আত্মীয়জনের উপর নির্ভর করিয়া আপনার উন্নতি ও মঙ্গল কামনা করে সে কিরূপে বঞ্চিত ও হতাশ হয়, তাহার প্রমাণ লোক সমাজে প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই কথাটি সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া বৈরাগ্য পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক পরম সার তত্ত্ব আত্মতত্ত্ব অধিগত করাই মানব জীবনের একমাত্র কল্যাণ।

শঙ্করের উপদেশ বাণী শ্রবণ করিয়া ধনবতী রমণীর মনের ভাব ও জীবনের গতি প্রকৃতি নিমিষে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। যেন অদ্ভুত অলৌকিক মন্ত্র শক্তির প্রভাবে নদীর প্রবল প্রবাহ বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইল। রমণী দিব্য দৃষ্টিতে দেখিলেন যেন তাঁহার সম্মুখে এক অপূর্ব্ব অলৌকিক দৈবী শক্তি মূর্ত্তিমান

পুরুষরূপে দণ্ডায়মান। অলৌকিক মহাপুরুষ জলদ গম্ভীর স্বরে সম্বোধন করিয়া রমণীকে কহিলেন—'তুমি মহাভাগ্যবতী। তোমার বহু জন্মের সাধনা স্বকৃতি ফলে সাক্ষাৎ দেবাদিদেব মহাদেব তোমার সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার মুখে তুমি যে সকল উপদেশ বাণী শ্রবণ করিলে, এই দুস্তর ভবসাগর হইতে তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তোমাকে তাহা কহিলেন। তুমি নিশ্চয়ই পূর্ব্ব জন্মে কঠোর তপস্যা ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলে। সংসার সম্পদ সম্ভোগ তোমার সে আরাধনার উদ্দেশ্য ছিল না। নিশ্চয়ই মহামুক্তিলাভ তোমার ব্রত তপাদির একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাই মহামোক্ষফল প্রদানের জন্যই শঙ্কর শঙ্কররূপে অবতীর্ণ হইয়া তোমাকে অতি নিগূঢ় তত্ত্ব-উপদেশ প্রদান করিলেন। তুমি অবহিত হইয়া স্থির চিত্তে সে সকল কথা শ্রবণ করিলে। এক্ষণে যাহাতে সেই স্বর্গীয় উপদেশ বাণীর সূত্র ধারণ করিয়া, পরম মঙ্গলময় মোক্ষের পথে পরিচালিত হইতে পার, তৎপক্ষে প্রাণপণে যত্নবতী হও। সেই প্রয়োজন সাধনের জন্যই মানব-জন্ম। এই জন্ম লাভ করিয়া তরুণ বয়সেই মোক্ষ ধর্ম্ম লাভের জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। মানব জন্ম প্রকৃত পক্ষে দুর্ল্লভ। ইহা যেমন বহু দুঃখে লাভ হইয়া থাকে, তেমনি ইহা অতীব অস্থির এবং অনিত্য। কারণ এই জীবন যেমন বর্ত্তমান মূহুর্ত্তে বিদ্যমান রহিয়াছে তেমনি পর মূহুর্ত্তেই লয় হইয়া যাইবে। এই জন্মের মহৎ গুণ এই যে ইহাতে জীবের যথার্থ জ্ঞান-চক্ষু

উন্মিলীত হইয়া থাকে। কেবল এই জন্মেই মানব, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্মের গুঢ় তত্ত্ব বুঝিয়া লইতে পারে। এবং সেই গুঢ়তত্ত্ব বুঝিয়া লইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য 'গন্তব্য পথ বুঝিয়া চলিতে থাকে। প্রত্যেক মানবের বুঝা কর্ত্তব্য যে ইন্দ্রিয়-জনিত উপভোগ দুঃখেরই রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেন না দুরদৃষ্ট বা শুভ অদৃষ্ট বশতঃ যে কোনরূপ দেহ জীবলাভ করে, তাহাতেই সুখ দুঃখ ঘটিয়া থাকে। সে জন্য কাহাকেও বিশেষ কোন চেষ্টা বা উদ্যোগ করিতে হয় না। কারণ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় কেহ শ্রেষ্ঠ রাজার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রাজসুখ উপভোগ করে, আবার কেহ বা ইতর দরিদ্রের গৃহে জন্ম লইয়া কদন্নে কুগৃহে জীবন নির্ব্বাহ করে। এ সকলই অদৃষ্টের সামান্য খেলা বা বিড়ম্বনা মাত্র। এই সকল ভোগ সাধনে কেবল বৃথা পরমায়ু ক্ষয় হইয়া থাকে; প্রকৃত কার্য্য বা প্রকৃত কার্য্যের প্রকৃত ফল কিছুই লাভ হয় না। এই সংসারে আসিয়া—এই মানব দেহ ধারণ করিয়া—যতদিন শরীরে সামর্থ্য থাকে তখন হইতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভের জন্য যত্ন করা শ্রেষ্ঠ মানবের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে মানবের পরমায়ু শত বৎসর মাত্র। যে মানবের ইন্দ্রিয় সংযত নহে অর্থাৎ যে ব্যক্তি অসংযত ইন্দ্রিয়-গ্রাম লইয়া সংসার করে তাহার আয়ু অর্দ্ধেক ক্ষয় পাইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে সেই নরাধম রাত্রিকালে অন্ধ-তমসে সমাচ্ছন্ন হইয়া বৃথা নিদ্রা, বৃথা শয়ন উপভোগ করে। অর্দ্ধেক পরমায়ুর মধ্যে বাল্যকাল ভ্রান্ত মুগ্ধ অবস্থায়, কৈশর অবস্থায়

খেলায়, বিংশতি বৎসর কাটিয়া যায়। আর বিবেচনা করিয়া দেখ জরাগ্রস্ত দেহভার বহিয়া শুষ্ক জীর্ণ দশায় আরও বিংশ বৎসর কর্ত্তিত হয়। তৎপরে দুঃখের আগার স্বরূপ কাম ও প্রবল মোহাচ্ছন্ন গৃহাসক্ত অবস্থায় অসতর্ক থাকিতে থাকিতে পরমায়ুর অবশিষ্ট অংশ ক্ষয় হইয়া থাকে। সংসারীগণের মধ্যে যে মানব ইন্দ্রিয়কে জয় করিতে পারে নাই, সে গৃহ সংসারের মোহে এতই আবদ্ধ যে তাহা হইতে কোন ক্রমেই সে উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। সংসারীর পক্ষে অর্থ সম্পদ প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় ব্যবসায়ী দস্যু তস্কর ও সেবকাদি অনেকেই দেহ, স্বাস্থ্য ও সম্ভোগকে এক কথায় প্রাণকে পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া ধন উপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়া থাকে। প্রণয়িনীর প্রণয়, মধুর ভাষী পুত্র কন্যাদির মিষ্ট কথা, আত্মীয় স্বজনের তোষামোদ পূর্ণ মিষ্ট আলাপন পরিত্যাগ করিয়া ধনী গৃহী পরম শান্তিময় বৈরাগ্য-পন্থা কখনই অবলম্বন করিতে পারে না। পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগিণী, ভগ্নদেহ জনক-জননী, দীন নির্ভরশীল আত্মীয় কুটুম্বগণকে কেহই সহজে পরি-ত্যাগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের ত্যাগ-ভূমিতে অনায়াসে উত্থান করিতে সমর্থ নহে। পরম সুন্দরীগণ পরিসেবিত মনোরম আবাস সাধারণতঃ সকলের পক্ষেই স্বর্গস্বরূপ। তাহাতে একবার মায়া-বশতঃ আবদ্ধ হইলে, আর কাহারও বাহির হইবার ক্ষমতা থাকে না। যেমন কোষকার কীট আপনার আবাস গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহা হইতে বাহির হইবার পথ রাখে না, সেই প্রকার

ঐরূপ সংসারাসক্ত ব্যক্তিও গৃহ সংসারে মহা আসক্ত হইয়া আবদ্ধ অবস্থায় জীবন যাপন করিয়া থাকে। তাহার কামনা কোন কালেই পূর্ণ হয় না। সে চিরদিন অপূর্ণকাম ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কেবল অসার অনর্থক কর্ম্মেই ব্যাপৃত হইয়া রহে। সে হতভাগ্য শিশ্নোদর পরায়ণ হইয়া তুচ্ছ ইন্দ্রিয়-উপভোগকেই পরম সুখ বলিয়া মনে করে। তাহার মোহ অতীব দুঃশ্ছেদ্য। সে কিরূপে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে? সে আয়ুক্ষয় বা নিজের পুরুষার্থ বিনাশের কথা স্বপ্নেও জানিতে বা ভাবিতে পারে না। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয়ে জন্ম জন্ম প্রপীড়িত হইয়াও সে কখন প্রতীকারের একমাত্র উপায় স্বরূপ যে মুক্তি-পন্থা তাহার অনুসন্ধান করিতেও কখন সমর্থ হয় না। এমন মন্দ ব্যক্তি আত্মানন্দে যে পরম সুখ তাহা কখনই লাভ করিতে পারে না। সাধ্বী, দেখিতেছি আপনি পরম সৌভাগ্যবতী। কারণ জ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভের জন্য আপনার হৃদয়ে ঔৎসুক্যের আবির্ভাব হইয়াছে। মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? আর ব্যাধি বা জরা আসিয়া এখনও আপনাকে আক্রমণ করে নাই। অতএব এইক্ষণে সময় থাকিতে থাকিতে আপনি সুপন্থার অনুসরণ করুণ। আপনার মঙ্গল লাভ হইবে।"

এইরূপ নানা উপদেশ প্রদান করিয়া শঙ্কর নীরব হইলেন। সেই সকল সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া রমণীর প্রাণে এমনই

বিষয় সম্পদে তীব্র বৈরাগ্য জন্মিল যে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ধন ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ মনে করিয়া তাহা বিতরণের জন্য গৃহ হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আপনার অঙ্গ হইতে বহুমূল্য অলঙ্কার সমূহ উন্মোচন করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ধনবতী রমণীর গৃহের পার্শ্বদেশে দরিদ্র গৃহস্থের আবাস ছিল। সেই দরিদ্র গৃহস্থেরও গৃহে শঙ্কর ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য পূর্ব্বেই গমন করিয়াছিলেন। সেই গৃহীও নিজে ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তখন সেই গৃহীর পত্নী, আপনাদের দৈন্য দশা জানাইয়া, কাতর কণ্ঠে শঙ্করের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। গৃহী ও তাঁহার পত্নী উভয়েই চরিত্র-বলে পরম পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলেন। শঙ্কর সেই গৃহস্থের পত্নীর চরিত্র গুণে ও তাঁহার সদাচারে ও সৎ-ব্যবহারে অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিলেন যদি এমন সচ্চরিত্র সদাশয় গৃহী ও গৃহিনী ধনসম্পদ লাভ করিতে পারেন, তবে তাঁহাদের দ্বারা সংসারের প্রভূত উপকার সংসাধিত হইতে পারে। বহু দীন হীন ব্যক্তি তাঁহাদের দ্বারা প্রতিপালিত হইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি কমলা দেবীর নিকট তাহাদের মঙ্গল উন্নতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অতি সত্বরই তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল। ধনবতী রমণী যে সকল অর্থ সম্পদ ও অলঙ্কারাদি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সে সকল ঐ দরিদ্র গৃহস্থের গৃহ সমীপে নিপতিত হয়। সে সকল

ধনসম্পত্তি ও অলঙ্কার লাভ করিয়া, দরিদ্র গৃহস্থ অতুল ধনের অধিকারী হইয়া উঠিলেন।

অধ্যয়ন কালে শঙ্কর একদা আচার্য্যের আশ্রমে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন তাঁহার আচার্য্য দেব আত্ম-সাক্ষাৎকারের জন্য আসনে উপবিষ্ট হইয়া, ধ্যান সমাধি লাভার্থে দেহের স্থৈর্য্য ও মনের একাগ্রতা সাধনের চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার আশ্রমের অদূরে নদী বেগবতী হইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। নদীর বেগ তখন এতই প্রবল হইয়াছিল, যে তাহার কল্লোলে ও কল কল ধ্বনিতে আচার্য্যদেবের আশ্রম প্রদেশ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাতে আচার্য্য দেবের মানসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। তিনি মনের স্থৈর্য্য সাধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নদীর শব্দ যেন ক্রমেই প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। আচার্য্য গোবিন্দ পাদ বহু চেষ্টা করিয়াও, নদীর শব্দে মনের চাঞ্চল্য নিবারণ করিতে পারিলেন না—কিছুতেই মানসিক শান্তি বিধান করিতে সমর্থ হইলেন না। শঙ্কর তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—ওঃ, সামান্য নদীর কি প্রাবল্য। তাহার প্রাবল্যে স্বয়ং আচার্য্যদেবও মনকে স্থির করিয়া সমাধিস্থ হইতে পারিলেন না। ইহার প্রতীকারের উপায় কি নাই? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার শরীর হইতে যেন প্রভাকরের প্রভা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। তাঁহার বদন মণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতে আরম্ভ করিল।

তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। শঙ্কর উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—'আমি নিশ্চয়ই এই দুর্দ্বৃত্তা নদীর উদ্দাম প্রাবল্য তিরোহিত করিব। ইহারই প্রচণ্ড প্রভাবে আমার আচার্য্যের সমাধি সংসাধিত হইতেছে না। ওঃ দুর্দ্দান্তা নদীর কি এতই অহঙ্কার! এই বলিয়া শঙ্কর ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন। একটি ভাণ্ড গ্রহণ করিয়া তিনি নদী অভিমুখে গমন করিলেন। নিজ হস্তস্থিত ভাণ্ড নদীর সলিল মধ্যে সংরক্ষণ করিয়া কহিলেন—'যতকাল পর্য্যন্ত আমি এই কলসটি উত্তোলন করিয়া না লই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রে দুর্ব্বিনীতা নদে, তুমি নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া রহ।' কি আশ্চর্য্য ঘটনা! কি অপূর্ব্ব অদ্ভুত দৈববল! শঙ্করের কি অলৌকিক যোগবল! ভাণ্ড সলিল মধ্যে সংরক্ষিত হইবা মাত্র, নদীর সেই প্রবল কলকল ধ্বনি যেন নিমিষে নিমীলিত হইল। নদী নীরব নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। যেমন প্রবল প্রতাপান্বিত প্রভুকে দেখিয়া দাসী বিনীত ভাবে করযোড়ে নীরব হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহে, নদী সেইরূপে নীরব নিস্তব্ধ হইয়া দীন ভাবে রহিল।

শঙ্করের অলৌকিক প্রভাব দেখিয়া তত্রস্থ সকলেই বিমুগ্ধ হইয়া রহিল। আচার্য্য গোবিন্দ পাদ দেখিলেন যেন কি অদ্ভুত দৈব-প্রভাবে আশ্রম স্থল হঠাৎ মহা শান্তির আধার হইয়া উঠিল। কোন দিকেই আর কোনরূপ শব্দমাত্র নাই। নদীর শব্দ আর কিছুমাত্র শ্রুত হইতেছে না। বায়ুও যেন সম্পূর্ণ নীরব নিস্তব্ধ হইয়া অতি মৃদু মধুর হিল্লোলে বহিতে

লাগিল। দিক সকল প্রসন্ন হইয়া উঠিল। আকাশ ভূমণ্ডল প্রকাশ ভাব ধারণ করিল। আচার্য্য গোবিন্দ পাদ তখন স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—কি হইল! নিমিষে আশ্রম স্থল কেন এমন প্রশান্ত হইয়া উঠিল। চারিদিকই যেন মহা শান্তি ভাবে পরিপূর্ণ হইল। কেন এমন হইল? হঠাৎ কি এখানে কোন দেবতার আবির্ভাব হইল? অথবা কোন মহাপুরুষ আসিয়া এ দীনের আশ্রমকে পবিত্র করিলেন! গোবিন্দ পাদ অবশেষে অবগত হইলেন, যে তাঁহারই শিষ্য শঙ্করের অদ্ভুত অলৌকিক শক্তি বলে কল্লোলিনী নদী নীরব নিস্তব্ধ হইয়াছে—তাঁহারই প্রভাবে আশ্রম স্থল এমন প্রশান্ত হইয়াছে। তাঁহারই দৈবী বলে দিক ও আকাশ মণ্ডল এমন প্রসন্ন ভাব ধারণ করিয়াছে। আচার্য্য গোবিন্দ পাদ পরম প্রিয় শিষ্যের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া হৃষ্ট মনে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই শঙ্করের অমানুষিক প্রভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন যে শঙ্কর নিতান্ত সামান্য শিষ্য নহেন। শঙ্কর যে দৈবশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ—তিনি যে এক মহৎ কার্য্য সাধন করিতে জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন—তাহা গোবিন্দ পাদের ন্যায় আচার্য্যের বুঝিতে বাকি ছিল না। তিনি শঙ্করের বর্ত্তমান অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড অবগত হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং প্রাণ খুলিয়া শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বীয় সুখাশনে পুনরায় উপবিষ্ট হইলেন। এক্ষণে আচার্য্য দেবের আশ্রমের চতুর্দ্দিক মহা

শান্তিতে পরিপূর্ণ হইলে, প্রকৃতি দেবী স্বয়ং যেন প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দ্বিকরে শান্তি-সুধা বিতরণ করিতে লাগিলেন। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ আদি নীরবে নিলীন হইয়া রহিল। বৃক্ষ লতা স্থাবর জঙ্গল সকলই মহা শান্তির লীলা-ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। আচার্য্য দেবের মন প্রাণ দেহ ইন্দ্রিয়াদি সকলই যেন স্বতঃই প্রশান্ত হইয়া উঠিল। অতঃপর তিনি আসনস্থ হইয়া সমাধি লাভ করিলেন ও নির্ব্বাত স্থলে নিষ্কম্প দীপ-শিখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। সমাধি হইতে সমুত্থিত হইয়া গুরুদেব শঙ্করকে কহিলেন—'বৎস, তুমি হিমালয় প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া মহাভাষ্যাদি রচনা করিও।'

বেদান্ত ও উপনিষদ আদির ভাষ্য বিবৃতি ব্যাখ্যা এবং অদ্বৈতবাদ প্রচার উপলক্ষে শঙ্কর কাশীকে পরম পবিত্র স্থান ও প্রধান কেন্দ্র বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তজ্জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ শিষ্যগণ সহ তথায় আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এখানে অবস্থিতি কালে তিনি যেমন লেখনী পরিচালনায় তেমনি মৌখিক উপদেশে স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতবাদই তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ মূল মন্ত্র ছিল। তাই বলিয়া তিনি যে কেবল নীরস জ্ঞান-পন্থাই সর্ব্বদা প্রচার করিতেন, এমন নহে। ভক্তি সূত্রও তাঁহার ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ ছিল। তাঁহার কৃত স্তবাদিতে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শঙ্কর কৃত শিব স্তোত্র বিষ্ণু স্তোত্র ও তদ্ব্যতীত বহু প্রধান প্রধান প্রসিদ্ধ দেব দেবীর স্তোত্রে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ

পাওয়া যায়। ফলে আচার্য্য শঙ্কর একাধারে যেমন মহাজ্ঞানের আধার তেমনি ভক্তির সমুদ্র বিশেষ ছিলেন।

জ্ঞানাধার ভক্তি-সমুদ্র শঙ্কর একদিন শিষ্যগণ সহ গঙ্গাস্নানার্থ গঙ্গায় গমন করিতেছিলেন। যাইতে যাইতে কিছুদূর গমন করিলে পথিমধ্যে এক শপচ কয়জন সহচর সহ তাঁহার সম্মুখীন হইল। তাহাদিগের দ্বারা শঙ্করের গমন পথ রুদ্ধ হইল। শঙ্কর তাহাদিগকে পথ ছাড়িয়া পার্শ্বে গমন করিতে আদেশ করিলেন। শপচ কহিল—'কেন? আপনি এমন অন্যায় আজ্ঞা কেন করিতেছেন?'

শঙ্কর কহিলেন—'তুই অতি অপকৃষ্ট জাতি। তোকে স্পর্শ করিলে দ্বিজাতির দেহ অপবিত্র হয়। তোর সংক্রমে অশুচি ঘটিয়া থাকে। সেই জন্যই তোকে কিছু দূরে যাইয়া দাড়াইতে কহিতেছি। তাহা হইলে তোর সংস্পর্শে আর আমাদিগকে অপবিত্র হইতে হইবে না।'

শপচ কহিল,—'পবিত্রতা অপবিত্রতা শুচি অশুচি সবই মানসিক বিকার। ভেদাভেদ ভাব মায়াজনিত মহাভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। আপনি কি এখনও পার্থক্যভাবের ভ্রম আঁধার হইতে আপনার সমুদ্ধার সাধন করিতে পারেন নাই? আপনার প্রতিমূর্ত্তি ও আচরণ দেখিয়া বোধ হইতেছে আপনি সামান্য বা সাধারণ ব্যক্তি নহেন। আপনি নিশ্চয়ই মহাজ্ঞানী মহাপুরুষ। কিন্তু যে সাম্যভাব মহাপুরুষদিগের মহৎ লক্ষণ, সে

লক্ষণ আপনার ভাবে, কথায় বা আচরণে কেন পরিলক্ষিত হইতেছে না?'

শঙ্কর শপচের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন —একি অদ্ভুত ব্যাপার! এ জীবনে এমন কাণ্ড তো কখন পরিলক্ষিত হয় নাই। দেখিতেছি এই শপচ অতি নীচকুল সম্ভূত। ইহার শিক্ষা দীক্ষাও অতি ইতর জনের ন্যায় অতীব নিকৃষ্ট; কিন্তু ইহার মুখ হইতে যে সকল কথা বাহির হইতেছে তাহা অতি নিগুঢ় তত্ত্বভাব সম্বলিত। এমন ভাব এমন কথা কিরূপে এই ইতর ব্যক্তির মুখ হইতে পরিব্যক্ত হইল? নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোন অপূর্ব্ব শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। কথোপকথন প্রসঙ্গে ইহার স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক। এই ভাবিয়া শঙ্কর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'অহে শপচ, দেখিতেছি তুমি নীচকুলে সমুদ্ভূত হইয়াছ। সুতরাং জাতিগত পার্থক্যের কথা তুমি নিশ্চয়ই অবগত আছ। দ্বিজাতি-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া দেহী পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে। সেই পবিত্রতা হেতু মানব সমাজে বর্ণগত শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বর্ণ-বিভেদ বশত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আদি জাতি-বিভাগ সমাজের স্বাভাবিক বিধান। বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব অনুসারে মানবের মধ্যে জাতি নির্ণয় হইয়াছে। জাতি অনুসারেই মানব উচ্চ ও নীচ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপে শূদ্র হইতে বৈশ্য শ্রেষ্ঠ, বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ, ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠ গুণ অনুসারে অপর সকল বর্ণের মনুষ্য

অপেক্ষা প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে শপচ ও ম্লেচ্ছাদি জাতি গুণ কর্ম্মের দোষে পতিত ও মানব-সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়াছে। সুতরাং তোর সংস্পর্শে ব্রাহ্মণের অশুচি না ঘটিবে কেন? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি উচ্চ বর্ণের দেহে যে শক্তি ও মনে যে গুণ আছে, তাহা কখন নীচ শপচাদির দেহে বা মনে নাই—থাকিতেও পারে না। তাহাদের দেহে অধিক শক্তি কখনই বিকশিত হইতে পারে না অথবা তাহাদের মনেও কখন সংগুণের স্ফুরণ হয় না। তোদের ন্যায় নীচজনের সংসর্গে ও সংস্পর্শে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের নিশ্চয়ই অধোগতি ঘটিয়া থাকে। কারণ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সংগুণের আধার। সংগুণ নবনীতের ন্যায় অতি কোমল পদার্থ। নবনী যেমন অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় সামগ্রী, তেমনি অল্প কারণেই উহার বিকৃতি ও অধোপতন ঘটিয়া থাকে। যে সামগ্রী যে পরিমাণে উৎকৃষ্ট, তাহা সেই পরিমাণে সামান্য কারণে বিকৃত ও কলুষিত হইতে পারে। নবনী সামান্য কারণে অথবা কুপাত্রে রক্ষিত হইলে সত্বরই গুণহীন হইয়া পড়ে। তেমনি ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের গুণ-বান ব্যক্তিগণ তোদের ন্যায় নীচ সংসর্গে পতিত হইবে না কেন?'

শপচ, শঙ্করের কথা শুনিয়া হো হো রবে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। পরে শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া গভীর গর্জ্জনে কহিল, —'ব্রাহ্মণাদি কুলে জন্মলাভ করিলেই কি মানব শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে? না—তাহা কখনই সম্ভব নহে। উচ্চ কুলে

জন্মিয়া উৎকৃষ্ট কার্য্যাদি দ্বারা যে মানব আপনার উৎকর্ষ সাধন করিতে না পারে, সে কখনই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে না। শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি? গুণ এবং অর্থই মানবকে উচ্চতর পদবীতে সমুন্নত করিয়া থাকে। সৎগুণ দ্বারাই মানবের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, ইহা অতি সত্য সুনিশ্চিত কথা। একথা তো সর্ব্বতোভাবেই স্বীকার্য্য। কিন্তু তাই বলিয়া যে সে ব্যক্তি, সৎকর্ম্মহীন সৎগুণ বিহীন ব্যক্তি, কেবল ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারে কি? যে ব্যক্তি অপরকে আপন অপেক্ষা নীচ বলিয়া মনে করে—যে জন আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গর্ব্ব করে—তাহার আবার মহত্ত্ব কোথা? গর্ব্ব কখনই গুণের পরিচায়ক হইতে পারে না। যাহারা প্রকৃত পক্ষে গুণ বিহীন সেই সকল ব্যক্তি মুখে গর্ব্ব করিয়া আপনাদের মিথ্যা গুণের প্রচার করিয়া থাকে। যিনি যথার্থ গুণবান তিনি স্বভাবত বিনীত হইয়া থাকেন। তিনি শিষ্টাচারে ও সুমিষ্ট সম্ভাষণে সকলকে পরিতুষ্ট করেন। যেমন ফলভারাবনত বৃক্ষ ফল ফুলে পরিশোভিত হইয়া উন্নত শির নিম্ন করিয়া থাকে, তেমনি গুণবান ব্যক্তি গুণগ্রামে বিভূষিত হইয়া সকলের নিকট নতশির হইয়া ফলপূর্ণ বৃক্ষের ন্যায় শোভা পান। ফলবান বৃক্ষে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে সে আহত হইয়াও যেমন আঘাতকারীকে সুমিষ্ট ফল প্রদান করিয়া পরিতুষ্ট করে, তেমনি গুণবান ব্যক্তি শত্রুজনের প্রতিও সদাশয়তা প্রকাশ করিয়া থাকেন। মানবের যত প্রকার সৎগুণ আছে, বিনয় তাহাদিগের সকলের শোভা সংবর্দ্ধন করিয়া

থাকে। বিনয়বিহীন মহাপণ্ডিত ব্যক্তিও দাম্ভিক অহঙ্কারী বলিয়া সাধারণতঃ সকলের নিকট ঘৃণিত হইয়া থাকেন। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হইয়া থাকে শঙ্কর, শপচের কথা যতই শুনিতে লাগিলেন ততই তাঁহার ঔৎসুক্য সংবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শঙ্কর সাধারণ মনুষ্য ছিলেন না। তিনি অসাধারণ দৈববল সম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই মনে মনে বুঝিলেন, যে তাঁহার সম্মুখস্থ ব্যক্তি কখনই সামান্য ইতর শপচ নহে। উহার মধ্যে মহাশক্তির মহান মহিমা বিদ্যমান। শঙ্কর কথোপকথন ছলে শপচের নিকট গূঢ়তত্ত্ব কথা আরও শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ও ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তিনি তত্ত্ব বিদ্যার কথা জিজ্ঞাসু হইয়া শপচকে প্রশ্ন করিলেন। শপচ কহিল—'কেবল গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিলে প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না। প্রকৃত জ্ঞান না জন্মিলে বিদ্যার সার্থকতা কোথা? অনেক শিষ্য গুরুর নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে। তাহারা কেহ কেহ বহুশাস্ত্র পাঠ করিয়া বহু রাজ-সভায় শাস্ত্র বিচারে জয়লাভ করে। এইরূপে তাহারা মানব সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি ও সম্মান লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান লাভ না হওয়ায় সেই সকল পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি অধম ভাব পাইয়া অধোনত হইয়া থাকে। প্রকৃত পাণ্ডিত্য কি? সমদর্শিতা লাভই প্রকৃত পাণ্ডিত্য—তাহাই যথার্থ বিদ্যা। যিনি যথার্থ বিদ্বান প্রকৃত পণ্ডিত তিনি সমদর্শী হইয়া থাকেন। তাঁহার ভেদবুদ্ধি চিরতরে ঘুচিয়া যায়। তিনি গাভী হস্তী, চণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলকে

সমচক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। কাহারও মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য পরিদর্শন করেন না। 'আমি' 'তুমি' বা 'আমার' 'তোমার' এমন ভেদজ্ঞান কখনই তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। ব্রাহ্মণ, আপনি দেখিতেছি পরম পণ্ডিত। তবে আমার প্রতি আপনার এমন ঘৃণার ভাব কি জন্য উদিত হইল? ভাবিয়া দেখুন ঘৃণা অবহেলা বা রাগ দ্বেষ সকলই মায়া মোহ জনিত অজ্ঞান সম্ভূত। যিনি প্রকৃত বিদ্বান তিনি আত্মজ্ঞ। যিনি আত্মার গূঢ়তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনি কোন ভূতেই ঘৃণা প্রদর্শন করেন না। কারণ তিনি জানেন আত্মা সর্ব্বভূতেই বিরাজিত। যেমন পুষ্পসমূহ মালারূপে একমাত্র সূত্রে আবদ্ধ থাকে, তেমনি একমাত্র আত্মা সর্ব্বভূতকে আপনাতে অবস্থিত রাখিয়াছে। বাহিরে প্রাণ-সূত্ররূপে, আত্মা সকলকে ধারণ করিয়াছে। সেই মহান আত্মাই সকলের একমাত্র আশ্রয়দণ্ড স্বরূপ। এই পরমতত্ত্ব যে ব্যক্তি অবগত হইয়াছে সেই জ্ঞানী—সেই পণ্ডিত। কেবলমাত্র তাহারই শাস্ত্র অধ্যয়ন—তাহারই বিদ্যা উপার্জ্জন—সার্থক ফলবান হইয়া থাকে। শাস্ত্রবাক্য উচ্চৈস্বরে উচ্চারণ বা পাঠ করিতে পারিলেই যে জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত বা সম্মানিত হইতে পারা যায় তাহা নহে। যে জ্ঞান উপার্জ্জিত হইয়া, মনুষ্যের জীবনকে তমোঅন্ধকার হইতে উদ্ধার করিতে পারে না, সে জ্ঞানের কোনই ফলও নাই গৌরবও নাই। মানব যে অপর সকল ইতর প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানই তাহার এক মাত্র কারণ। আবার মনুষ্য মধ্যে পণ্ডিত যে অপর মনুষ্য হইতে উন্নত, তত্ত্বজ্ঞানই

তাহার প্রধান ও প্রকৃষ্ট হেতু। গূঢ় আত্ম-তত্ত্ব অবগতির নামই তত্ত্ব জ্ঞান। যাঁহার পক্ষে তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মতত্ত্ব অধিগত হইয়াছে সে আপনাকে সর্ব্বজীবে ও সর্ব্ব-ভূতে আপনাকে পরিদর্শন করিয়া থাকে। তাহাতে তাহার ভেদ-বুদ্ধি তিরোহিত হয়। তখন সে আপনাতে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূত আপনাতে দেখিয়া পরম শান্তি লাভ করে। সে অবস্থায় তাহার ভাল বাসিবার বিশেষ পাত্রও থাকে না—বা ঘৃণা দ্বেষ করিবারও কোন পাত্র থাকে না। সেই মহৎ ব্যক্তি যথার্থ নির্ব্বৈর হইয়া পরমানন্দে বিহার করে। তিনি পরমাত্মা বা ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ জানিয়া আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

শঙ্কর কহিলেন—'শপচ, তুমি যে জ্ঞানের কথা কহিতেছ, সে আত্মজ্ঞান সকলের পক্ষে আয়ত্তাধীন নহে। যতকাল সে তত্ত্ব অধিগত না হয়, ততকাল অবশ্যই ভেদ-জ্ঞান তিরোহিত হইতে পারে না। সুতরাং অজ্ঞানীর পক্ষে জাতিভেদ বর্ণবিচার অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য।'

শপচ কহিল—'বর্ণবিচার জাতিভেদ-জনিত অজ্ঞান মোহের কার্য্য। মোহ হইতেই গুণত্রয়ের উদ্ভব হইয়া থাকে। যে গুণাতীত—সত্ত্ব, রজ, তম আদি ত্রিগুণ হইতে যে আপনার সত্ত্বাকে পৃথক রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ—সে গুণে আবদ্ধ না থাকায় সর্ব্বকাল সাম্যে অবস্থিত থাকে। সাম্যে অবস্থানই সকল সাধনার চরম ফল। নির্গুণ নির্ব্বিকার অবস্থাকে যে সাম্যে অবস্থান করিয়া, ধারণ করিতে পারে সে কখনই কাহাকে

নীচ বা উন্নত বলিয়া মনে করে না। আপন আত্মাকে পরকীয় আত্মা হইতে পৃথক বলিয়াও মনে করে না। আপনি যে আমাকে ভিন্ন আত্মা বলিয়া ও নীচ জাতি বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন ইহা আপনার বিষম ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। আত্মজ্ঞ ব্যক্তি কখনই এরূপ বিদ্বেষ বা অবহেলার ভাব কাহারও প্রতি প্রকাশ করে না। আপনি যে আমার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে আত্মার অদ্বৈত ভাবকে আপনি সম্যকরূপে অধিগত করিতে সমর্থ হন নাই।'

শপচের সঙ্গে আর কয়টি সহচর ও একটি কুকুর ছিল। শপচ তাহাদিগকে দেখাইয়া গভীর কণ্ঠে কহিল—'এই যে ইতর মনুষ্য এবং কুকুর আদি নিকৃষ্ট প্রাণী দেখিতেছ, জানিও ইহারাও সেই পরম আত্মারই অঙ্গ বা অংশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এক পরমাত্মাই সর্ব্বরূপ সর্ব্বভাব সর্ব্বগুণ অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছেন। এক সাগর হইতে তরঙ্গ, ফেন, বুদ্‌বুদ আদি কত বিভিন্ন রূপের উদ্ভব হইতেছে। তাহারা ক্ষণে ক্ষণে আবির্ভূত হইতেছে, আবার পরক্ষণেই সেই সাগর-সলিলে লীন হইয়া যাইতেছে। তেমনি জীব, উদ্ভিদ, অপরাপর ভূতসমূহ একমাত্র সেই পরম আত্মা হইতে উদ্ভূত হইয়া, আবার তাহাতেই বিলীন হইতেছে। সুতরাং সবই এক। সবই এক হইতে উদ্ভুত, একে অবস্থিত আবার একেই লয়প্রাপ্ত হয়। এই এককে ধরিয়া, একত্বে অবস্থানের নামই সাম্যে অবস্থান। সাম্যে অবস্থিত যে, সে পরকে পর অথবা আপনাকে আপন বলিয়া মনে

করে না। তাহার নিকট সবই সমান—সবই এক। আত্মায় অবস্থিত আত্মারাম আত্মার তত্ত্ব স্বরূপত জানিয়া নির্ব্বিকার ভাবে অবস্থান করে। কেহই তাহার দ্বেষ ঘৃণা অথবা স্নেহ প্রীতির পাত্র হয় না। আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ—আত্মায় অবস্থিত ব্যক্তি মহাপুরুষ। কেবল তিনিই এ সংসারে সুখ দুঃখের অতীত, জ্ঞান অজ্ঞানের অতীত, সত্য মিথ্যার অতীত। তিনি আত্মাকে যথার্থরূপে অবগত হইয়া, আনন্দস্বরূপ আত্মাই হইয়া যান। আপনি যদি প্রকৃতপক্ষে আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া থাকেন, তবে আপনি কখনই আমাকে পৃথক ভাবে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিবেন না। কিন্তু দেখিতেছি আপনার এখনও ভেদভাবের মোহ তিরোহিত হয় নাই। তাহা হইলে আপনি কেন উচ্চ নীচ বলিয়া, জাতি বর্ণের বিচার করিয়া, ভেদজ্ঞানে এমন ঘৃণা দ্বেষের বশবর্ত্তী হইবেন? যথার্থ আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষের মনে এমন ভাবের উদয় হওয়া বিধেয় নহে।'

শঙ্কর যতই শপচের কথা শুনিতে লাগিলেন, তাঁহার বিস্ময় কৌতূহল ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শপচের উপদেশপূর্ণ উপাদেয় বাণী শুনিবার জন্য তিনি ততই আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। শঙ্কর কহিলেন—'আত্মতত্ত্বই সংসারের একমাত্র সার তত্ত্ব; আত্মতত্ত্ব অধিগত হইলে—আত্মাকে স্বরূপত জানিতে পারিলে, মোহজনিত ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়। বাস্তবিক মানব যতদিন আত্মাকে স্বরূপত না জানিতে পারে, ততদিন সে মায়া গর্ত্তের অন্ধ কূপে মূঢ় অবস্থায় অতিবাহিত করে। কেবল তত্ত্বজ্ঞান

—আত্মার স্বরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে জীব আত্মোদ্ধারে সমর্থ হইয়া থাকে। যে, আত্মাকে উদ্ধার করিয়াছে—আত্মার স্বরূপ তত্ত্ব বুঝিয়াছে সে জানে একই মাত্র নিগুর্ণ নির্ব্বিকার আত্মা সর্ব্বভূতে বিরাজিত। তাহার পক্ষে ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হওয়ায়, সে সর্ব্বভূতে আপনাকে ও আপনাতে সর্ব্বভূত দর্শন করে। সুতরাং সে কাহারও দ্বেষ বা ঘৃণা করে না।'

শঙ্কর শপচের অপূর্ব্ব অমূল্য বাক্য সমূহ শ্রবণ করিয়া বিমুগ্ধ স্তম্ভিত হইলেন। তখন তিনি হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সম্মুখ হইতে নিমিষে সেই সহচরগণসহ শপচমূর্ত্তি অন্তর্ধান করিয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে জটাভার সমাকীর্ণ এক মহৎকায় দিব্য পুরুষ তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়াছেন। তদ্দর্শনে শঙ্কর অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। দিব্য পুরুষ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ দ্বারা প্রসাদিত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

একদা শ্রীপর্ব্বত সন্নিধানে অবস্থান কালে তাঁহার নিকট এক কাপালিক যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল। এই কাপালিকের নাম উগ্রভৈরব। কি আকৃতি কি প্রকৃতি উভয় ভাবেই উগ্র ভৈরব নামের সার্থকতা সাধন করিয়াছিল। তাহার স্বভাব যেমন উগ্র ছিল, মূর্ত্তিও তেমনি প্রখর ভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হইত। তাহাকে দেখিলে সাধারণ লোকে ভীত চঞ্চল হইয়া উঠিত। তাঁহার কণ্ঠস্বর বা কর্কশ কথা শ্রবণ করিলে সকলেই আশঙ্কান্বিত হইত। শ্রীপর্ব্বতের সানুদেশে আশ্রম স্থাপন করিয়া সেই উগ্রপ্রকৃতি উগ্রভৈরব ভীষণ বিভৎস ধর্ম্ম কর্ম্মের আচরণ

অনুষ্ঠান করিত। সে ধর্ম্ম উপদেশ শ্রবণের ও সদালাপনের ছিলা ধরিয়া শঙ্করের নিকট গমনাগমন করিতে লাগিল সুরাপানে তাহার চিত্ত সর্ব্বক্ষণ বিহ্বল চক্ষু রক্তবর্ণ ও বাক্যে স্খলন ঘটিত। মহামতি শঙ্কর তাহা দেখিয়াও তাঁহাকে ঘৃণা উপেক্ষা করিতেন না। তিনি সকলেরই যথার্থ হিতৈষী ছিলেন। কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা ঘৃণা কখনই প্রদর্শন করিতেন না। কাপালিক নিজ ধর্ম্মের সত্যতা ও সারবত্বা সম্বন্ধে শঙ্করের সহিত নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিত। শঙ্কর তাহাকে প্রকৃত সত্য ধর্ম্মের সারতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন। এইরূপে উভয়ের মধ্যে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ক্রমে বিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল কুধর্ম্ম ও অপধর্ম্ম নিবারণের জন্যই শঙ্করের আবির্ভাব। তিনি সর্ব্বস্থলে সর্ব্বকালে অপধর্ম্ম অনুষ্ঠীতা ব্যক্তিগণের সহিত তর্ক করিয়া ও নানারূপ সৎ উপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদের কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাস অপনোদনের চেষ্টা করিতেন। তিনি এইরূপে যাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন, তাহাদের অনেকেই তাঁহার সার সত্যধর্ম্ম মত গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য কৃতার্থ বলিয়া মনে করিত। কেবল অন্ধ তমসাচ্ছন্ন হতভাগ্য যাহারা তাহারাই তাঁহার মহান ধর্ম্মের মর্ম্ম—অদ্বৈত সারতত্ত্ব বুঝিতে ও হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ না হইয়া ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইত। বহু কাপালিক ও বিরুদ্ধধর্ম্মী বহু ব্যক্তি স্বীয় আচার ও অনুষ্ঠানকে মুক্তিপ্রদ বা জ্ঞানপ্রদ বলিয়া মনে করুক আর নাই করুক, আশু সুখ-প্রদ এবং আপত-মধুর বলিয়া বোধ

করিত এবং কেবলমাত্র দেহইন্দ্রিয়াদি সুখের জন্ম বা পরকালে সামান্য ভোগসুখের জন্য আপন আপন ভ্রান্তমতে ও ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইত। তৎকালের অধিকাংশ কাপালিক আধুনিক নেড়ানেড়ির ন্যায় দূরাচার ছিল। উগ্রভৈরবও সেইরূপ ভ্রষ্টাচার হইয়া কুপন্থার অনুসরণ করিত। সে আচার্য্য দেবের উপদেশ বা মোক্ষপ্রদ ধর্ম্ম মত অনুসরণ না করিয়া স্বীয় পরিতুষ্ট পন্থায় পরিচালিত হইতে লাগিল। সেই হতভাগ্য ভ্রান্তবুদ্ধির বশে বুঝিল যে আচার্য্য দেবের ন্যায় মহাজ্ঞানী পুরুষকে বলি দিয়া তাহার অভীষ্ট দেবীকে পরিতুষ্ট করিবে। সে স্থির বুঝিল ইহাই দেবীর অভিপ্রেত ও দেবীও তাহাকে সেইরূপ প্রত্যাদেশ করিয়াছেন। এই বুঝিয়া সে ক্রমাগত আচার্য্য দেবের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিল। আচার্য্য দেব সততই সতর্ক শিষ্য মণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিবৃত থাকিতেন। সুতরাং তাঁহাকে নিভৃতে নির্জ্জনে বধ করিয়া বলি প্রদান করা নিতান্ত অসম্ভব। সে জানিত যে আচার্য্য দেব অতি মহানুভব সদাশয়। বিশেষতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি সততই পরম উদার প্রকৃতি। তাহাকে আন্তরিক ইচ্ছা জানাইয়া সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলে, সে অনুরোধ তিনি কখনই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। অতএব তাঁহাকে গোপনে বলির নিস্ফল চেষ্টা না করিয়া তাঁহার সম্মতি ক্রমে কার্য্য সাধন করাই কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থির করিয়া সেই প্রস্তাব আচার্য্য দেবের নিকট গোপনে উপস্থিত করিবার জন্য সে সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

একদা সন্ধ্যার সময় শিষ্যগণ উপাসনা ও সন্ধ্যা বন্দনাদি ব্যপদেশে জলাশয়ের সন্নিধানে গমন করিলেন। কেহ বা পর্ব্বতের পাদদেশে সান্ধ্য ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য্য দেব একাকী বসিয়া আত্মধ্যানে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আত্মসংযমে নিরত হইলেন। তখন তাঁহার নিকটে কেহই উপস্থিত ছিল না। সুযোগ বুঝিয়া কাপালিক উগ্রভৈরব ধীরে ধীরে আচার্য্য দেবের সন্নিকটে আসিল। আচার্য্যদেব সকলকেই সমাদরে গ্রহণ করিতেন। শত্রু বা মিত্র বলিয়া অথবা নীচ বা উচ্চ বলিয়া তাঁহার নিকট কোনরূপ পার্থক্য ছিল না। তিনি সকলকেই সমদৃষ্টিতে দর্শন করিতেন। যদিও উগ্রভৈরব নিতান্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোক ও তাহার ধর্ম্ম আচরণাদি নিতান্ত কলুষ-কালিমায় কলঙ্কিত ছিল, তথাফি আচার্য্য দেব তাহাকে কোনরূপ ঘৃণা বা অবহেলা করিতেন না। পক্ষান্তরে সৎ উপদেশে তাহার মতি গতি পরিবর্ত্তনের জন্য সর্ব্বপ্রকারে যত্ন করিতেন। সর্ব্ব জীবে দয়া প্রদর্শন—সৎ ও মোক্ষ ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞান বিতরণে পতিত মানবগণের উদ্ধার সাধন তাঁহার জীবনের একমাত্র চরম পবিত্র ব্রত ছিল। উগ্রভৈরব নিকটে আগমন করিলে, আচার্য্য দেব তাহাকে উপবেশন করিতে কহিলেন। উগ্রভৈরব উপবিষ্ট হইলে আচার্য্য প্রফুল্ল বদনে তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। উগ্রভৈরব উত্তর প্রদান করিয়া কিছুক্ষণ নীরবে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। আচার্য্য দেব তাহার ভাব দেখিয়া কহিলেন—'আপনাকে আজি এমন বিষণ্ণ ভাবাপন্ন দেখিতেছি কেন?

আপনি স্বার্থত্যাগী পুরুষ। আপনার গতিবিধি ও আচরণ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় আপনি যথার্থ ই সন্ন্যাসী। সংসারে আপনার কিছুমাত্র আসক্তি নাই। আপনার বিষয় সম্পদ কিছুই নাই এবং স্ত্রী পুত্রাদিও কোন আত্মীয় স্বজন নাই। আপনি কি জন্ত—কাহার নিমিত্ত বিষয় বিভবের জন্য লোভী হইবেন? যাহার বিষয়ে অসক্তি নাই তাহার অশান্তি বা অসন্তোষের কারণ বা কি থাকিতে পারে—কি হইতে পারে? কেবল তিনিই যথার্থ জানেন যে বাহ্য সংসারে যাহা কিছু সকলই স্বপ্নদৃষ্ট দ্রব্যাদির ন্যায় নিতান্তই মিথ্যা। ব্যবহারিক ভাবে তাহাদের অস্তিত্ব থাকিলেও পারমার্থিক ভাবে তাহাদের সত্ত্বা আদৌ নাই। শীত উষ্ণাদি দ্বন্দও মায়াজৃম্ভিত কল্পনা-কুহক ব্যতীত আর কিছুই নহে। আপনার দৈহিক অবস্থা শারিরিক দৃঢ়তা দেখিয়া মনে হয় ভূতগণও আপনাকে প্রপীড়িত করিতে পারে না। তবে আপনাকে আজি এরূপ বিষণ্ণ বলিয়া মনে হইতেছে কেন?'

কাপালিক তোষামোদে কহিল—'আচার্য্য, আপনি পরম জ্ঞানী পুরুষ। আপনি সকল গুঢ়তত্ত্বই সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন। ধর্ম্মই মানব জীবনের পরম শান্তি। তাই মানব জীবন সকল জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এমন মানবজীবন লাভ করিয়া, যে ধর্ম্ম সাধন করিতে না পারে সে নিতান্তই হতভাগ্য।"

কাপালিকের কথা শুনিরা আচার্য্য দেব কহিলেন—'ধর্ম্মই জগৎকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। ধর্ম্ম বিশ্বের উৎপত্তির কারণ

—সংস্থিতিরও কারণ। এই বিশ্ব মায়া ভ্রমে প্রভাসিত হইতেছে। বিশ্বই সংসারের প্রকটিত প্রতিমূর্ত্তি। মানবের যাহা কিছু দুঃখ আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক সকলেরই মৌলিক হেতু স্থূল বিশ্ব ও সংসার। বিশ্ব ও সংসার দেহ ইন্দ্রিয়াদির সংসর্গে ও সংস্পর্শে আসিয়া দেহীর দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির অশান্তি ও চাঞ্চল্য উৎপাদন করে। আর সেই সকল হইতে জীবের ভোগ বিলাস ও বাসনা সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। বাসনা ও অশান্তি সর্ব্ব প্রকার দুঃখ যন্ত্রণার হেতুভূত উপাদান। একমাত্র ধর্ম্মের সাধনে মানব, সংসার ও বাসনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া মহা মুক্তির অধিকারী হইরা থাকে। ধর্ম্ম যেমন জগৎ সংসারকে ধারণ করিয়া তাহাদের সংস্থিতি সংরক্ষণ করেন, তেমনি মানবের আশ্রয় অবলম্বন দণ্ডরূপে তাহার উন্নতি উৎকর্ষনের পন্থা প্রদর্শন করেন। অপর সকল জীব সৃষ্টি প্রবাহ রক্ষার জন্য উদ্ভূত হয়, আর মানব ধর্ম্ম রক্ষার জন্য আবির্ভূত হইয়া থাকে।

কাপালিক কহিল—'ধর্ম্মই পরম ও চরম সারতত্ত্ব। কিন্তু বহু মানব প্রকৃত ধর্ম্মের স্বরূপ ও তাহার গুঢ় মর্ম্ম কথা উপলব্ধি করিতে পারে না।

আচার্য্য কহিলেন—'সেই ভ্রমের জন্যই জগতে ধর্ম্ম মত লইয়া এতো পার্থক্য। সেই কারণেই ধর্ম্মের পথ এতই বিভিন্ন যে সেই সকল বিভিন্ন পথের একত্ব সাধন যেন মানবের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। অবশ্য অধিকারী ভেদে ধর্ম্মের ধারণা—ধর্ম্মের মর্ম্ম ধর্ম্মের মূর্ত্তি নানারূপ হইয়া থাকে, কিন্তু চরমে

তত্ত্ব ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকলের পক্ষে একই রূপ সমভাবাপন্ন।

কাপালিক কহিল;—'কলিতে একমাত্র ধর্ম্ম—তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মই সত্য সার ধর্ম্ম যে ধর্ম্ম স্বয়ং সদাশিব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্মসাধকের একমাত্র অবলম্বনীয়। সেই পরম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে মূঢ় অন্য ধর্ম্ম পন্থায় পদার্পণ করে সে হতভাগ্য সুশীতল বারি মনে করিয়া মরুভূমে মারিচিকার প্রতি প্রধাবিত হইয়া থাকে। একেই তো ঘোর কলি যুগের প্রাদুর্ভাবে সমুদয় সংসার বিষম তমসাচ্ছন্ন, তদুপরি ধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ বিকট পার্থক্য ও বিপ্লব বশতঃ মানব সমাজ এতই প্রপীড়িত যে বর্ত্তমানে তাহার উদ্ধার যেন একান্তই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। তাই বুঝিয়াই দেবাদিদেব মহাদেব কলির পতিত পরিতপ্ত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য যেমন সংক্ষেপে ধর্ম্মের গতি ও গুঢ় সারতত্ত্ব উপদেশ দিয়াছেন তেমনি সেই মহৎ ধর্ম্ম সাধনের সুখময় সরল পন্থাও প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই সরল পন্থা অবলম্বন করিয়া এই সঙ্কট সঙ্কুল যুগের মূঢ় অন্ধ মানব মহা মঙ্গলময় শিবলোক লাভ করিয়া জীবন জন্ম সফল করিয়া থাকে।

আচার্য্য কহিলেন—'দেবাদিদেব কথিত ধর্ম্মই প্রকৃত মোক্ষের পথ। তিনি স্বয়ং মোক্ষদাতা জগৎ ত্রাতা। তিনি যে ধর্ম্ম তত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছেন, সেই তত্ত্বই মহা নিষ্ঠাবানের একমাত্র উপায়। কিন্তু সংসারের বহু শিবভক্ত দেবাদিদেবের উপদেশ বুঝিতে পারে না—এবং তাহার অনুবর্ত্তন করিতেও সমর্থ

হয় না। তখনই শৈবগণের মধ্যে আবার বহু ভাবের বহু পৃথক পন্থা বহির্গত হইয়াছে। ইহা কিন্তু দেবাদিদেবের ধর্ম্ম-প্রণালীর উদ্দেশ্য নহে। কেননা প্রকৃত মোক্ষধর্ম্ম জগতে এক ভিন্ন দুই নহে বা দুই কখন হইতেও পারে না। চরমে সকল পন্থাই একই ভাবে সম্মিলিত হইয়া থাকে, তেমনি ধর্ম্মেরও বহু পথ চরমে এক নির্ব্বাণ-পন্থায় পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে।

কাপালিক কহিল—'চরমে বহু শৈব পন্থা প্রণালী একত্বে সম্মিলিত হইলেও, আদিম অবস্থায় প্রকৃতি গুণ ও কর্ম্ম ভেদে তন্মধ্যে বহু ভাবের পার্থক্য পরিকল্পিত হইয়াছে। জ্ঞান সকল মানবে কখনই সমান নহে। ব্যক্তি ভেদে পাত্র অনুসারে জ্ঞানের তারতম্য অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। জ্ঞান ভেদে গুণ ও কর্ম্মেরও পার্থক্য সংঘটিত হয়। যে যেমন গুণবান বা যেমন কর্ম্মী—তাহার ধর্ম্ম-মত এবং সেই ধর্ম্ম মত অনুসারে ধর্ম্মপথ নির্দ্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। হিন্দুর অপর সকল ধর্ম্মের ন্যায়, শৈবধর্ম্মও অধিকারভেদে পন্থা প্রণালীর পার্থক্য নিরূপণ করিয়াছেন। সুতরাং অধিকারী ভেদে যেমন ধর্ম্ম মতের পার্থক্য তেমনি ধর্ম্ম-পথেরও পার্থক্য অবশ্যই ঘটিবে। প্রকৃতি ও গুণ অনুসারে ব্যক্তিগণ আপন আপন মন্তব্য বা আচরণীয় অনুষ্ঠেয় পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে।"

আচার্য্য দেব কহিলেন—'যে যাহাই বলুক, যাহাই করুক, দেবাদিদেব কথিত ও নিরূপিত ধর্ম্মের চরম তত্ত্ব মোক্ষপ্রদ পরম জ্ঞান। সেই পরম জ্ঞান মহা নির্ব্বাণের সারভূত উপায়

উপাদান। একমাত্র অদ্বৈততত্ত্ব সেই উপায় উপাদানের প্রকৃত স্বরূপ তত্ত্ব। আত্মজ্ঞান ও আত্মানুভূতির দ্বার দিয়া অদ্বৈত তত্ত্বে প্রবেশ করিতে হয়।'

কাপালিক কহিল—'উহা শুষ্ক জ্ঞান পন্থার অবিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত। ঐ সিদ্ধান্ত অনুসারে মানব কখনই পরম ধর্ম্মের কল্যাণ পথে গমন করিতে পারে না। পরা প্রকৃতি সকল কল্যাণের আকর স্বরূপী—তিনিই সর্ব্ব সিদ্ধি ধাত্রী। একমাত্র তাঁহার অনুগ্রহ—তাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে পারিলে, মানব এই জীবনেই চারি-বর্গের ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এ সকলই কেবল সেই মহাদেবীর করায়ত্ত। তিনি যাহার প্রতি সদয়া হন, সে এই জীবনে এই ধরাধামেই সর্ব্বসুখ উপভোগ করে ও পরজীবনে মহামুক্তি লাভ করিয়া নির্ব্বাণের অধিকারী হইয়া থাকে। তিনি বরাভয় লইয়া সাধককে অনুগ্রহ বিতরণের জন্য সতত আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার গুঢ় পূজার উপাদান প্রকরণ গুহ্য হইতে গুহ্যতম। বলি উপহার তাঁহার পূজা উপাদানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান।'

আচার্য্যদেব কাপালিকের কথায় বিস্মিত ভাবে তাহার মুখ পানে চাহিয়া কহিলেন—'কেবল দ্রব্য-পূজায় বা বাহ্য বলির উপহার প্রদান দ্বারা মহাশক্তির তুষ্টিসাধন মহাভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। যিনি মহাশক্তি বা আদ্যাশক্তি রূপে সংপূজিতা তিনি সাক্ষাৎ জ্ঞানময়ী জ্ঞানস্বরূপিনী। কেবল দ্রব্য-যজ্ঞে তাঁহার সম্পূর্ণ পরিতুষ্টি সাধিত হয় না। জ্ঞান যজ্ঞ-দ্বারা

অর্চ্চনা করিয়া মহাদেবীর প্রসন্নতা লাভ করিতে হয়। তদ্ভিন্ন তাঁহার অনুগ্রহ লাভ হয় না—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্ক নিতান্ত অসম্ভব হইয়া উঠে। তাঁহার সাক্ষাৎ ভিন্ন অপর অনুগ্রহ আর কি হইতে পারে? অতএব প্রকৃত সাধক যিনি তিনি সর্ব্বকাজে সর্ব্ব অবস্থায় প্রকৃত জ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব কি তাহার অনুসন্ধান করিবেন এবং সেই তত্ত্ব অবগত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাহারই অনুসরণ করিবেন। একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই সাধককে মুক্তির পথে লইয়া যায় ও মহানির্ব্বাণের নিকেতন প্রদর্শন করে। আত্মার যথার্থ স্বরূপ বোধ দ্বারা অদ্বৈত তত্ত্বে স্থিতিলাভ করিলে তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণ পুষ্টি সাধিত হয়।'

কাপালিক কহিল—'সে সকল ভ্রান্তিময় কল্পনা মাত্র। তাহাতে প্রকৃত ধর্ম্মসাধনা হয় না। বরং ধর্ম্ম-বিড়ম্বনা ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সামান্য ভূতশুদ্ধি, অঙ্গন্যাস, মুদ্রাদি সাধন করিতে অক্ষম, সে কখন স্থূল তত্ত্বের লয় সাধন দ্বারা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। ফলত সে সকল সাধনা কলির পতিত জীবের পক্ষে কখনই উপযুক্ত বা বিধেয় হইতে পারে না। কলির পক্ষে উগ্র বিহিত সাধনাই প্রকৃষ্ট সাধনা। সেই সাধনার সিদ্ধিও সুখলভ্য, সহজ ও একান্তই সরল। তাহাই বুঝিয়া আমি সেই পরম পন্থার পথিক হইয়াছি। যদিও এই পন্থা কলিকালের উপযুক্ত ও নিতান্ত সহজ, তথাপি ইহার কতকগুলি প্রক্রিয়া প্রণালী অতীব কঠিন ও দুঃসাধ্য। দুঃসাধ্য হইলেও তৎসম্বন্ধীয় সিদ্ধি সুনিশ্চিত এবং মহান ও আশু ফলপ্রদ। সেই জন্যই আমি

আপনার নিকট প্রার্থী হইয়া আসিয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রার্থনা পরিপূর্ণ করুন। আপনি স্বভাবতঃ পরম দয়াবান ও জ্ঞানবান। সর্ব্বভূতই আপনার নিকট প্রিয়; কেহই আপনার দ্বেষ বা ঘৃণার পাত্র নহে। আপনি সমদর্শী এবং সর্ব্ব জীবের হিতকারী। ধর্ম্ম-সংরক্ষণ, ধর্ম্মপ্রতিপালন আপনার জীবনের একমাত্র মহাব্রত। আমার ধর্ম্ম-সাধন যাহাতে সিদ্ধিলাভ করে, তৎপক্ষে আপনি সহায় হউন।'

আচার্য্য কহিলেন,—'আপনার ধর্ম্মের কিরূপ অনুষ্ঠান এবং আমি কি প্রকারে আপনার সাহায্য করিতে পারি, তাহা অকপটে আমায় পরিব্যক্ত করুন। আমি আপনার ধর্ম্ম সাধনের পক্ষে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।'

কাপালিক কহিল—'আচার্য্য, আপনি অবশ্য বুঝিয়াছেন, জীব-বলি দ্বারা দেবীর পরিতুষ্টি সাধন আমার ধর্ম্মের নিগূঢ় বীজ স্বরূপ। জীবের মধ্যে নরবলি উপহারে দেবীর পূজায় সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য। নরের মধ্যে যিনি বিদ্যা ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য তাঁহাকে দেবীর নিকট বলি উপহার প্রদান করিলে অতি মহৎ ফল অনায়াসে মদীয় করতলগত হইবে। তাহাতে যে কেবল আমারই সুফল লাভ হইবে তাহা নহে, যাহাকে বলিরূপে দেবীকে উপহার প্রদত্ত হইবে তাহারও পরকালে পরম গতি সাধিত হইবে। তাই আপনার নিকট আমার সানুনয় প্রার্থনা আপনি বলিরূপে দেবীর প্রীতি সাধন করুন। তাহাতে

আমার মহাসাধনায় যেমন সিদ্ধিলাভ ঘটিবে, তেমনি আপনারও পরকালে পরম মঙ্গল-লোক উপভোগ হইবে।'

আচার্য্যদেব কহিলেন,—'এ কিরূপ ধর্ম্ম? এ ধর্ম্মের মর্ম্ম কথা জ্ঞানবান্ মানব-বুদ্ধির অতীত। জীবের জীবন, মনুষ্যের জীবন হত্যা করিয়া যে নিষ্ঠুর ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাতে ইহ-কালে কোন সুফল লাভ হয় না, পরকালেও কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। কেননা স্থূল সাধারণ বুদ্ধিতে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে জীবমাত্রেই সৃষ্টি-প্রসবিনী মহাশক্তির সৃজন লীলার অঙ্গ। তিনিই লীলাছলে বহুজাতীয় প্রাণী সৃষ্টি করিয়া লীলা করিতেছেন। তিনিই তাহাদিগকে পালন করিতেছেন। অবশেষে তিনি তাহাদিগকে প্রলয়-গর্ভে নিপতিত করিতেছেন। তাহার সৃষ্ট বা রক্ষিত ও প্রতিপালিত জীবকে ধ্বংস করিবার অধিকার তাঁহা ব্যতীত অপর কাহারও নাই—আর কাহারও থাকিতে পারে না। সেরূপ জীবহত্যায় পাপ ব্যতীত কখনই পুণ্য উপার্জ্জিত হইতে পারে না। ভাবিয়া দেখুন জীবন সকলেরই প্রিয়। কেহই স্বেচ্ছায় প্রিয়তম প্রাণকে পরিত্যাগ করিতে চায় না। অতি সামান্য কীট পতঙ্গ হইতে উৎকৃষ্ট মানব, দানব বা দেবগণ পর্য্যন্ত সকলেই জীবনকে রক্ষা করিবার জন্য সততই ব্যস্ত। যদি গর্ত্তের অভ্যন্তরস্থ কোন কীটকে হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা করা যায়, তবে সে তৎক্ষণাৎ নিজ প্রাণকে রক্ষা করিবার জন্য দ্রুতপদে গর্ত্তের অভ্যন্তরে পলায়ন করে। কেন সেই কীট পলায়ন করিয়া নিজ প্রাণকে রক্ষা করে? কারণ

একমাত্র প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম সামগ্রী আর তাহার দ্বিতীয় কেহই নাই। অনেকে মনে করে স্ত্রী পুত্র কন্যাদি বহু মানবের পক্ষে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম সামগ্রী। ইহা নিতান্তই ভ্রমাত্মক ধারণা। কারণ এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন স্থলে স্ত্রী-পুত্রাদি সহ আপনার জীবন নাশের আশঙ্কা থাকিলে, মানব সর্ব্বাগ্রে আপনার জীবন রক্ষার জন্যই ব্যগ্র হইয়া থাকে। তেমনি ঘোর বিপদের সময় স্ত্রী-পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া বিপদ-গ্রস্ত ব্যক্তি অগ্রে আপনার জীবন লইয়া পলায়ন করে। আবার দেখুন জীবনকে রক্ষা করিয়াই মানব স্বীয় অভীষ্ট সাধন করিয়া থাকে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ মানবের পক্ষে এই যে শ্রেষ্ঠ সাধন চতুষ্টয়, তাহাদেরও মধ্যে কোনটিই, জীবনকে রক্ষা করিতে না পারিলে সংসাধিত হইতে পারে না। সাধু মহাত্মার পক্ষে জীবন মৃত্যু উভয়ই অবশ্য তুল্য। তাঁহারা জীবনকে আনন্দের সামগ্রী অথবা মৃত্যুকে ভয়প্রদ ব্যাপার বলিয়া কখনই মনে করেন না। কিন্তু তেমন মহৎ জীব বিশ্ব সংসারে অতি অল্পই পরিদৃষ্টি হইয়া থাকে। যাহাহউক প্রাণ প্রাণী মাত্রেরই পক্ষে পরম প্রিয় সামগ্রী। জীবমাত্রেই এই প্রাণকে রক্ষা করিবার জন্য দৈহিক সর্ব্ববিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে ও সর্ব্ব প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকে। যিনি মহাশক্তি, যিনি মহামায়ারূপে বিশ্ব পালন করিতেছেন ও জীবকুলকে রক্ষা করিতেছেন, তিনি কখনই ইচ্ছা করেন না যে কেহ তাঁহার সৃষ্ট রক্ষিত বা প্রতিপালিত জীবকে হত্যা করে। বিশেষতঃ কেহ অপরকে বিনাশ করিয়া যে তাঁহার

প্রীতি সাধন করিতে পারে, ইহা নিতান্ত ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে সেরূপ চেষ্টা করিয়া অর্থাৎ কোন জীবকে বলি প্রদান করিয়া, দেবীকে পরিতুষ্ট করিতে চেষ্টা করে, সে নিতান্তই ভ্রমান্ধ আপনি আমাকে দেবীর সন্নিধানে বলি প্রদান করিয়া কি সিদ্ধি লাভ করিবেন?'

কাপালিক কহিল—'আমাদের সাধ্য ধর্ম্মের মর্ম্ম অতি কঠিন দুর্জ্ঞেয়। সে তত্ত্ব কেবল কর্ম্মী অধিকারী যিনি তিনি বুঝিতে পারেন। আপনি যদি সে পথের পথিক হইতেন, তবেই তাহা বুঝিতে পারিতেন। যখন আপনি ভিন্ন পন্থাবলম্বী, তখন আর আপনাকে সে সম্বন্ধে অধিক কি কহিব? অধিক কহিবার কোনই প্রয়োজন দেখিতে পাই না। কারণ আপনার ভাব প্রকৃতি দেখিয়া বোধ হইতেছে, আপনি আমার অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মের সত্যতা সারবত্তা বুঝিলেও, তাহা গ্রহণ করিবেন না—সে পন্থায় পরিচালিত হইবেন না।'

আচার্য্য দেব কহিলেন,—'জ্ঞানী সাধু সজ্জনের পন্থা এক ভিন্ন কখনই দুই হইতে পারে না। সে পন্থা কৈবল্য-প্রদ একমাত্র পন্থা—অদ্বৈত পন্থা। যখন মানব সেই অদ্বৈত পন্থার গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারে, তখনই সে মহামুক্তির অধিকারী হইয়া থাকে। অদ্বৈত তত্ত্ব প্রকাশক ধর্ম্মই সংসারে পরম ধর্ম্ম—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যখন মানব সর্ব্বভূতের প্রতি সম দৃষ্টিতে দেখিতে পারে, তখন সে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হয়। কারণ তখন সে জানে আমি প্রকৃত পক্ষে আমার দেহ নহি—আমি প্রকৃত পক্ষে আমার

ইন্দ্রিয়গণও নহি—আমি প্রকৃত পক্ষে আমার মনস বা বুদ্ধিও নহি। তখন তাহার জীবনে অতি গূঢ় জিজ্ঞাসা জন্মে, তবে আমি কে? এই জিজ্ঞাসার সূক্ষ্ম সূত্র ধরিয়া মানব আত্মতত্ত্বের যথার্থ জ্ঞানলাভ করে—আত্মার স্বরূপ বুঝিতে পারে। তখন আত্মজ্ঞানী বুঝিতে পারে আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই তাহার প্রকৃত স্বরূপ। সে আত্মারূপে স্বয়ং সর্বভূতে বিরাজিত সে কাহাকে হিংসা করে না—অপরে কেহই তাহাকেও হিংসা করে না। এমন হিংসাদ্বেষের অতীত যে পুরুষ তাহাকে কে বধ করিতে পারে? ফলে তিনি কাহাকেও বধ করেন না, তাঁহাকেও কেহ বধ করে না।'

কাপালিক আচার্য্যদেবের তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া কিছুকাল স্তম্ভিত হইয়া নীরবে রহিল। অবশেষে দৃঢ়কণ্ঠে দর্পভরে কহিল —'আপনি জ্ঞানপন্থার অনুসারী। আপনার পক্ষে সর্ব্ব জীব—সর্ব্বভূত সমান। কিন্তু সকলে সে গূঢ় ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারে না—ধারণ করিতেও পারে না। যাহাহউক ধর্ম্মের তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম। সে তত্ত্ব সকলে বুঝিতে পারে না—সকলের পক্ষে সমানও নহে। আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই আমার ধর্ম্ম—তাহাই আমার গ্রাহ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। এক্ষণে দেবীর প্রত্যাদেশ অনুসারেই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার অনুরোধ রক্ষা করুন।'

আচার্য্যদেব হাস্য বদনে কাপালিকের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। বোধ হয় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—ধর্ম্মের কি

শোচনীয় অবস্থা! আর কাপালিকের ধর্ম্ম কি ভীষণ ক্রিয়া কলাপে বিজড়িত ও ইহারা কি নির্ম্মম-নিষ্ঠুর! জীব-হত্যা—সমজাতীয় মনুষ্য-হত্যা করিতে ইহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা পশ্চাৎপদ নহে। ইহাদের প্রকৃত ধারণা বিশ্বাসই বা কি? ইহারা কি সত্যই বিশ্বাস করে যে মনুষ্য-বলি প্রদান করিলে, দেবী আদ্যাশক্তি উহাদের প্রতি প্রসন্না হইবেন এবং উহাদিগকে মুক্তি ফল প্রদান করিয়া চিরতরে সংসার-বন্ধন হইতে উদ্ধার করিবেন?

এই বলিয়া তিনি কাপালিকগণের ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। উগ্র ভৈরব কহিল, 'আচার্য্য, আপনি যেমন জ্ঞানী তেমনি সদাশয়। আপনি ইচ্ছা করিলে সহজেই আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার অনুষ্ঠান আদি সাধন-ক্রিয়া সফল হইতে পারে। আমি জানি—দেবীর কৃপায় সম্যক অবগত হইয়াছি যে যে শুভকালে আপনি দেবীর বলির জন্য আপনাকে আমার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিবেন তখনই আমি মহৎ ফল লাভ করিব। কারণ জ্ঞানী ব্যক্তিগণের বলিতে দেবীর যেরূপ সন্তোষ সাধিত হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। আপনি আমাকে কৃপা করুন—আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। দেবীর বলির জন্য আত্মদান করিতে কৃতসংকল্প হউন।'

এই বলিয়া উগ্রভৈরব করযোড়ে কাতরকণ্ঠে আচার্য্যের নিকট তাঁহার দেহ-বলি প্রার্থনা করিতে লাগিল। সে বেশ বুঝিয়াছিল যে আচার্য্যদেব যেরূপ শক্তিবান্ সুদক্ষ শিষ্যবর্গে সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকেন এবং তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে যেরূপ

প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসে তাহাতে তাঁহাকে দেবীর জন্য বলিদান নিতান্ত সহজসাধ্য নহে। তাই বুঝিয়াই সে বারম্বার আচার্য্য দেবের নিকট কাতর ভাবে প্রার্থনা করিয়া কহিতে লাগিল— 'আপনি মহাজ্ঞানী পরম পণ্ডিত। জীবন মৃত্যু আপনার নিশ্চয়ই সমান। আপনি কখনই মৃত্যুভয়ে ভীত নহেন। আমি আপনাকে কতদিন বলিতে শুনিয়াছি যে মৃত্যু জীবাত্মার একটা ভাব পরিবর্ত্তন ব্যতীত আর কিছুই নহে—দেহান্তর এক বসন ত্যাগ করিয়া অপর বসন পরিধান ব্যতীত আর কিছুই নহে। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে মৃত্যু দেহেরই পরিবর্ত্তন মাত্র। তাহাতে দেহীর কোন পরিবর্ত্তন বা অপক্ষয় কিছুই ঘটে না। দেহী যে সে যথার্থই চৈতন্যময় আত্মাস্বরূপ! আত্মা চিরদিনই অবিকৃত। তাই আত্মার নাম নির্ব্বিকার নিরঞ্জন। তাহার বৃদ্ধিও নাই ক্ষয়ও নাই। যে দেহ ছাড়িয়া আপনাকে সেই নির্ব্বিকার নিরঞ্জন বলিয়া যথার্থরূপে বুঝিয়াছে, তাহার দেহ পরিবর্ত্তনে ভয়ই বা কি ভাবনাই বা কিসের? প্রকৃত পক্ষে দেহের সহিত তাঁহার কোনই সম্বন্ধ নাই। তিনি বিশদ ভাবে বুঝিয়া থাকেন যে দেহের সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ তাহা কেবল মায়া মোহের ভ্রম মরিচিকা বিশেষ। আপনি মহাত্মা মহাজ্ঞানী। দেহ হইতে আত্মার পৃথক ভাব আপনি প্রকৃষ্টরূপেই অবগত আছেন। আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তিরাই দেহ ধারণ করিয়াও যথার্থ মৃত্যুঞ্জয়। দেহের অসারত্ব অলীকত্ব আপনি প্রকৃত পক্ষে অবগত আছেন। অতএব আমার প্রতি

কৃপা করিয়া আমার ধর্ম্ম সাধনের পক্ষে সহায় হউন। দেহ দান করিয়া দেবীকে প্রসন্ন করুন—আপনার দেহ জীবন সফল সার্থক করুন। ইহাই আপনার নিকট আমার একান্ত প্রার্থনা।’

এই বলিয়া কাপালিক উগ্রভৈরব আচার্য্য দেবের সম্মুখে অতি বিনীত ভাবে নীরবে উপবিষ্ট রহিল। আচার্য্যদেব তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন—‘কাপালিক তোমার কাথা শুনিয়া মনে হইতেছে, তুমি ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইয়াছ। তুমি যখন আত্মার স্বরূপ তত্ত্ব বুঝিয়াছ, তখন তোমার নিকট অন্য কোনরূপ ধর্ম্ম সাধন অনাবশ্যক। আত্মধ্যান, আত্ম-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ কর। কোন জীবের বলি বা নরবলি প্রদান করিয়া তুমি আর কি ফল লাভ করিবে? আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি আবার বার বার বলিতেছি তুমি ভ্রান্ত পথ—ধর্ম্ম সম্বন্ধে—ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ কর। যাহা পরম ধর্ম্ম—যে ধর্ম্মে অদ্বৈত তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়, তাহাতেই ব্রহ্ম-উপলব্ধ হইয়া থাকে। একমাত্র ব্রহ্ম উপলব্ধিতেই মহামুক্তি পরমানন্দ অধিগত হইয়া থাকে। তুমি সেই পরম ধর্ম্ম কথা কহিলে। তাহাই গ্রহণ করিয়া জন্ম জীবন সফল কর।’ আচার্য্য দেব অনেকরূপে দুষ্ট কাপালিক উগ্রভৈরবকে বহু প্রকারে গূঢ় ধর্ম্মের সারতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। ভ্রান্তমতি দুষ্টস্বভাব কাপালিক মোহাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহার তত্ত্ব কথা বুঝিতে পারিল না। তাহার দুর্ভাগ্য বশতঃ আচার্য্যদেব কথিত পরম ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণের

সামর্থ্যও তাহার হইল না। তিনি যে আত্ম-তত্ত্বের গূঢ় রহস্য তাহাকে বুঝাইলেন, আপনার পক্ষ সমর্থনের জন্য তাহারই প্রতিবাদে সে কহিল ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। আপনি যে আত্মতত্ত্ব অদ্বৈত তত্ত্বের কথা কহিলেন সে সকল সেই সেই ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে সার ও সত্য বলিয়া গৃহীত ও সমাদৃত। আমার পক্ষে যাহা সত্য তাহাই গ্রহণ করা ও তাহার অনুষ্ঠান করাই আমার কর্ত্তব্য। আপনার তৎপক্ষে আমার সাহায্য করাই বিধেয়। আচার্য্য কহিলেন—"তোমাকে সাহায্য করিতে হইলে—তোমার ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে—ধর্ম্ম সাধনায় সহায়তা করিতে হইলে আমাকে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। আত্মাহুতি প্রদানে দেবীর জন্য এই দেহ—এই জীবন বলি রূপে উৎসর্গ করিতে হয়। ইচ্ছা করিয়া কোন জীব জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারে? বিশেষতঃ ইচ্ছা করিয়া জীবনকে রক্ষা না করিয়া যে ইহার বিনাশ সাধন করে বা বিনাশ সাধনের সাহায্য করে সে কি আত্মঘাতী নয়? তাহার ইহকালে বা পরকালে কোথায় মঙ্গল লাভ হইতে পারে? একথা একবার তোমায় কহিয়াছি। পুনরায় কহিতেছি। ভাবিয়া দেখ জীবনকে রক্ষা করিয়াই ধর্ম্ম সাধন করিতে হয়। দেহকে ধারণ করিয়াই আত্মোদ্ধার প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মঙ্গল মানব লাভ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ এই মানব দেহ মানব-জীবন সর্ব্ববিধ কল্যাণ লাভের উপায় স্বরূপ। ইচ্ছা করিয়া ইহার বিনাশ কি বিবেচক ব্যক্তির কর্ত্তব্য?'

কাপালিক কহিল—'আমি তো বহুবার আপনাকে কহিলাম

ধর্ম্মের জন্য দেহ প্রাণ সকলই বিসর্জ্জন দিতে পারা যায়। তাহাতে মহা পুণ্য ও মঙ্গলই লাভ হইয়া থাকে। বেদ বিধি বা অপর সকল শাস্ত্রই অবশ্য একথার সমর্থন করিয়া থাকে। তাহাতে কিছুমাত্র সংশয়ের কারণ নাই। আপনি বিবেকবান বিদ্বান বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন দেহ ক্ষণভঙ্গুর। দেহের অভ্যন্তরস্থ জীবন জলবিম্বের ন্যায় অলীক— এই আছে এই নাই। দেহ জীবন সত্যই অতি অকিঞ্চিৎকর। এই তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর পদার্থ দ্বারা যদি কাহারও মহৎ উপকার সাধিত হয় তবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাহাতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত বা পশ্চাতপদ হন না। ধর্ম্ম-সাধন অপেক্ষা মানবের মহৎ উপকার আর কি হইতে পারে? যাহাতে ইহলোকে পরলোকে উভয়লোকেই মঙ্গল লাভ হয় তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপকারী সামগ্রী আর কি আছে—আর কি বা হইতে পারে? এমন সামগ্রী অধিগত করিবার জন্য কি পরপক্ষে কি নিজপক্ষে, সকলেরই প্রাণপণে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ সাধু ও জ্ঞানীগণের জীবন, ধর্ম্ম সাধন ধর্ম্মরক্ষণ ও ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনের জন্য ব্যয় বা ক্ষয় হইলেই সে মহৎ জীবনের সার্থকতা ঘটিয়া থাকে। অতএব আমার একান্ত অনুরোধ বিনীত প্রার্থনা আপনি কৃপা করিয়া আমার ধর্ম্ম সাধনের সহায় হউন। আমার অভীষ্ট দেবতা আপনার মত জ্ঞানী পণ্ডিত বলিরূপে পাইলে পরম পরিতুষ্ট হইবেন। তাহাতে আমি ও আপনি আমাদের উভয়ের পরম কল্যাণ সংঘটিত হইবে।'

অজ্ঞ মূঢ় কাপালিকের এইরূপ বারবার কাতর প্রার্থনায় আচার্য্য দেবের সরল মহৎ হৃদয় বিচলিত হইলে তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—'এ কাপালিক সত্যই নিতান্ত ভ্রান্ত। ভ্রান্ত বিশ্বাসই ইহার ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম সাধন করিতে পারিলে হতভাগ্য নিজ জীবনকে সফল সার্থক বলিয়া মনে করিবে। সত্যই এ জীবন ক্ষণভঙ্গুর, এ দেহ নিতান্তই নশ্বর। এই দেহ জীবন দান দ্বারা যদি কাহারও আত্মার চরিতার্থতা সাধিত হয়, তবে তাহা বুদ্ধিমান বিবেচক ব্যক্তির অবিলম্বে করাই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ এ ব্যক্তি আমার একান্ত শরণাপন্ন হইয়াছে। বিজ্ঞজনের অভিমত এই যে, যে ব্যক্তি শরণ গ্রহণ করে, প্রাণ দিয়াও তাহার উপকার করা সর্ব্বতোভাবেই বিধেয়। যে জীবন পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় অতীব চঞ্চল—যে দেহ যে সংসার মরুভূমে মরিচিকার ন্যায় ভ্রমের কুহক মাত্র তাহাদিগের নিপাতন দ্বারা যদি কোন আত্মার পরম তুষ্টি সাধিত হয়, তবে তাহাতে কুণ্ঠা করা কোন বিচারক মানবের কর্ত্তব্য নহে। এই চিন্তা করিতে করিতে আচার্য্যদেব কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তৎপরে কাপালিককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'তোমার ধর্ম্মমত নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল তমসাচ্ছন্ন। কিন্তু তুমি জ্ঞান বিশ্বাস ও ভক্তিপূর্ব্বক সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমার তুচ্ছ দেহ বা জীবন দান দ্বারা যদি তোমার সেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের সার্থকতা ঘটে, তবে আমি তাহাতে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হইব না। কারণ মৃত্যুভয়ে আমি কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত

নহি। কারণ জন্ম বা জীবনের নামান্তর বা ভাবান্তরই মৃত্যু। জন্মলাভ করিবামাত্রই মৃত্যু সতত জীবনের অনুসরণ করিয়া থাকে। সুযোগ পাইবামাত্র মৃত্যু জীবনকে গ্রাস করে। জীবন যতই যত্নে বা যতই সতর্কতার সহিত রক্ষিত হউক না কেন, মৃত্যুর হস্ত হইতে সে কিছুতেই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। জীবন অনিশ্চিত কিন্তু মৃত্যু অতীব নিশ্চিত। ইহার বিপরীত বুদ্ধির নাম মায়া। সেই মায়া-জনিত ভ্রম জনিত মোহ হইতে দেহ জীবনে এবং দেহ জীবন হইতে সংসারে মহা আসক্তির উদয় হইয়া থাকে। এই মায়া-পাপকে দৃঢ় জ্ঞান অসি দ্বারা ছেদন করাই যথার্থ মনুষ্যত্ব—এবং তাহাই প্রকৃত মহত্ত্ব। মনুষ্য সুখলাভের জন্য এবং লব্ধ সুখ উপভোগের জন্যই জীবনভার বহন করিয়া থাকে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ মানব জীবনে প্রকৃত সুখ কোথায়? শিশু অবস্থা অতি অজ্ঞানেরঅবস্থা। অজ্ঞানের অবস্থা দুঃখের অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যৌবন অবস্থাকে মূঢ় মানব সুখের অবস্থা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। কারণ যৌবনকালে স্থূল ইন্দ্রিয় বর্গের চরিতার্থতায় মনুষ্য ক্ষণিক উত্তেজনা বা পাশব-সুখ মাত্র অনুভব করিয়া থাকে। সে সুখে প্রকৃত আনন্দ বা যথার্থ শান্তির লেশ মাত্র নাই। তেমন সুখের অবস্থাকে কোন বিচারক বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রকৃত সুখের দশা বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে? আর বৃদ্ধ অবস্থা, জরাজীর্ণ অবস্থা দুর্ভাবনাদির আকর বিশেষ। সে দশায় সুখের আশা মূঢ়তা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এইরূপ বিশেষ বিবেচনা

করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে জীবন কেবল একটা সুদীর্ঘ দুঃখের ধারা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এমন জীবন জীবের সন্তোষ সাধনে ব্যয়িত হওয়ায় লাভ ভিন্ন কোনই ক্ষতি পরিদৃষ্ট হয় না। কাপালিক তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমি তোমার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিব।'

হতভাগ্য কাপালিক আচার্য্যদেবের কথা শুনিয়া পরম আনন্দিত হইল। সে বুঝিয়াছিল, আচার্য্যদেবের কথা ও কার্য্য একই। তিনি মুখ দিয়া যাহা বলিবেন, তাহা নিশ্চয়ই প্রতিপালন করিবেন। এই ভাবিয়া তাহার প্রাণে আশার দীপশিখা প্রবল বেগে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। সে আনন্দভরে মহা উৎফুল্ল হইয়া কহিল—'আপনার মুখের কথাই সাক্ষাৎ সত্য স্বরূপ। আপনার কথায় আজি আমার মন প্রাণ আশ্বস্ত হইল। আমি যথাসময়ে বলির অনুষ্ঠান জন্য আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইব। আচার্য্য কহিলেন—'কাপালিক, কোন সময়ে আমার দেহ বলিদানের অনুষ্ঠান করিবে, ইহা বড়ই সমস্যার কথা। তুমি এখানে কিছু-কাল হইতে গতিবিধি করিতেছ। তুমি অবশ্যই অবগত হইয়াছ যে আমার শিষ্যগণ অনেকেই বিশেষ শক্তিশালী। তাহারা সকলেই নিতান্ত গুরুভক্ত। এমন কি আমার জন্য তাহারা আপন প্রাণকে অতি তুচ্ছ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। আমাকে রক্ষা করিবার জন্য শিষ্যগণ নিজ নিজ জীবন অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে পারে।'

কাপালিক উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"তবে উপায় কি ?

আপনি মহাত্মা। মহাত্মার যেরূপ করা কর্ত্তব্য আপনি তাহাই করিলেন। আমার হিতের জন্য—আমার ধর্ম্ম-সাধনের জন্য নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু দেখিতেছি আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ কার্য্যসিদ্ধির পথে বিষম বিঘ্ন উপস্থিত। আপনার শিষ্যবর্গ কোনরূপে এ ব্যাপার জানিতে পারিলে আমার জীবন পর্য্যন্ত সঙ্কট-সঙ্কুল হইয়া উঠিবে। তাই ভাবিতেছি—এ অবস্থায় উপায় কি ?"

আচার্য্যদেব কহিলেন—'আমি তোমাকে যে কথা দিয়াছি, তাহা সাধন পক্ষে প্রাণপণে যত্ন করিব। এক্ষণে সাবধানে গোপনে কার্য্য-সাধনের উদ্যোগ আয়োজন কর। গোপনে নির্জ্জনে ভিন্ন তুমি কখনই অভীষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। কারণ শিষ্যগণ কোনরূপে এ ব্যাপারের বিন্দুমাত্রও জানিতে পারিলে, তোমার কার্য্য কখনই সিদ্ধ হইবে না; বরং তাহাতে তোমার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে। একথা বার বার বলিয়া আমি তোমাকে সাবধান করিতেছি।'

কাপালিক চিন্তিত হইয়া উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—'আচার্য্য, আপনি বিশেষ বিজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তি। অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা নিরূপণ করিতে আপনার ন্যায় সমর্থ কে ? অতএব আপনি বলুন এ অবস্থায় আমার কর্ত্তব্যই বা কি এবং সে কর্ত্তব্য সাধনের উপায়ই বা কি হইতে পারে ?'

আচার্য্যদেব কৃপা পরবশ হইয়া কহিলেন,—'তুমি যদি তোমার অভীষ্ট দেবতার প্রীতির জন্য আমাকে বলিরূপে উৎসর্গ

করিতে ইচ্ছা কর, তবে আমার নির্দ্ধারিত বিধান অনুসারে কার্য্য করিতে যত্নবান হও।'

কাপালিক বিনীত ভাবে কহিল,—"আজ্ঞা করুন, কি ভাবে কার্য্য সাধন করিব?"

আচার্য্য কহিলেন,—"আমি অতঃপর কিছুদূরে নির্জ্জনে নিভৃত স্থলে ধ্যান সাধনায় প্রবৃত্ত রহিব। ধ্যানের পরিপক্ক অবস্থায় তৎকালে যখন আমি সমাধিস্থ হইব, তখন আমার মস্তক লইয়া তুমি দেবীর নিকট উৎসর্গ করিও। সেস্থানে আমার শিষ্যগণ উপস্থিত থাকিবে না। সুতরাং সে সময়ে সে অবস্থায় তোমার ইষ্ট সাধন ও সুচারুরূপে কার্য্য সফল হইবে।'

আচার্য্য দেবের কথা শুনিয়া,—কাপালিক মহোৎসাহে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল। সে আচার্য্যকে অভিবাদন করিয়া দ্রুত পদে স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিল। তদবধি সে ছায়ার ন্যায় আচার্য্যের অনুসরণ করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার এইরূপ আচার্য্যের নিকট গতিবিধি ও তাঁহার প্রতি অনুসরণ করিতে দেখিয়া, শিষ্যগণ বিশেষ চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। তাঁহাদের মনে যুগপৎ শঙ্কা ও সন্দেহের আবির্ভাব হইল। বিশেষতঃ পরম গুরুভক্ত সনন্দন, কাপালিক দ্বারা গুরুদেবের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা অনুমান করিয়া বিশেষ সতর্ক হইলেন। তিনি অলক্ষিত ভাবে কাপালিকের কার্য্য কলাপ ও গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কাপালিকের সহিত কথা অনুসারে আচার্য্য নিভৃত নির্জ্জন স্থানে স্বীয় যোগাসন সংস্থাপন করিয়া ধ্যান সমাধি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। দুরাচার কাপালিক একদা স্বীয় অভীষ্ট সাধনের সুযোগ বুঝিয়া তীক্ষ্নধার খড়্গ হস্তে আচার্য্য দেবের পশ্চাত ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইল। আচার্য্য তখন অতি ধীর স্থির ভাবে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহ স্থির, মন প্রাণ অতি প্রশান্ত। নির্ব্বাত প্রদেশে দীপশিখার ন্যায় তিনি নিশ্চল অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছেন। আচার্য্য সর্ব্বজ্ঞ অন্তর্য্যামী। দুষ্ট ঘাতক কাপালিকের দুষ্ট অভিপ্রায় সাধনের জন্য নিকটে আগমনের কথা তিনি অন্তরে অবশ্যই বুঝিলেন। তখন তিনি স্বীয় আত্মাকে পরমাত্মায় লীন করিয়া, দেহ ইন্দ্রিয়-মন প্রাণাদিরও অতীত তুরীয় অবস্থায় অবস্থিত হইলেন। তখন বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সকলই এক ব্রহ্মময়। ঘাতক—ঘাতকের খড়্গ পর্য্যন্ত তখন তাঁহার নিকট ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। তখন কে কাহাকে হত্যা করে? কেহই তাঁহাকে হনন করিতে পারে না। তিনি কাহারও হননের পাত্র হইতে পারেন না। উগ্র ভৈরব নীরবে ধীরে ধীরে আচার্য্য দেবের পশ্চাৎ প্রদেশ হইতে তাঁহার প্রতি খড়্গাঘাত করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। আচার্য্য দেবের সেই অপূর্ব্ব অমানুষিক ভাব দেখিয়া দুর্ভাগ্য কাপালিক বিমুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইল। তাহার দেহ মন প্রাণ থর থর কম্পিত হইল। বিশাল বিশ্ব যেন তাহার

সম্মুখে বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। সে ইতিকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া অচেতন ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণেই দুষ্ট আত্মসম্বরণ করিয়া ভাবিল—এই তো উপযুক্ত অবসর। এমন সুযোগ পরিত্যাগ করিলে আর কার্য্য সিদ্ধির সময় কখন পাওয়া যাইবে? অতএব এই শুভ মুহূর্ত্তেই মহাবলির ব্যাপার সমাধা করি। বহুকাল ধরিয়া যে সাধনা করিয়াছি, সেই সাধনার মহাফল স্বরূপ মহাসিদ্ধি এই মুহূর্ত্তে হাতে হাতে লাভ করিব। আহা দেবীর কি কৃপা! তিনি এতদিনে আমার মহাসাধনায় মহান ব্রতাদি অনুষ্ঠানে পরম পরিতুষ্টা হইয়াছেন। তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। তিনিই কৃপা করিয়া এমন স্থলে এমন সুযোগ ঘটাইয়াছেন। নতুবা এমন মহাবলি প্রদানের ভাগ্য কোন সাধকের আপন সামর্থ্যে সংঘটিত হইতে পারে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে প্রাণের আবেগে অধীর হইয়া উঠিল। অভীষ্ট-দেবতাকে মনে মনে স্মরণ করিয়া, আচার্য্য দেবের মস্তক বলিদানের জন্য খড়্গ উত্তোলন করিল। একি! নিমিষে একি বিষম বিপর্য্যয় ঘটিল! কে বিদ্যুৎ-বেগে আসিয়া দুষ্ট কাপালিকের হস্ত হইতে সজোরে খড়্গ কাড়িয়া লইল! কে নিমিষে সেই খড়্গ দ্বারা দুষ্ট কাপালিকের মুণ্ড ছেদন করিয়া ধরাতলে নিপাতিত করিল? কে এ মহাপুরুষ? কোন দৈববলে বলীয়ান হইয়া এই মহাপুরুষ এমন মহৎ দৈব কার্য্য সাধন করিল? খড়্গের প্রচণ্ড আঘাতে ও ভীষণ নিনাদে আচার্য্য দেবের সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি নেত্র উন্মীলন করিয়া চাহিয়া

দেখিলেন সম্মুখে ভীষণ দৃশ্য। অজস্র শোণিত পাতে ধরাতল অভিষিক্ত! কাপালিকের ছিন্ন মুণ্ড মৃত্তিকায় বিলুণ্ঠিত! আচার্য্য দেব বিস্মিত-নেত্রে দেখিলেন তাঁহারই প্রিয় শিষ্য রক্ত-রঞ্জিত খড়্গ করে ধারণ করিয়া ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবরে দণ্ডায়মান! তিনি তখনই ঘটনার মূল রহস্য বুঝিয়া লইলেন। অহো! যিনি জগতের উদ্ধারের জন্য, সংসারের পাপ তাপ দূরীকরণ করিয়া জ্ঞানালোক প্রকাশের জন্য, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার বিনাশের উদ্দেশে হতভাগ্য দুষ্ট কাপালিকের অভিসন্ধি বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানে কি সূক্ষ্ম সূত্রে নিষ্ফল হইল; কাপালিক স্বয়ং সেই বিধান-বশে নিজেই নিহত হইল।

আচার্য্য দেব দেখিলেন তাঁহারই প্রিয় শিষ্য সনন্দন কর্ত্তৃক দুষ্ট কাপালিকের ছিন্ন মুণ্ড ধরাতলে বিলুণ্ঠিত। আচার্য্য শান্ত বাক্যে, সনন্দকে বুঝাইতে লাগিলেন। সনন্দন নিজ কার্য্য বশতঃ ক্রোধ লজ্জা ও উত্তেজনায় কখন চঞ্চল কখন বা অস্থির ভাব ধারণ করিতেছিলেন। আচার্য্য দেবের দর্শনে ও তাঁহার সুধাবর্ষী বাক্যে সনন্দনের দেহ মন প্রশান্ত হইল। তখন আচার্য্যদেব তাঁহাকে নানা কথায় উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। আচার্য্যদেব কহিলেন—'সনন্দ, তুমি কেন অদ্য এমন জ্ঞানহীন আত্মহারা হইলে? কেন এরূপ নিষ্ঠুর নরহত্যা রূপ ঘোর পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে।'

সনন্দন লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়াছিলেন। পরে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন—'দেব, হতভাগ্য কাপালিক আমাদের এবং

সঙ্গে সঙ্গে সংসারের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে সমুদ্যত হইয়াছিল; হায়! আজি জগতের জ্ঞান-সূর্য্য চিরতরে অস্তমিত হইত। আপনাকে খড়্গাঘাতে হত্যা করিবার জন্য সে সমুদ্যত হইয়াছিল। আমি কয়দিন হইতে তাহার গতিবিধি কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম। আমি তাহাতে বুঝিয়াছিলাম যে নিশ্চয়ই কোন দুষ্ট অভিসন্ধি সাধনের জন্য সে আপনার নিকট যাতায়াত করিতেছে। কিন্তু সে যে এমন গর্হিত নৃশংস কাণ্ড ঘটাইবে তাহা আমি কল্পনায়ও অনুমান করিতে পারি নাই। যখন দেখিলাম যে আপনাকে হত্যা করিবার জন্য খড়্গ উত্তোলন করিল, তখন আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। দেব, কে আপনার ন্যায় মহাগুরুর হত্যা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া স্থির থাকিতে পারে? আমি তাহার হস্তস্থিত খড়্গ সবলে কাড়িয়া লইলাম এবং ক্রোধের বশে হতভাগ্যের শিরচ্ছেদন করিলাম। আমি জানি আপনি স্বয়ং আশুতোষ; যে যে বর প্রার্থনা করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হয়, আপনি তাহারই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না; সেই জন্য আমি এবং অপর সতীর্থগণ সকলেই কাপালিক দ্বারা আপনার প্রাণনাশ বা অপর অনিষ্টের আশঙ্কায় বড়ই চিন্তান্বিত হইয়াছিলাম। তাই আমি সর্ব্বদা আপনার অজ্ঞাতসারে আপনার দেহ জীবন রক্ষার জন্য সতর্ক ছিলাম। আমার সতর্কতা ও সৌভাগ্য বলে অদ্য পিশাচের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি।' এই বলিয়া সনন্দন সাশ্রুনয়নে গুরুদেবের চরণতলে

নিপতিত হইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে কাতর কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন— 'দেব, আমি জানি জীবহত্যা নরহত্যায় মহাপাপে পরিলিপ্ত হইতে হয়। কিন্তু গুরুদেবের জন্য সকল পাপ সকল কার্য্যই অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় বলিয়া আমার বিশ্বাস। আপনার ন্যায় মহাগুরুর কৃপায় আমার সকল পাপ নিশ্চয়ই বিদূরিত হইবে।"

আচার্য্য কহিলেন—'সনন্দন, নরহত্যা মহাপাপ। তুমি অদ্য সেই মহাপাপে পতিত হইলে। ভাবিয়া দেখ জীবের জীবন সংসারে দুর্লভ ও মহামূল্য সামগ্রী। সে সামগ্রীকে যে ধ্বংস করে সে নিশ্চয়ই পতিত পাপলিপ্ত। তুমি সৌভাগ্য-বলে পরম জ্ঞান-ধন অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছ। যে জ্ঞানধনে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছে—আত্মার যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে, সে সহজেই পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করিতে পারে। তুমি পরমাত্মার শরণাপন্ন হইয়া আত্মোদ্ধারের পথ পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত করিবার জন্য সচেষ্ট হও।' এইরূপ আত্মতত্ত্ব আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে গুরুদেব শিষ্যকে বহু সৎউপদেশ প্রদান করিলেন। সনন্দন গুরুদেব দত্ত জ্ঞান উপদেশ লাভ করিয়া প্রবুদ্ধ ও প্রশান্ত হইলেন। তিনি আত্মায় স্থিতি লাভ করিয়া নরহত্যা-জনিত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলেন। সনন্দন প্রবুদ্ধ হইয়া শিষ্যগণসহ আত্মবিচার, আত্ম-উপলব্ধি সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে নানারূপ কথোপকথন ও বাকবিতণ্ডা হইতে লাগিল। কেহ কোন জিজ্ঞাসা ও তাহার প্রত্যুত্তর সম্বন্ধে বিতর্ক করিতে লাগিলেন, কেহ বা তাহার প্রতিপোষণ করিতে

লাগিলেন। তখন আচার্য্যদেব তথায় উপস্থিত হইয়া বিশদ মীমাংসায় সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন।

আচার্য্যদেবের স্মৃতিশক্তি অতি অমানুষিক ছিল। যাহা একবার তিনি দর্শন বা শ্রবণ করিতেন, তাহা আর বিস্মৃত হইতেন না। সাধারণ মানবে কখন তেমন স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতি দেখিয়া আচার্য্য গোবিন্দ পাদ সতীর্থগণ এবং সকলেই বিমুগ্ধ হইতেন। অতি গভীর দার্শনিক শাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ তিনি একবার শুনিয়া, বহুকাল পরেও অনায়াসে মুখে মুখে বলিতে পারিতেন। তাঁহার অলৌলিক স্মৃতি-শক্তি সম্বন্ধে বহু অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে দুইটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আচার্য্যদেব বেদান্তের ভাষ্য লিখিয়া শিষ্যগণকে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। প্রিয় শিষ্য পদ্মপাদ সে ভাষ্য অধ্যয়ন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। পদ্মপাদ স্বয়ং আবার সে ভাষ্যের এক সূক্ষ্ম টীকা লিখিয়াছিলেন। টীকা লিখিয়া তিনি গুরুদেবকে তাহা শুনাইয়াছিলেন। আচার্য্য শিষ্যের বার্ত্তিক পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইলেন ও তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। অতঃপর কিছুকাল পরে শিষ্য সনন্দন তীর্থ ভ্রমণের ইচ্ছা করিলেন। গুরুদেবের পদে প্রণত হইয়া তিনি আপন ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। কহিলেন—'দেব, আপনার পদতলে আশ্রয় লাভ করিয়া সংসারে আর কোন তীর্থে গমনের ইচ্ছা হয় না। কিন্তু শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে তীর্থ-ভ্রমণ আত্মোদ্ধারের এক প্রসিদ্ধ সেতু।' আচার্য্য কহিলেন—'তীর্থ

ভ্রমণ হিন্দুর এক পরম ও প্রধান ধর্ম্ম। চিত্ত-শুদ্ধির জন্য তীর্থ দর্শন প্রধান প্রয়োজন। কারণ শ্রেষ্ঠ তীর্থ স্থলই মর্ত্তে দেবগণের ও সাধু সিদ্ধগণের ভ্রমণ-স্থল। তাঁহারা এই পৃথিবীতে যে যে স্থানে পদার্পণ করেন, সেই সেই স্থানই পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র রূপে ধরায় সংপূজিত হইয়া থাকে। সে সকল পবিত্র ক্ষেত্র পরিদর্শন করিলে দৈহিক ও মানসিক কলুষ রাশি ভস্মীভূত হইয়া থাকে। তদ্বারা দেহ মন পরম পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে। তোমরা অবশ্য আমার সহিত বহু পবিত্র স্থান এ পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিয়াছ। তাহাতে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছ যে তীর্থ স্থানে গমন মাত্রেই দেহ মনের এমন এক অপার্থিব ভাবের উদয় হয়, যাহা অনুভব করিয়া তীর্থগামী ব্যক্তি আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করে। যদি কোন ভাগ্যবান কঠোর তপস্যায় আপনাকে পবিত্র করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, তবে তাহার ভাগ্যে তীর্থস্থানে দেব বা সিদ্ধ মহাজনের দর্শন লাভ ঘটিতে পারে। যদি সে ভাগ্যবান সিদ্ধ মহাপুরুষের বিশেষ কৃপা লাভ করিতে পারে, তবে আত্মোদ্ধার তাহার পক্ষে অতি সহজ হইয়া উঠে। তীর্থস্থান সকল মৃত্তিকাময়ী পৃথিবীতে ভূস্বর্গ। তীর্থস্থানকে যে অবহেলা করে তাহার ভাগ্যে ধর্ম্মফল লাভের আশা নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠে। মানব মাত্রেরই তীর্থ সেবা দ্বারা আত্মোৎকর্ষ সাধন করা একান্ত কর্ত্তব্য। তোমাদের মধ্যে যে যে ব্যক্তির তীর্থ-ভ্রমণে আন্তরিক অনুরাগের উদয় হইয়াছে, তাহার অনতি-বিলম্বে গৃহ হইতে বহির্গমন একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা অতীব উত্তম

সাধু সম্মত প্রস্তাব।' গুরুদেবের অনুমতি লাভ করিয়া সনন্দন উৎসাহে উৎফুল্ল হইলেন। তিনি প্রথমেই দক্ষিণ দিকস্থ তীর্থ দর্শনে ইচ্ছুক হইলেন ও তদুদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পথে গমন করিতে করিতে, মাতুলালয়ে যাইবার জন্য তাঁহার প্রাণে প্রবল বাসনার উদ্রেক হইল। তজ্জন্য তিনি সর্ব্ব প্রথমে পথিমধ্যস্থ মাতুল-গৃহে গমন করিলেন। তাঁহার মাতুল সুপণ্ডিত ছিলেন। সনন্দন তাঁহাকে নিজকৃত ভাষ্যের বার্ত্তিক পাঠের জন্য প্রদান করিলেন। কয়খানি প্রিয় গ্রন্থ সনন্দন স্বীয় সঙ্গে লইয়া গমন করিতেছিলেন। সনন্দন কিছুদিন মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিয়া তীর্থ উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যে গমন করিলেন। মাতুল, ভাগিনেয় কৃত শারিরক ভাষ্যের টীকা পাঠ করিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইলেন। তিনি ভক্ত দ্বৈতবাদী ছিলেন ভাগিনেয় কৃত টীকায় দ্বৈতবাদ বিশেষরূপে নিরাকৃত হইয়াছিল। তাহাতে বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদই বিশদভাবে কঠোর যুক্তির সহিত সমর্থিত হইয়াছিল। মাতুল তদ্দর্শনে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইলেন। তিনি দেখিলেন ভাগিনেয় তাঁহার মতের ও আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের বিপরীত পন্থায় পদার্পণ করিয়াছেন ও সেই মতে সেই বিকট পথে পরিচালিত হইতেছেন। তিনি আরও ভাবিতে লাগিলেন যেরূপ কঠোর যুক্তির সহিত তন্ন তন্ন রূপে ভাগিনেয় কৃত টীকায় দ্বৈতবাদ বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহাতে ভক্তি-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা নিতান্তই কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। এইরূপ গ্রন্থ দেশ মধ্যে যতই প্রচারিত হইতে থাকিবে ততই দ্বৈতবাদ ও ভক্তি ধর্ম্ম বিলুপ্ত

হইতে আরম্ভ করিবে! এরূপ ধর্ম্মমতের প্রচারে বাধা প্রদান একান্তই প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য। দেখিতেছি ভাগিনেয়ের নিতান্ত দুর্ম্মতি ঘটিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি উৎকণ্ঠিত ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। হায়! কেন সনন্দনের এমন মতিভ্রম ঘটিল? যাহাহউক যাহাতে তাহার মনের ভ্রম নিরাকৃত হয় তৎপক্ষে প্রবলভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। সে যখন এই পথে প্রত্যাগমন করিবে, তখন বুঝাইয়া নানা উপদেশ প্রদান দ্বারা যাহাতে তাহার সুমতি ও সুগতি সাধিত হয় তৎপক্ষে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে।' সনন্দের মাতুল এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে দৈববিড়ম্বনায় তাহার গৃহদাহ সংঘটিত হইল। মাতুল মনে করিলেন এই অতি উত্তম সুযোগ। এই সুযোগ-সূত্র ধারণ করিয়া ভাগিনেয়ের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধীয় টীকাবার্ত্তিক বিধ্বংস করিতে হইবে। তিনি মনের কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিলেন। সনন্দনের কৃত অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। ভাগিনেয় কিছু দিন তীর্থভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মাতুল ছলনাপূর্ণ বিষাদ ও বাক্যজাল অবলম্বন করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। কহিলেন—'বৎস, কি বলিব? গৃহ দাহে আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি। সেই সঙ্গে তোমার অতি মূল্যবান গ্রন্থও বিনষ্ট হইয়াছে।' মাতুলের কথা শুনিয়া সনন্দন স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তাঁহার অনুতাপের পরিসীমা রহিল না। সনন্দন কিছুদিনে গুরুদেবের সমীপে আগমন করিয়া অতি বিষণ্ণ বদনে কহিলেন—'দেব, আমার

বহুদিনের শ্রম বিফল হইয়াছে। আমি বহু পরিশ্রম করিয়া আপনার মহাভাষ্যের যে টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলাম, মাতুলগৃহে তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। তাঁহার গৃহদাহে বহু দ্রব্যের সহিত মংপ্রণীত ভবদীয় ভাষ্যের টীকা খানিও দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।' এই বলিয়া সনন্দন অতি বিষণ্ণ প্রাণে অনুতাপ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য প্রফুল্ল বদনে সহাস্যে কহিলেন,—বৎস, তোমাকে আর অনুতাপ করিতে হইবে না। তোমার টীকা আমার মনে বিশদ ভাবেই জাগরূক রহিয়াছে। আমি তাহা বলিয়া যাইতেছি। তুমি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া লও।' এই বলিয়া গুরুদেব, শিষ্য লিখিত টীকা আপনি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শিষ্য সঙ্গে সঙ্গে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন।

আর একবার কেরল-রাজ কয় খানি নাটক ও গ্রন্থ লিখিয়া আচার্য্যদেবকে পরম প্রীতি পূর্ব্বক পাঠের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। কোনরূপ দৈব দুর্ঘটনায় কেরল রাজের গ্রন্থ গুলি বিনষ্ট হইয়াছিল। রাজা অনুতপ্ত হৃদয়ে আচার্য্যদেবের নিকট আগমন করিয়া তদীয় পুস্তক ধ্বংসের কথা কহিলেন। আচার্য্য দেব কহিলেন—'রাজন, আমি তোমার গ্রন্থ গুলি পাঠ করিয়াছি। তোমার গ্রন্থ উপাদেয় হইয়াছে। সেগুলি এখনও আমার স্মৃতি পথে জাগরূক রহিয়াছে। ইচ্ছা হইলে তুমি এখনই তাহা লিখিয়া লইতে পার।' এই বলিয়া আচার্য্যদেব রাজাকৃত গ্রন্থ গুলি পাঠের ন্যায় উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তৎসঙ্গেই

রাজা সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন।' এইরূপ বহু ঘটনায় আচার্য্যদেবের অদ্ভুত অমানুষিক স্মৃতিশক্তির বহু কথা প্রচারিত হইয়া রহিয়াছে। কেবল সামান্য দুই চারিটা কথা বা বাক্য মাত্র অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা মাত্র যে তাঁহার স্মৃতিপটে চিত্রিত ছিল এমন নহে, বড় বড় গ্রন্থের সমুদয় শ্লোক আমুল হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া রাখিতেন। তাহা যে কতদূর কঠিন ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। সংসারে সমাজে বহু ব্যক্তি শ্রুতিধর রূপে বিখ্যাত হইয়াছে। তাহারা অনেকে অনেক কথা শুনিবামাত্র কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারে এবং প্রয়োজন মত সে সকল কথা উচ্চারণও করিতে পারে। কিন্তু বৃহৎ বা কঠিন গ্রন্থ মূল হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে কে সমর্থ? কেবল আচার্য্য দেবের অমানুষিক শক্তিতেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার এই অদ্ভুত অলৌকিক স্মৃতি-শক্তির পরিচয় যে যখন পাইয়াছে সেই বিমুগ্ধ বিস্মিত হইয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার স্মৃতি-শক্তির বহু কথা কিম্বদন্তী রূপে বহু স্থানে প্রচারিত রহিয়াছে।

আচার্য্যদেব শিষ্যগণসহ একদা প্রয়াগে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি নদী তীরে উপবিষ্ট হইয়া শিষ্যগণকে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। শিষ্যগণ তন্ময় হইয়া গুরু-উপদেশ শ্রবণে নিবিষ্ট হইয়াছিলেন। এমন সময় কিছু দূরে হঠাৎ গোলযোগ উপস্থিত হইল। সকলের শ্রবণ সেই দিকে প্রধাবিত হইল। অনেকে দৌড়াইয়া যেস্থানে

গোলযোগের পরিমাণ সমধিক সেই দিকে যাইতে লাগিল। সকলেই পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—গোলযোগের কারণ কি? কোথায় কি জন্য হঠাৎ গোলমাল উপস্থিত হইল? ক্রমে শুনা গেল ভট্টকুমারীল মহাপ্রায়শ্চিত্ত সাধন করিতেছেন। তিনি তুষানলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছেন। এই কথা শ্রবণ মাত্র আচার্য্যদেব শিষ্যগণ সহ ভট্টের সন্নিধানে গমন করিলেন। তাঁহারা কুমারীল ভট্টের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া যাহা দর্শন করিলেন, তাহাতে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তাহারা দেখিলেন ভট্টের দেহ তুষাগ্নিতে বিদগ্ধ হইতেছে। আচার্য্য দেব ভট্টের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভট্ট এ কি কর্ম্ম? কেন এমন ভাবে আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছেন? কি পাপের জন্য এই ভীষণ তুষানলে আপনার পূণ্যময় পবিত্র দেহ দহন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? ভট্ট কুমারীদের অবস্থা দেখিয়া দয়াপূর্ণ আচার্য্য দেবের হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি ভট্টকে জিজ্ঞাসা করিয়া তুষানল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য বারম্বার তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কহিতে লাগিলেন—'ভট্ট, আপনি পরম জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও ধারণা আপনার মত সহৃদয় সমদর্শী ব্যক্তির দেহে মনে বা প্রাণে কোনরূপ পাপ-কালিমা স্পর্শ করিতে পারে না। উৎকট পাপের জন্যই অবশ্য তুষানলের প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রের বিধান বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু এমন কঠোর উৎকট প্রায়শ্চিত্ত কি আপনার ন্যায় মহোদয়ের

জন্য বিহিত হইতে পারে? না—তাহা কখনই হইতে পারে না। কোন অনুতাপের উত্তেজনায় আপনি এই কঠোর তুষানলের প্রায়শ্চিত্ত নিজের বিহিত বলিয়া বিধান করিলেন? ভট্ট আচার্য্যদেবকে সন্দর্শন করিয়া যেন মৃতদেহে জীবনলাভ করিলেন। এতক্ষণে যেন তাঁহার বিদগ্ধ দেহে স্বর্গের অমৃতধারা পরিসিঞ্চিত হইল। সে স্থলে যত দর্শক বৃন্দ উপস্থিতছিল তাহারা সকলেই ভট্টের প্রশান্ত ও প্রফুল্ল ভাব দেখিয়া অতীব স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইল। তাহারা পরস্পর কহিতে লাগিল—নিশ্চয়ই এ কোন অলৌকিককাণ্ড! ইহা যে কোন অতিপ্রাকৃতিক দৈব-শক্তির প্রভাবে সংঘটিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? নতুবা এমন অবস্থায়—তুষানলের দহন দশায় ভট্টের এ অনির্ব্বচনীয় শান্তি অপূর্ব্ব প্রফুল্লতা কেন—কোথা হইতে আসিল? কি আশ্চর্য্য! তুষানলে দেহ বিদগ্ধ হইতেছে, তাহার যন্ত্রণায় কিছু পূর্ব্বে ভট্ট অতি অস্থির হইয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ আচার্য্য দেবের আগমনে তাঁহার সকল দৈহিক জ্বালা যেন জুড়াইয়া গেল। ভট্টের এই মূহুর্ত্তের ভাব, তাঁহার বদনের প্রফুল্লতা দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন তিনি এক্ষণে সর্ব্ববিধ পার্থিব ক্লেশের অতীত হইয়াছেন। এ সকল নিশ্চয়ই আচার্য্য দেবের অলৌকিক প্রভাবের ফল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আচার্য্যদেব নিশ্চয়ই সাধারণ সামান্য মনুষ্য নহেন। তিনি সত্যই দৈবশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ।

ভট্ট অতি ভক্তিভরে বিনীত কণ্ঠে কহিলেন—'আচার্য্য,

আপনি আমার সম্মুখে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করুন, আপনাকে দর্শন করিয়া আমার সমুদয় দৈহিক বা মানসিক দুঃখ যন্ত্রণা নিমিষে তিরোহিত হইল। আপনাকে যে ভাগ্যবান সৌভাগ্য বলে, বহু জন্মের পূণ্য ফলে, জানিতে ও চিনিতে পারে তাহার সামান্য সংসার-যন্ত্রণা দূরে থাকুক, সকল পাপ তাপ সর্ব্ববিধ ভববন্ধন চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। আপনি সাক্ষাৎ শঙ্কর। মহৎকার্য্য সাধনের জন্য—সংসার হইতে মোহ অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত করিয়া—পরম তত্ত্বজ্ঞানে আলোকিত করিতে আপনি নরদেহে এই উৎকট কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনি দয়া করিয়া আমার উদ্ধারের জন্য এই ক্ষণে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ইহা আমার পক্ষে নিশ্চয়ই মহাসৌভাগ্যের ফল। যখন কৃপা করিয়া আমার অন্তিম সময়ে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন আরও কিছুক্ষণ—যতক্ষণ না আমার প্রাণবায়ু দেহ ছাড়িয়া মহাকাশে বিলীন হয়—ততক্ষণ অধীনের সম্মুখে উপস্থিত থাকুন। আপনাকে দেখিতে দেখিতে যদি আমার মৃত্যু ঘটে, তবে আমার আর পুনরাবর্ত্তন ঘটিবে না।'

এইরূপে কাতর কণ্ঠে বারবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলে আচার্য্যদেব বিগলিত হৃদয়ে করুণ স্বরে কহিলেন—'ভট্ট, কি নিমিত্ত আপনার এমন অনুশোচনা উপস্থিত হইল? কিজন্য আপনি এই কঠোর প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিয়া আপনার পরম পবিত্র পুণ্যময় দেহকে তুষানলে ভস্মীভূত করিতেছেন। যদি কিছু রহস্য না থাকে, তবে অকপটে আমার নিকট সকল কথা

পরিব্যক্ত করুন। শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে যে গোপন না করিয়া সরলভাবে নিজকৃত পাপ লোকসমাজে প্রকাশ করিলে, পাপের গুরুত্ব বিশেষ রূপে লঘু হইয়া থাকে। আপনি পরম জ্ঞানী মহা পণ্ডিত ব্যক্তি। শাস্ত্রের বিধান আপনাকে অধিক করিয়া বুঝাইবার কোনই প্রয়োজন দেখি না। অতএব যদি কোনরূপ আপত্তি না থাকে, তবে সকল রহস্য এ সময়ে এখানে প্রকাশ করিলে আপনার মঙ্গল ভিন্ন কখনই অমঙ্গল সংঘটিত হইবে না।'

ভট্ট প্রশান্ত ভাবে প্রফুল্ল বদনে কহিলেন,—'আচার্য্য, যে ভাগ্যবান সৌভাগ্য-ফলে মৃত্যু সময়ে আপনার দর্শন লাভ করিতে পারে, তাহার আর অমঙ্গলের আশঙ্কা কোথা? আপনি প্রত্যক্ষ মঙ্গল স্বরূপ। কল্যাণ আপনার অপর এক মূর্ত্তি বিশেষ। আমার বহু জন্মের বহু ভাগ্য ফলে এই মৃত্যু মুহূর্ত্তে আপনার দর্শন লাভ করিতে পারিলাম। বড়ই ইচ্ছা ছিল, আপনার নিকট তত্ত্বজ্ঞানের গূঢ় উপদেশ শ্রবণ করিয়া আত্ম-জ্ঞানলাভ করি। জ্ঞানের মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। আত্মজ্ঞানই ব্রহ্ম জ্ঞান। যাহাতে আত্মদর্শন ও আত্ম-উপলব্ধি ঘটে, তাহাতেই মহামুক্তি মহানির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে। আপনি সেই মহাজ্ঞান —পরম তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করিবার জন্য ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমার দুর্ভাগ্য যে আমি আপনার নিজ মুখে সে তত্ত্ব জ্ঞানের উপদেশ শ্রবণ করিয়া মানব-জন্ম সফল সার্থক করিতে পারিলাম না। ইহা কি সামান্য পরিতাপের কথা যে এমন সময় আপনার

সহিত দেখা হইল যে আপনার মুখের জ্ঞান-উপদেশ শুনিতে পাইলাম না। যাহা হউক আপনার শুভদর্শনে আমার সংসার বন্ধন মুক্ত হইল। আপনাকে দেখিয়া আমার আর তুষানল দহনের যন্ত্রণা অনুভব হইতেছে না।'

আচার্য্যদেব, ভট্টের তুষানল দহন দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—'আপনি কি জন্য এরূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিলেন? আপনি আরও কিছুকাল সংসারে বিদ্যমান থাকিলে, সনাতন ধর্ম্মের বহু উপকার ও উন্নতি সংসাধিত হইত। নাস্তিক শূন্যবাদী বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাবে সনাতন ধর্ম্মের বিশেষ অনিষ্ট অধোগতি ঘটিতেছে। আপনি সেই প্রবল অশুভ স্রোতের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া বৈদিক ধর্ম্মের শুভদিন আবার আনয়ন করিতে পারিতেন।'

ভট্ট কহিলেন—"আচার্য্যদেব, দুঃখের কথা আর কি বলিব! সেই জন্যই আমার এই কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বিধান। আমি বৌদ্ধ ধর্ম্মের ও দুষ্ট বৌদ্ধগণের দমন কল্পে ও সনাতন ধর্ম্মের সংরক্ষণ হেতু জীবন উৎসর্গ করিতে সংকল্প করিয়াছিলাম। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি গুপ্তভাবে তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলাম। তাহাদের দুষ্ট অভিসন্ধি ও গুপ্ত গতিবিধি জানিবার জন্য মিথ্যা ছলনায় শিষ্যরূপে বৌদ্ধ আচার্য্য গণের সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলাম। আমি নাস্তিক গণের গুপ্ত অভিসন্ধি সকলই জানিতে পারিয়াছিলাম। এক্ষণে

বুঝিতেছি যে সে কার্য্য কখনই সৎ বা কল্যাণকর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। যাহার মূলে মিথ্যা বা প্রবঞ্চনা চাতুরী বিদ্যমান তাহার চরম ফল বা পরিণতি কখনই সফলতা লাভ করিতে পারে না। সেই জন্যই আমি নিতান্ত অনুতপ্ত হইয়াছি—সেই অনুতাপের ফলে আমার এই কঠোর তুষানলের ব্যবস্থা বিধান। যাহা হউক আপনার ন্যায় জ্ঞান-সূর্য্য যখন সমুদিত হইয়াছেন, তখন নাস্তিক ধর্ম্মের অজ্ঞান-অন্ধকার সত্বরই এই ধর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদূরিত হইবে। এই বলিয়া ভট্ট প্রশান্ত ভাবে তুষানলে বিদগ্ধ হইলেন।

শঙ্করাচার্য্যের ধর্ম্মমত।

শারীরক ভাষ্যের বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদে, শঙ্কর যে কোন একটা অভিনব মত প্রচার করিয়াছিলেন তাহা নহে। কারণ অদ্বৈত বাদের অতীব বিশুদ্ধ ভাব বহু পূর্ব্ব হইতে বহু উপনিষদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 'একোমেবাদ্বিতীয়ং' এই মহৎ বাণী হিন্দু ধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ। এক পরমাত্মা সর্ব্বভূতে সর্ব্বজীবে বিভিন্ন নাম রূপে বিরাজমান, এই গূঢ় তত্ত্ব যেমন বৈদান্তিক ধর্ম্মে ঔপনিষদিক ধর্ম্মে প্রকটিত, তেমনি এদেশে সর্ব্বসাধারণের মধ্যেও সাধারণ ধর্ম্ম রূপে সমাদৃত ও পরিগৃহীত হইয়াছে। 'তিনি চোর হয়ে চুরি করেন, সাধু ভাবে রক্ষা করেন' 'তিনি

সাপ হয়ে কামড়ান, ওঝা হ'য়ে ঝাড়ান' এমন ভাবের কথা এদেশে অতি নিম্ন শ্রেণীর লোকের মুখেও সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। এ সকল কথা অদ্বৈত বাদেরই প্রতিধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই নহে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে আত্ম-ধ্যান, আত্ম-পূজার মন্ত্র সমূহ অদ্বৈতবাদেরই প্রখর প্রভাব উদ্ঘোষণ করিয়া থাকে। এই প্রভাবের এক প্রধান কারণ আচার্য্য শঙ্কর। প্রকৃত পক্ষে শঙ্করাচার্য্যের সময়ে এদেশে অদ্বৈত-বাদের স্রোত যেরূপ প্রবল ভাবে বহিয়াছিল, এমন আর কখনই নহে। গীতা-যুগেও অবশ্য অদ্বৈত বাদের প্রাধান্য ঘটিয়াছিল, কিন্তু সে প্রাধান্য কেবল সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তরেই সন্নিবদ্ধ ছিল, শঙ্কর-যুগের ন্যায় এতটা সম্প্রসারণ লাভ করিতে পারে নাই।

গীতা-ধর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে—অদ্বৈত-তত্ত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন কোন সামান্য বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও, গীতা-তত্ত্ব অদ্বৈত তত্ত্ব হইতে বড় অধিক দূরে অবস্থিত নহে। শঙ্করের বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ গীতারই অনুবর্ত্তী। অনেকে একথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। গীতার ধর্ম্ম, আধুনিক শিক্ষিত গণের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শঙ্করের গীতা-ভাষ্য তাহার এক প্রধান কারণ এবং তাঁহার গীতা-ভাষ্য শারীরক ভাষ্যের ন্যায়, তাঁহার ধর্ম্ম-মতের তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদের—প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাই আচার্য্যের বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদের আলোচনার পূর্ব্বে, গীতা-ধর্ম্মের আলোচনা

নিতান্ত অনুপাদেয় হইবে বলিয়া মনে হয় না, বরং তাহা আবশ্যক বলিয়াই মনে হয়।

যিনি যাহাই বলুন, বহু জ্ঞানী দ্রষ্টার স্থির সিদ্ধান্ত অনুসারে যোগই গীতার চরম সাধ্য উপেয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এ নির্দ্ধারণ অসার বা অসত্য বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে।

গীতায় সুস্পষ্ট ভাবে উক্ত হইয়াছে—"জিজ্ঞাসারপি যোগস্য শব্দ ব্রহ্মাদতিরিচ্যতে" অর্থাৎ যোগ-তত্ত্ব, জিজ্ঞাসুজন শব্দ-ব্রহ্মকে (বেদ) অতিক্রম করিয়া থাকেন। গীতায় কথিত যোগ তত্ত্ব, অদ্বৈত বাদের ন্যায় কেবল তত্ত্ব-জ্ঞানে পর্য্যবসিত নহে। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ প্রধানতঃ অধ্যাত্ম-তত্ত্ব সহ বিজড়িত। গীতার যোগ-ধর্ম্ম অধ্যাত্ম-তত্ত্বের উপর দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়া মনুষ্যত্বের অপর অঙ্গ-ভাগের অনুশীলন ও পরিস্ফুরণেরও প্রকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শন করিয়াছে।

পূর্ণভাবে মনুষ্যত্ব বিকাশের তিন প্রধান পন্থা—কর্ম্ম-পন্থা, জ্ঞান-পন্থা ও ভক্তিপন্থা। এই তিনের সমঞ্জস ভাবে অনুশীলন ও পরিস্ফুরণ দ্বারা মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইয়া থাকে। আবার এ সকলের বিকাশ অনুশীলনের জন্য দেহ ইন্দ্রিয়াদির একদিকে পরিস্ফুরণ, অন্য দিকে সংযম প্রয়োজন। গীতায় এই সকল তত্ত্বই সূক্ষ্মভাবে আলোচিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে।

মনুষ্যত্ব বিকাশের পূর্ণ ও চরম অবস্থাকে গীতীয় যোগ-সিদ্ধির অবস্থা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। গীতায় তাই আরও স্থানান্তরে বিঘোষিত হইয়াছে ;—

"তপস্বিভ্যোধিকো যোগী জ্ঞানীভ্যোপি মতোধিকো
কর্ম্মিভ্যোশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ যোগীভবার্জ্জুন॥

যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জ্জুন তুমি যোগী হও।

যোগ কি? যোগের অর্থ কি? যোগ সম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন;—

সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মানি।
ঈক্ষতে যোগ-যুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শন॥

যোগী সর্ব্বভূতে আত্মাকে দর্শন ও আত্মায় সর্ব্বভূত দর্শন করেন। তিনি সর্ব্বত্রই সমদর্শী হইয়া থাকেন।

অদ্বৈতবাদ এই সমদর্শনের নামান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বেদান্তের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদই শঙ্করের ধর্ম্ম-মত। জীব, ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে। জীবাত্মা পরমাত্মা একই। মায়ার ভ্রমে পতিত হইয়া, জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক বলিয়া ভাবে ও মিথ্যা সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। যেমন সাগর ও সাগরের ঊর্ম্মি একই পদার্থের দুইটা ভাব মাত্র, তেমনি ব্রহ্ম ও জীব বা জগৎ একই পদার্থের বিভিন্ন রূপ মাত্র। তত্ত্ব জ্ঞানের উদয়ে এই মায়া ভ্রম ঘুচিলে বদ্ধজীব আত্মবোধে সমর্থ হয়। আত্মজ্ঞান আত্মবোধ জন্মিলে সে আপনার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করে। তখন সে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে

পারে। তাহাতেই সকল বন্ধন টুটিয়া যায়; বদ্ধ জীবাত্মা, মুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগের অধিকারী হয়।

যেমন মুক্তাতে রজতভ্রম ও রজ্জুতে সর্প-ভ্রম জন্মিলে, মুক্তাকে রূপা ও দড়ীকে সাপ বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে; পরে যখন মুক্তার ও রজ্জুর যথার্থ জ্ঞান জন্মিলে সে ভ্রম ধারণা দূরীভূত হয় সেইরূপ মায়াঘোরে জীব আপনাকে মিথ্যা বদ্ধ, কাল্পনিক জগৎকে সত্য ভাবিয়া আঁধারে ঘুরিয়া মরে। যেমন স্বপ্নে সর্প-দংশন করিয়াছে ভাবিয়া স্বপ্নগ্রস্ত লোক অধীর হইয়া কাঁদিয়া উঠে, জাগিয়া আপন ভুল বুঝিয়া হাঁসিতে থাকে, সেইরূপ তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয়ে জীব, সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, পরম আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে। আপনাকে বুঝিয়া, আপনার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলেই মানব ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারে। তাহাতে বদ্ধ জীবাত্মা ভূমা পরমাত্মায় পরিণত হইয়া থাকে।

শারীরক ভাষ্য, গীতাভাষ্য, আত্মবোধ, বিবেক-চূড়ামণি প্রভৃতি শঙ্কর প্রণীত সকল গ্রন্থেই এই অদ্বৈতবাদের উপদেশ, শিক্ষা বিশদভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। শঙ্করের মতে অদ্বৈতবাদই বেদের একমাত্র সার সিদ্ধান্ত। বেদ সম্বন্ধে শঙ্করের অভিমত এই যে আপ্ত বাক্য বা সত্য শব্দ সমূহের সমষ্টি বেদ। বাক্য বা শব্দের দুই ভাব—এক বাহ্য অপর আভ্যন্তরীণ ভাব। বাহ্যভাব যেমন উদয় হয়, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি লয় হইয়া যায়। আর আভ্যন্তরীণ ভাব সমূহ ধারণায় পরিণত হয়। এই ধারণা সমূহ

স্থান ও কালের অতীত। এই ধারণা সমূহ অনাদি অনন্ত কাল সত্যরূপে ব্রহ্মে সংস্থিত। এই সত্য সমূহই বেদরূপে প্রকটিত। বেদের সত্যতা সকল হিন্দুই স্বীকার করিয়াছেন। এমন কি নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শনও বেদকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পরম আস্তিক সনাতনধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা শঙ্কর বেদকে কখনই ভ্রান্ত বা সাময়িক বা পৌরুষেয় বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন না। বেদই হিন্দু ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। বেদ প্রতিষ্ঠার জন্য—বৈদিক ধর্ম্মের সারতত্ত্ব অদ্বৈত-বাদের প্রতিষ্ঠার জন্যই—শঙ্কর জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি বেদের সত্যতা শিরোধার্য্য করিয়া মুক্তকণ্ঠে জগতে ঘোষণা করিয়াছেন—

"বেদ শব্দেন তু সর্ব্বত্র শব্দরাশির্ব্বিবক্ষিতঃ।"

যে শব্দ সমূহ সত্যতা সংস্থাপনের জন্য কোন রূপ প্রমাণের অপেক্ষা করে না, তাহাই বেদ। হিন্দুর জীবন-স্বরূপ, হিন্দু ধর্ম্মের মূল ভিত্তি স্বরূপ বেদ বেদ-প্রচার ও বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান উদ্দেশেই তিনি ভারতের চারি প্রান্তে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি বিজয়-স্তম্ভ স্বরূপ চারিটী ধর্ম্মমঠ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সকল মঠ আজিও বিদ্যমান রহিয়া শঙ্করের অপূর্ব্ব কার্য্যকীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

শঙ্কর বেদের দুই প্রধান অঙ্গ কর্ম্ম-কাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড মানিয়া লইয়া সাধনার অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কর্ম্মকাণ্ড অনুসরণ ও অনুষ্ঠান দ্বারা প্রথমে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে

হয়। তৎপরে নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানে দৈহিক ও মানসিক কলুষ রাশি বিনষ্ট হইলে জ্ঞান-কাণ্ডে অধিকার জন্মে। কেবল তখনই বৈদিক সত্য ধারণা সমূহকে সাধক স্বয়ং উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

অনেকে মনে করেন ও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন শঙ্কর শুষ্ক জ্ঞান-মার্গের অদ্বৈতবাদ ও আত্মবোধ, আত্মদর্শনই প্রচার করিয়াছেন। ইহা নিতান্ত ভ্রম। কারণ তিনি মূলে তপস্যাদি সাধনা যে বিশেষ প্রয়োজন, তাহা সুস্পষ্ট মানিয়াছেন ও পরিব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে সাধনার স্তরগত ক্রম প্রধাণতঃ ছয়টি অংশে বিভক্ত যথা শম, দম, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান ও উপরতি। যেমন যোগ-পন্থায় যম, নিয়ম আসন, প্রণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি, এই অষ্টবিধ অঙ্গে সাধন-প্রক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তেমনি শঙ্করও উক্ত অদ্বৈত তত্ত্বের সাধনায় পূর্ব্বোক্ত ষষ্ঠবিধ ক্রম মূলে স্বীকার্য্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। পরিশেষে ব্রহ্মতত্ত্ব অধিগত করণ পথে শ্রবণ, মনন ও নিধিধ্যাসন এই ত্রিবিধ পন্থাও নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এই সকল পন্থা পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান থাকিলেও শঙ্কর কর্ত্তৃক উহারা বিশেষরূপে প্রখ্যাত হইয়াছে।

আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকৃত ভাবে অধিগত করিতে হইলে, তাহাদের উভয়ের সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। বেদান্তের প্রধান এই কয়টি বাক্য বিশেষ ভাবে পরিপুষ্ট করিয়া, শঙ্কর সে সমন্বয়-পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন—

১—প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম = প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।

২—অহং ব্রহ্মাস্মি = আমি ব্রহ্ম।

৩—তত্ত্বমসি = আমি সেই আত্মা।

৪—অয়মাত্মা ব্রহ্ম = এই আত্মাই ব্রহ্ম।

প্রথমোল্লিখিত ছয়টী সাধন অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞান পন্থা পরিষ্কৃত হইলে, শেষোক্ত বাক্য চতুষ্টয়ের সমাধান করিতে হয়। সেই সমাধান পক্ষে শেষোক্ত ক্রমত্রয় যথা শ্রবণ অর্থাৎ কেবল কর্ণ দ্বারা শুনা নহে—গুরুবাক্যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিয়া সাধনমার্গে অগ্রসর হওয়া প্রথম ক্রম। তৎপরে তাহাদিগকে চিন্তা দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সাধ্যের প্রতি আকৃষ্ট একাগ্র করার নাম দ্বিতীয় ক্রম—মনন। সর্ব্বশেষে সাধ্য বিষয়কে পূর্ণভাবে উপলব্ধি ও আয়ত্ত করিবার জন্য বারবার স্মরণ করিবার নাম তৃতীয় ক্রম নিধিধ্যাসন।

প্রথম ছয় ক্রমের সাধনাদ্বারা সাধক সমুন্নত হইলে শেষোক্ত তিন ক্রমের সাধনা করিতে হয়। শঙ্কর এইরূপ স্তরগত ক্রমিক সাধনাকে নিজকৃত ভাষ্যে বহুস্থানে পরিপুষ্ট করিয়া তাহাদের সারবত্তা প্রদর্শন করিয়াছেন। আত্মদর্শন, আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মত্ব লাভ পক্ষে শঙ্কর আত্মার ও ব্রহ্মের যে স্বরূপ-তত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, অনেকে সেই অদ্বৈত-পন্থাকে পাশ্চাত্য অদ্বৈতবাদ ও শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদ (Pantheism Superpantheism) বলিয়া মনে করেন। ইহা কিন্তু যথার্থ নহে। প্রতীচ্য অদ্বৈতবাদের সহিত শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদ ঠিক একরূপ নহে। উভয়ের

মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সে কথার বিশদ আলোচনা এখানে অসম্ভব। তবে বাহ্য ব্যাপার বিষয় (Phenomena) আদিতত্ত্বের (numena) প্রকটিত ভাব একথা প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় অদ্বৈতবাদ মতে স্বীকার্য্য। বেদান্তের এই নির্দ্দেশই শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত। যেমন স্বুবর্ণ হইতে বলয়, হার ইত্যাদি অলঙ্কারের সৃষ্টি—ইহা দুই মতেই মানিয়া থাকে। কিন্তু এদেশে সে সম্বন্ধে মত-পার্থক্য ঘটায়, বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের প্রতিপক্ষে রামানুজ গোবিন্দ আদি ভক্তিমার্গের পণ্ডিতগণের দ্বৈতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। তবে প্রতীচ্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে হিগেল যে বিখ্যাত সিদ্ধান্ত (identity of thought and Reality) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাতে শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত বিশুদ্ধাদ্বৈত বাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

এদেশে সাধারণ লোকের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস আছে যে শঙ্কর কেবল শুষ্ক জ্ঞান-পন্থাই প্রচার করিয়াছেন। তিনি কখনও নিজে ভক্তি-পথে পরিচালিত হন নাই বা ভক্তি-পথের প্রসার পরিস্ফুতি সাধনেও চেষ্টা করেন নাই। ইহা নিতান্তই ভ্রমাত্মক বিশ্বাস। শঙ্কর উভয় ভাবেই ভাবান্বিত ছিলেন। তিনি জ্ঞান পন্থার প্রসার সাধনে যেমন ব্যগ্র ছিলেন, তেমনি ভক্তি-পন্থারও উন্নতি সাধনে উদ্যোগী ছিলেন। তাহার কৃত গ্রন্থ সমূহই সে সম্বন্ধে অতি উজ্জ্বল প্রমাণ স্বরূপ। তৎকৃত বহু ভাষ্য যেমন জ্ঞান পন্থার পরিচায়ক, তাঁহার স্তবমালা তেমনি ভক্তিভাবের নির্দর্শন।

বেদান্ত ডিনণ্ডিমে বলিতেছেন :—

"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ।
ইদমেব তু সচ্ছাস্ত্র মিতি বেদান্ত ডিণ্ডিম॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা, জীবই ব্রহ্ম ইত্যাদি—

আবার আত্মবোধে বলিতেছেন :—

"বোধো হন্য সাধনেভ্যোহি সাক্ষান্মোক্ষৈক সাধনম্।
পার্থক্য বহ্নি বজজ্ঞানং বিনা মোক্ষয়ে সিধ্যতি॥

অর্থাৎ রন্ধন-কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্নি যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি কর্ম্ম অনুষ্ঠান আদি মোক্ষ লাভের যে সকল উপায় আছে সে সকলের অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ।

"অবিরোধি তয়া কর্ম্ম না বিদ্যাং বিনিবর্ত্তয়েৎ।
বিদ্যাহবিদ্যাং নিহন্ত্যেব তেজ তিমির সঙ্ঘবৎ॥"

কর্ম্ম অবিদ্যায় কোন বিরোধ নাই। অবিরোধিতা হেতু কর্ম্ম কখনও অবিদ্যাকে নাশ করিতে পারে না। কিন্তু আলোক যেমন অন্ধকারকে বিনষ্ট করিয়া থাকে, সেইরূপ বিদ্যা অবিদ্যাকে ধ্বংস করিয়া থাকে।

"তাবৎ সত্যং জগদ্ভাতি শুক্তিকা রজতং যথা।
যাবন্নজ্ঞায়তে ব্রহ্ম সর্ব্বাধিষ্ঠান মদ্বয়ম্॥

যেমন ঝিনুককে রূপা বলিয়া ভ্রম হয়, যতক্ষণ রূপা জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ সে ভ্রম থাকে। পরে যখন শুক্তি-জ্ঞান জন্মে, তখন রজত-ভ্রম দূর হয়, সেইরূপ যতক্ষণ বিশ্বরূপের আধার অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব না জানা যায় ততক্ষণ সংসারকে সত্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

সচ্চিদাত্মন্যনস্ত্যম্যুক্তে নিত্যে বিষ্ণু বিকল্পিতা।
ব্যক্তয়ো বিবিধাঃ সর্ব্বা হাটকে কটকাদিবৎ।

এই জগত একমাত্র ব্রহ্ম পদার্থে বিবিধ প্রকারে ভাসমান হইয়া মায়া দ্বারা কল্পিত হইয়া রহিয়াছে। 'একমাত্র সুবর্ণ হইতে যেমন কেয়ুর কুণ্ডল প্রভৃতি বিবিধ প্রকার অলঙ্কার নির্ম্মিত হয়, সেইরূপ একমাত্র ব্রহ্ম পদার্থ হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগতে বিভিন্ন প্রকারের নানা বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে।

যথাকাশো হৃষিকেশো নানোপাধি গতো বিভুঃ।
তদ্ভেদাদ্ ভিন্ন বদ্ভাতি তন্নাশাদেকবদ্ভবেৎ। ৯॥

এক বৃহৎ বস্তু আকাশ যেমন ঘটে, পটে, মাঠে বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া নানা প্রকার উপাধি গত হয়, উপাধির বিভিন্নতা হেতু ঘটাকাশ, মঠাকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হয় এবং ঘটাদির বিনাশ হইলে অর্থাৎ উপাধির বিনাশ হইলে পূর্ব্ববৎ এক আকাশ পদার্থ একইরূপ থাকে, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপি এবং সর্ব্ব প্রকার ইন্দ্রিয়-প্রবর্ত্তক দেবতা মনুষ্যাদি উপাধিগত বিভূ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হইয়া, তৎ সমুদয়ের বিনাশ হইলে পুনর্ব্বার একরূপই প্রতীত হয়। এই সকল বাক্যে শঙ্করকে কেবল জ্ঞানপন্থার অনুগামী বলিয়া মনে হয়। আবার নিম্নে উদ্ধৃত স্তোত্র সকল পাঠ করিলে, তাঁহাকে কে না মহাভক্ত বলিবে ?

নারায়ণ-স্তোত্র ।

করুণা পারাবারা করুণালয় গম্ভীরা ।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

শিব-স্তোত্র ।

আদৌ কর্ম্ম প্রসাদাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকুক্ষৌ স্থিতং মাং ।
বিন্মূত্রামেধ্য মধ্যে ব্যথয়তি নিতরাং জাঠরো জাতবেদাঃ ।
যদযদ্বৈ তত্র দুঃখং ব্যথয়তি নিতরাং শক্যতে কেন বক্তুং ।
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥

প্রথমতঃ কর্ম্ম-বন্ধন জন্য অনেক পাপফল ভোগ হইয়াছে, আমি যখন জননী-জঠরে নিবিষ্ট ছিলাম তখন বিষ্ঠা ও মূত্র মধ্যে নানারূপ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে এবং মাতার জঠরাগ্নি সর্ব্বদা আমাকে নানাবিধ ব্যথা দিয়াছে, অতএব আমি যে দুঃখ পাইয়াছি তাহা কে বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে ? এই সকল দুঃখ আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধের ফল। হে শম্ভো ! হে শিব ! হে মহাদেব ! আমার যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা কর।

এইরূপ স্তব স্তোত্রে শঙ্করের ভক্তি পরিচয় প্রকৃষ্ট-রূপে প্রকটিত। তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যাদি তপস্যা অনুষ্ঠানেরও নিদর্শন সুপ্রচুর। অদ্বৈতবাদের তত্ত্ব উপদেশে শঙ্করের জ্ঞানপন্থা পূর্ণাঙ্গে পরিব্যক্ত। ফলত আচার্য্যদেব কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি তিন পন্থারই পরিপোষক প্রচারক ছিলেন।

আচার্য্য ও মণ্ডন সংবাদ।

(বিশদ বিস্তৃত বিবরণ।)

মণ্ডল পূর্ব্বে রাজগৃহে অবস্থান করিতেন। পরে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া তিনি মাহিষ্মতী নগরে আবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নগর বর্ত্তমান জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী। সন্ন্যাস ধর্ম্মগ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি এই স্থানেই ছিলেন। মাহিষ্মতী তৎকালে চেদী প্রদেশের রাজধানী-রূপে রেবা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। তথায় উপস্থিত হইয়া এক ব্যক্তিকে আচার্য্য মণ্ডলের গৃহ কোথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আচার্য্য দেবের জিজ্ঞাসার উত্তরে নাগরিক কহিল—তাঁহার গৃহে দাসীরা ও শুক পক্ষীগণ বেদবাক্য 'স্বতঃ প্রমাণ কি পরত প্রমাণ' 'কর্ম্মই জীবের শুভ অশুভ ফল প্রদান করে কিম্বা ঈশ্বর তাহা প্রদান করিয়া থাকেন' 'জগৎ অনিত্য অথবা নিত্য' এই সকল গুঢ় তত্ত্ব-কথা লইয়া আলোচনা করিয়া থাকে। অধিবাসীগণের মুখে এই কথা শুনিয়া শঙ্কর, মণ্ডলের গৃহ উদ্দেশে গমন করিলেন। তিনি, মণ্ডন মিশ্রের গৃহ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, অধিবাসীগণ কথিত লক্ষণাদি দর্শনে মিশ্রের ভবন চিনিতে পারিলেন।

মণ্ডলের ন্যায় তাঁহার পত্নী উভয় ভারতীও শাস্ত্রজ্ঞানে মহা পণ্ডিতা ও তত্ত্ববিদ্যায় পরমা বিদূষী ছিলেন। যখন আচার্য্যদেব তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন মণ্ডন বিদূষী পত্নী সহ পিতৃশ্রাদ্ধ ক্রিয়ায় ব্যাপৃত ছিলেন। আচার্য্য অলৌকিক শক্তিতে মণ্ডনের নিকট উপস্থিত হইলেন ও বিচারতর্ক প্রার্থনা করিলেন।

মণ্ডন জিজ্ঞাসিলেন কাহার সহিত, কিরূপ প্রকৃতির লোকের সহিত, কি বিচার করিব?' আচার্য্য কহিলেন—'আমি ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি ও মহাজ্ঞানী বিদ্যাবিশারদ আচার্য্যের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। আপনি আমার সহিত শাস্ত্র-বিচারে প্রবৃত্ত হউন। ইহাই আমার বাসনা—ইহাই আমার প্রার্থনা।' মিশ্র কহিলেন—'তুমি ব্রাহ্মণ বংশ-সম্ভূত। কিন্তু তোমার বাহ্য লক্ষণে তাহা কিরূপে বুঝিব? তোমার গলদেশে উপবীত নাই—তোমার মস্তক শিখাহীন। তুমি কিরূপ ব্রাহ্মণ?' আচার্য্য সহাস্য বদনে কহিলেন—'কেবল শিখা বা উপবীত ধারণ করিলে কি ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়? ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সে লক্ষণ ভার বোঝার বিড়ম্বনা মাত্র। সে সকল অসার অনর্থক ভার বহন করিয়া ফল কি?' মণ্ডন আচার্য্যের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ক্রোধভরে মণ্ডন কহিলেন—'দেখিতেছি তুমি সন্ন্যাসী সাজিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়াছ। দেহে কান্থার ভার বহন করিতেছ। তাহার ভার বহিতে পারিতেছ; কিন্তু উপবীত শিখার ভার কি এতই অধিক বোধ হইল? দেখিতেছি তুমি একটি ভারবাহী গর্দ্দভ বিশেষ।' আচার্য্যদেব ব্যঙ্গভাবে কহিলেন,—'গর্দ্দভ কে? রমণী যাহাকে গালি দেয়, যে হতভাগ্য সেই রমণীকে পোষণ করে, যে সেই রমণীর ভার বহন করে সেই হতভাগ্য জনই তো গর্দ্দভ। আমি হতভাগ্য ভারবাহীগণের ভার বিনষ্ট করিতে যত্নবান ও প্রবৃত্ত হইয়াছি।' মণ্ডন কহিলেন,—'তোমার এ অদ্ভুত বৈরাগ্য। এরূপ বৈরাগ্যে কি সন্ন্যাসের

অধিকার লব্ধ হইয়া থাকে? তুমি সংসারে—কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিয়া, কিরূপে প্রকৃত বৈরাগ্য, যথার্থ সন্ন্যাস লাভ করিতে সমর্থ হইবে?' শঙ্কর কহিলেন,—'বেদে কথিত হইয়াছে যে কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাদি মহৎ-লোক অধিগত হইয়া থাকে। যিনি প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ তিনি বিচার-বুদ্ধি দ্বারা স্বর্গাদি লোক পরীক্ষা করিয়া বৈরাগ্য-পন্থা অবলম্বন করিবেন। যে শুভ মূহূর্ত্তে হৃদয়ে সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, সেই শুভ মূহূর্ত্তেই সন্ন্যাসী হইবে। ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম প্রভৃতি সমুদয় পন্থা পরিত্যাগ করিয়া, বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব কথা শ্রবণ করিবে। সংসার-ধর্ম্মে, কর্ম্মে বা ধন সম্পদে মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে না। এক মাত্র ত্যাগেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। সংসার-ত্যাগী পরিব্রাজক মহাত্মাই প্রকৃত ত্যাগী পুরুষ। পরিব্রাজক বর্ণভেদ-হীন, বস্ত্রহীন, মুণ্ডিত-মস্তক হইয়া সচ্ছন্দে যথেচ্ছা পরিভ্রমণ করিবেন। তিনি কখনই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন না। শিখা বা উপবীত ধারণ করিলে শ্রুতি-বাক্যে দোষ-ভার প্রদত্ত হয়। ব্রহ্ম-জ্ঞান—প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠা সন্ন্যাস-পন্থা অবলম্বনেই ঘটিয়া থাকে। সেজন্য আপনি কেন ক্রুদ্ধ হইতেছেন? আমি যথার্থ ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের জন্যই সন্ন্যাস-অবলম্বন করিয়াছি। তজ্জন্য আপনার ক্রোধের কোনই কারণ নাই। মণ্ডন, আচার্য্য-দেবের কথায় ব্যঙ্গভাবে কহিলেন,—'ওঃ, বুঝিলাম তুমি পত্নী পরিবারের ভার গ্রহণ করিতে ও বহন করিতে অসমর্থ বলিয়াই গৃহ ও গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছ।' আচার্য্যদেব, মিশ্রের

অন্যায় কথা শুনিয়া বিরক্ত হইলেন ও কহিলেন, 'তুমি গৃহী। তুমি জাননা ব্রহ্মচর্য্য গুরুসেবা কি কঠোর সাধনা। তুমি সেই কঠোর সাধনার ভয়ে ভীত হইয়া, আলস্য ও ভোগের আশ্রয় লইয়া গৃহ সংসারে রহিয়াছ। গৃহীর জন্য পঞ্চ যজ্ঞের বিধান শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ বেদাধ্যয়নে ব্রহ্মযজ্ঞ, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় পিতৃ-যজ্ঞ, হোম-ক্রিয়ায় দেব-যজ্ঞ, কাকাদিকে ভোজ্যদান ভূত-যজ্ঞ এবং অতিথিসেবা নরযজ্ঞ এই যে পঞ্চযজ্ঞ বা পঞ্চশূনা শাস্ত্রের নির্দ্ধারিত মহৎ কর্ম্ম, সে কর্ম্ম সাধনের জন্য তোমার গৃহাশ্রম নহে। রমণী-সেবা যোষিৎ-সঙ্গ তোমার গৃহ-ধর্ম্মের মূখ্য উদ্দেশ্য। মণ্ডন কহিলেন,—'নারী সেবা অধর্ম্ম কিসে? যে রমনী গর্ভে ধারণ করেন ও শৈশব-অবস্থায় লালন পালন করেন, তুমি সেই মহীয়সী রমণীর নিন্দা করিতেছ। এই কি তোমার ধর্ম্মজ্ঞান? তুমি নিতান্তই মূর্খ, তাই দেবী তুল্যা-নারীকে ঘৃণা কর।' শঙ্কর ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন,—'তুমি পশুতুল্য। যে স্ত্রী হইতে তুমি উৎপন্ন, তাহার সহিত পশুবৎ ব্যবহার করিয়া থাক।'

মণ্ডন।—তুমি অজ্ঞ—অন্ধ সদৃশ। তুমি ইন্দ্রঘাতক। শ্রুতিতে বিধান রহিয়াছে যে গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণ নামক তিন অগ্নিসেবা দ্বারা ইন্দ্রকে পরিতুষ্ট করিতে হয়। তুমি সেই অগ্নি-ত্রয়কে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ। তজ্জন্য তুমি ইন্দ্রঘাতী হইয়াছ।'

শঙ্কর।—পাপ বহু প্রকার। পাপীও বহু জাতীয়। কিন্তু

আত্মহত্যার মত পাপ ও আত্মঘাতীর মত পাপী আর নাই। আত্মতত্ত্ব ধারণা না করাই সেই আত্মহত্যা রূপ মহাপাপ। তুমি আত্মতত্ত্ব ত্যাগ করিয়া আত্মহত্যা রূপ মহা পাপে পাপী হইয়াছ। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যাহারা ব্রহ্মবিৎ নহে—যাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান নাই, তাহারাই আত্মঘাতী'। মৃত্যুর পর এই মহাপাপী আত্মঘাতীরা 'অসূর্য্য' নামক আঁধার-লোকে গমন করে।'

আচার্য্য দেবের, বৈদিক বিচারে মণ্ডন নিরুত্তর হইয়া অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন। মণ্ডন, সাধারণ মূর্খের ন্যায় কহিলেন—'তুমি কিরূপে এখানে প্রবেশ করিলে?' মণ্ডন কেবল জ্ঞান বা বিদ্যায় নহে, ধন সম্পদেও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বৃহৎ ভবন সর্বদা প্রহরী দ্বারা পরিবেষ্টিত ও তাঁহার গৃহ দ্বার দ্বারবানগণ দ্বারা পরিরক্ষিত হইত। আচার্য্যদেব যোগবলে অলৌকিক ক্ষমতায় মণ্ডনের গৃহ মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মণ্ডন ক্রোধান্ধ হইয়া কহিলেন—'কেন তুমি দ্বারবানগণকে প্রতারিত করিয়া সামান্য চোরের মত এখানে আসিয়াছ?'

শঙ্কর কহিলেন—'হাঁ আমি তস্করের মতই আসিয়াছি। কিন্তু তোমার একি ব্যবহার? তুমি ভিখারী দিগকে ভিক্ষা প্রদান না করিয়া কেন বিষয় ভোগ কর? ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুককে ভিক্ষা খাদ্য প্রদান না করিয়া যে সম্পদ উপভোগ করে সেই তো তস্কর।'

মণ্ডন ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া কহিলেন,—'তুমি মুখে 'ব্রহ্ম' 'ব্রহ্ম' করিতেছ। কোথায় সেই ভূমা ব্রহ্ম আর কোথায় তোমার মত মেধাহীন ব্যক্তি। ভাবিয়া দেখ এই কাল কলিকাল। কোথায় সন্ন্যাস আর কোথায় কলিকাল! তুমি মহালোভী। তুমি অজ্ঞ গৃহীর গৃহে মিষ্টান্ন ভোজনের লোভে যতিবেশ ধারণ করিয়াছ। পৃথিবীতে আসিয়া সংসারীদিগকে প্রতারিত করাই তোমার উদ্দেশ্য।'

শঙ্কর প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—'কোথা স্বর্গ, আর কোথায় তোমার মত বিষয়াসক্ত ব্যক্তি! কোথায় অগ্নিহোত্র-যাগ, আর কোথায় ঘোর কলি? তোমার আচার ব্যবহার দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় তুমি ধর্ম্মহীন। তুমি ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগ করিবার জন্য মিথ্যা ছলনা করিয়া ধার্ম্মিক গৃহস্থের ভাণ কর।' মণ্ডন ক্রোধান্ধ হইয়া কহিলেন,—'যাও আমি এখন পবিত্র শ্রাদ্ধ কর্ম্মে ব্যাপৃত। এই বিশুদ্ধ কর্ম্মের সময় তোমার মত মূর্খ অজ্ঞের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করি না।' তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া দুইজন ঋষিকল্প ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। মণ্ডনের কথায় ও ব্যবহারে তাঁহারা ব্যথিত হইলেন। তাঁহারা ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন—'বৎস মণ্ডন, যে ব্যক্তির পত্নী ও পুত্র লইয়া সংসার ভোগ করিবার ইচ্ছা নাই—যিনি আত্মার স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন—তাঁহার প্রতি অসাধু জনোচিত কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করা সাধু সজ্জনের কর্ত্তব্য নহে। তুমি ইঁহাকে এখনও চিনিতে পার নাই। ইনি মহাপুরুষ যতি—সাক্ষাৎ নারায়ণ তুল্য।

ইনি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া তোমার গৃহে আসিয়াছেন। তুমি সমাদর করিয়া ইহাঁকে নিমন্ত্রণ কর।'

মণ্ডন এতক্ষণ আত্মবিস্মৃত হইয়া আচার্য্যের প্রতি অসৎ ব্যবহার করিতেছিলেন। এতক্ষণে তিনি প্রকৃতিস্থ ও প্রশান্ত হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। আচার্য্যদেবের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া, আচমন পূর্ব্বক মহা সমাদরে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। আচার্য্যদেব কহিলেন—'আমি একমাত্র ভিক্ষা আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি।' মণ্ডন বিনীত ভাবে কহিলেন—'কি ভিক্ষা বলুন?' আচার্য্য কহিলেন,—'তর্ক ভিক্ষা। আমি যুক্তিতর্ক সহ আপনার সহিত শাস্ত্রের বিচার করিতে চাই।' মণ্ডন তাহা স্বীকার করিলে উভয়ে অঙ্গীকারে বদ্ধ হইলেন যে, যে বিচারে পরাস্ত হইবে, সে শিষ্য হইবে। আচার্য্য কহিলেন,—'আমার প্রধান বিচার্য্য বিষয় বেদান্ত। বেদান্তের গুঢ় পন্থা সম্প্রসারণ করাই আমার উদ্দেশ্য।'

দাম্ভিক পণ্ডিত মণ্ডল সগর্ব্বে কহিলেন,—'উত্তম। আপনি যে বিষয়ে ইচ্ছা করেন, সেই বিষয় লইয়াই তর্ক করুন। আমাকে এ সংসারে কে পরাজিত করিতে পারে? সহস্র-বদন অনন্ত আসিলেও কখন বলিতে পারিবে না যে মণ্ডল 'পরাজিত'। যাহা হউক ভালই হইল। বহুদিন হইতে আমার মনে বড়ই তর্কের সাধ জন্মিয়াছে। আসুন আপনার সহিত বিচারে সে সাধ মিটাই। জানেন তো আমি কৃতান্তের নিয়ামক যে ঈশ্বর তাহারও বিনাশ-কর্ত্তা। মীমাংসা শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন

এবং মীমাংসকেরাও বলিয়া থাকেন 'ঈশ্বর নাই। কর্ম্মই জীবের শুভাশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে। আমি তর্ক ও বিচার দ্বারা কর্ম্মবাদকে সুদৃঢ় করিয়াছি। আপনিও তার্কিক। আপনার ন্যায় তার্কিককে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। এখন একটা কথা আছে।'

আচার্য্য কহিলেন—'কি কথা?'

মণ্ডন।—কথা এই যে তর্ককালে শাস্ত্রীয় বহু গূঢ় প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবে। তখন আমি একরূপ কহিব। আপনি আর একরূপ কহিবেন। সে ক্ষেত্রে একজন বিচারক প্রয়োজন। তিনিই মধ্যস্থ থাকিয়া আমাদের তর্ক-সম্বন্ধে বিচার করিবেন ও যথার্থ মন্তব্য প্রকাশ করিবেন।

মণ্ডনের এই কথায় উক্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদ্বয় কহিলেন—'আপনার পত্নী দেবী উভয়ভারতী পণ্ডিতা বিদূষী। তিনিই এক্ষেত্রে মধ্যস্থতার উপযুক্তা পাত্রী। তিনিই পণ্ডিতদ্বয়ের বিচারে মধ্যস্থ হউন। এইরূপ স্থির হইলে, আচার্য্যদেব শিষ্যগণ সহ রেবা তীরে এক দেবালয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে যথাসময়ে বিচারকালে তিনি, শিষ্যগণ সহ বিচার স্থলে উপস্থিত হইলেন। শঙ্কর ও মণ্ডন উভয়েই মহা পণ্ডিত। তৎকালে-ভারতে তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের যশ-প্রভায় সর্ব্বদিক প্রভাসিত হইয়াছিল। তাঁহাদের বিচারের সংবাদ শুনিয়া বহুস্থান হইতে বহু পণ্ডিত ও বহু লোক আসিয়া বিচার স্থলে সমাগত হইল।

সকলেই বিচার ব্যাপার দেখিবার জন্য সমুৎসুক-উদগ্রীব রহিলেন।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য স্থাপনের জন্য আচার্য্য কহিলেন—'রজতের গুণ লাভ করিয়া শুক্তি যেমন রজত রূপে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ নিত্যজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ একই পরমার্থ বা পরমাত্মা বিশুদ্ধ ব্রহ্ম নিবিড় অনাদি অজ্ঞানে আচ্ছাদিত হইয়া, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড রূপে প্রকাশ পান। পবমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্য-বোধই প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণ যে ঐ অজ্ঞান ভ্রম, তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। যেস্থানে পঁহুছিতে পারিলে ঐ অজ্ঞান ভ্রমের বিলোপ হয়, তাহাই পরমাত্মা। নির্ব্বাণমুক্তি সেই পরমাত্মা-অনুভূতিরই নাম—উহাই জীবন্মুক্তি বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। এই প্রকার প্রতিজ্ঞা-ব্যাপারে বেদান্ত-শাস্ত্র সমূহই আমার পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ। যথা (১) ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ অনন্ত। তিনি বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় (একোমেবাদ্বিতীয়ং সত্যং জ্ঞানমনন্তং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম)। (২) এই পরিদৃশ্যমান অখিল ব্রহ্মাণ্ড কেবল ব্রহ্মময় (সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম)। (৩) আত্মজ্ঞ যিনি তিনি শোক উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন (তরতি শোক আত্মবিৎ)। (৪) তিনি কেবল একমাত্র ব্রহ্ম দর্শন করেন—তদবস্থায় তাঁহার শোকই বা কি মোহই বা কি? (তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একধমনুপশ্যত।) (৫) যিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান (ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি)। (৬) তিনি আর

সংসারে ফিরিয়া আসেন না(ন সঃ পুনরাবর্ত্ততে—ন স পুনরাবর্ত্ততে) ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যই আমার পক্ষে প্রমাণ। অতপর আচার্য্য আরও কহিলেন—'পণ্ডিতপ্রবর, আমার পক্ষীয় প্রমাণ কথিত হইল। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যদি আমি এই তর্ক-বিচারে পরাজিত হই, তবে আমি তৎক্ষণাৎ এই কষায় বস্ত্র ত্যাগ করিব এবং আপনার মত শুভ্র বসন পরিধান করিব। বিচার কালে দেবী উভয় ভারতীই জয় পরাজয় নির্দ্ধারণ করিবেন।'

মণ্ডন কহিলেন,—'আপনি যে প্রতিজ্ঞা করিলেন—পরমাত্মা চিৎস্বরূপ; এসম্বন্ধে বেদান্ত-বাক্য কখনই প্রমাণ হইতে পারে না। কেননা চিৎস্বরূপ যাহা তাহা নিত্য, আর বাক্যস্বরূপ যাহা তাহা অনিত্য। সুতরাং নিত্যের সহিত অনিত্যের সম্বন্ধ অসম্ভব। সে সম্বন্ধ হইতেই পারে না। শব্দের শক্তি একমাত্র কার্য্যেই সংশ্লিষ্ট হইতে পারে; কিন্তু চিৎপদার্থ কার্য্যের অতীত। সেই চিৎস্বরূপ পরমাত্মা কার্য্যের অতীত। কার্য্যাতীত পরমাত্মার সহিত, শব্দ কখনই সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং চিৎস্বরূপ পরমাত্মার অস্তিত্ব কিরূপে জানিতে পারিব? বেদান্তের পূর্ব্বভাগ যে 'মীমাংসা বাক্য' তাহা অবশ্যই প্রামাণ্য; কেননা উহা কর্ম্মবিষয়ে বিজড়িত। কেবল কার্য্যের প্রতিই প্রসিদ্ধ বাক্য সমূহের শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। ফলতঃ কর্ম্ম হইতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। অতএব কর্ম্মই দেহধারী জীবের জীবনে একমাত্র করণীয় ও বাঞ্ছনীয়। শ্রুতি বাক্য এই যে 'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবে।

(যাবজ্জীবমগ্নিহোত্র জুহুয়াৎ) ইত্যাদি। ইহাই আমার তর্কের প্রমাণ। আমি যদি এই বিচার তর্কে পরাজিত হই, তবে আমি শুভ্র বসন ত্যাগ করিয়া কষায় বসন পরিধান করিব ও গৃহাশ্রমও পরিত্যাগ করিব। আপনার পক্ষে আমার পত্নী উভয় ভারতী যেমন সাক্ষী হইলেন, আমার পক্ষেও সেইরূপ তিনিই সাক্ষী রহিলেন।'

মণ্ডনের পত্নী বিদূষী উভয় ভারতী মনোহর সুগন্ধি পুষ্পমালা লইয়া স্বীয় পতিরও আচার্য্যদেবের গলদেশে অর্পণ করিলেন। তিনি কহিলেন—'উভয়ের গলদেশে আমি পুষ্পমাল্য রক্ষা করিলাম। যাহার গলার মাল্য অগ্রে ম্লান হইবে বুঝিয়া লইবেন তিনিই বিচারে পরাজিত হইলেন।' এই বলিয়া দেবী উভয় ভারতী খাদ্য সংগ্রহের জন্য ক্ষণকাল প্রস্থান করিলেন।

অতি ধীর ভাবে উভয় পণ্ডিত বিচার করিতে লাগিলেন। এইরূপ সপ্তদশ দিবস পর্য্যন্ত বিচার বিতর্ক চলিতে লাগিল। তৎপরে উভর ভায়তী শঙ্করের যুক্তি সকল সমীচীন বলিয়া অনুমোদন করিলেন। মণ্ডন মিশ্র বিষণ্ণভাবে নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার গলদেশের পুষ্পমাল্য পরিম্লান হইয়া গেল! ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া উভয়ভারতী উভয়কে আহ্বান করিলেন।

আহারাদি সমাপনান্তে আচায্যদেব ধীর ভাবে, মণ্ডনের আর কি বাসনা, তাহাই জানিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন। মণ্ডন কহিলেন—'যতিরাজ, আপনার নিকট এই পরাজয়ে

আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হই নাই। তবে একটি দুঃখের কথা এই যে বিচারে আপনি মহর্ষি জৈমিনির বচন সমূহ প্রতিবাদ ও খণ্ডন করিয়াছেন। তাহাতেই আমি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি।'

শঙ্কর কহিলেন,—'পণ্ডিত প্রবর, আপনি সেরূপ কখনই মনে করিবেন না। আমরা অজ্ঞতা নিবন্ধন মহর্ষি জৈমিনির অভিপ্রায় বা অভিমত বুঝিতে পারি নাই, প্রকৃতরূপে প্রমাণও করিতে পারি নাই।' আচার্য্যের কথা শুনিয়া মণ্ডন বিস্মিত হইলেন। জৈমিনির প্রকৃত অভিপ্রায় ও অভিমত কি তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহর্ষির যথার্থ সিদ্ধান্ত কি ছিল?' আচার্য্য কহিলেন—'মহর্ষি স্বয়ং ব্রহ্ম সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। তবে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে সাধারণ বিষয়াসক্ত ব্যক্তি কখনই নির্ম্মল ব্রহ্মকে বুঝিতেও পারিবে না--হৃদয়ে ধারণা করিতেও পারিবে না। তবে তাহাদের সংগতির উপায় কি? তাহারা কিরূপে মুক্ত হইবে--কিরূপে তাহাদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটিবে, তাহার প্রকৃত পথই বা কি—সেই পন্থা প্রদর্শনের জন্য তিনি সৎ শুভকর্ম্মের ও সেই কর্ম্মজনিত পূণ্যের ফল বিধান করিয়াছেন। তাই সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম-তত্ত্ব পরব্রহ্ম তত্ত্ব নির্ণয় করেন নাই। ব্রাহ্মণ বেদবাক্য দ্বারাই সে তত্ত্ব জানিতে পারিবেন। এইরূপে পূর্ব্বাভাষ করিয়া মহর্ষি জৈমিনি বেদ-বাক্যের সারবত্তা দেখাইয়া ব্রহ্মচর্য্যাদি সৎ অনুষ্ঠানের বিধান করিয়াছেন এবং বেদের সত্যতা সারবত্তা যাহারা স্বীকার করে উপলব্ধি করে—তাহাদের জন্যই যে ঐ বিধান বিধিবদ্ধ করিয়া-

ছেন, তাহা সহজেই সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। বিশেষতঃ মহর্ষির নির্দ্ধারণ উপলব্ধি করিলে বেশ বুঝা যায় যে তিনি অনুমানগম্য ঈশ্বরই নিরাকরণ করিয়াছেন—বেদগম্য ঈশ্বর করেন নাই।' এইরূপে মহর্ষি জৈমিনী সম্বন্ধে কিছু কথা কহিয়া পরিশেষে কহিলেন—'এই জগতের অবশ্যই একজন কর্ত্তা বিদ্যমান আছেন; কারণ মানিতে হইবে যে এই জগৎ একটি কার্য্য—যেমন ঘট পটাদি কার্য্য। একজন কর্ত্তা না থাকিলে, ঐ ঘট পটাদি কার্য্য কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। সেইরূপ কর্ত্তার অভাবে জগৎ কার্য্যও অসম্ভব হইয়া পড়ে ও সৃষ্টি ব্যাপার সংসাধিত হইতে পারে না। বেদ বা বেদবাক্যের অস্তিত্ব না থাকিলেও অনুমান দ্বারাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে।'

এই সকল কথা আচার্য্যের মুখে শুনিয়াও মণ্ডনের সংশয় বিদূরিত হইল না। তিনি সংশয়াপন্ন হইয়া মনে মনে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। সভাস্থলে মহর্ষি জৈমিনি তুল্য একজন মীমাংসাবিৎ মহাপণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। তিনি মণ্ডনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'মণ্ডন, তুমি ইঁহাকে চিনিতে পারিতেছ না। ইনি যে সে সাধারণ ব্যক্তি নহেন। ইনি অসাধারণ মহাপুরুষ। ইনি সত্যযুগে কপিলরূপে 'সাংখ্য-শাস্ত্র'—ত্রেতায় দত্তাত্রেয় রূপে 'যোগ-শাস্ত্র,' দ্বাপরে বেদব্যাস রূপে 'বেদান্ত-দর্শন প্রচার করিয়াছেন। তুমি ইঁহার শরণাপন্ন হও।' তিনি তখন আচার্য্যের আশ্রয় লইলেন।

সম্পূর্ণ